রাজনীতিবিদগণ

হুমায়ুন আজাদ

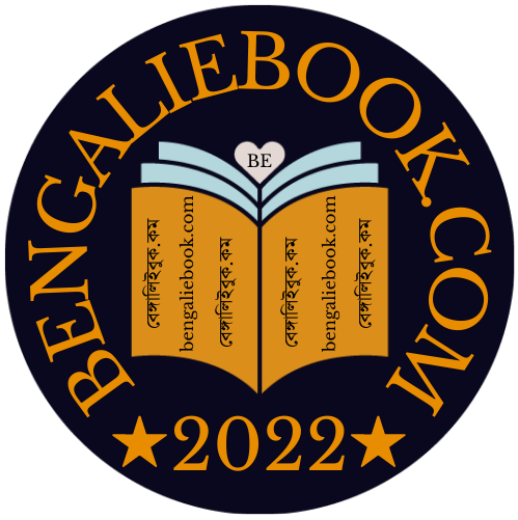

সূচিপত্র

১. আমরা হচ্ছি গরিব জনগণ 2

২. আমরা সাধারণ জনগণ.....39

৩. মিস বেনজির হাফসানা রুবাইয়াত বিউটি.....76

৪. রাতেই খবর নিয়ে জানা যায় 107

৫. ড্যামোক্র্যাসি আর গণতন্ত্রের কলকাঠি 141

৬. মহাগোলমাল হট্টগোল 180

৭. নমিনেশন পেপার জমা.....214

৮. মহাদেশনেত্রী যখন ফিরে আসেন.....246

১. আমরা হচ্ছি গরিব জনগণ

আমরা হচ্ছি গরিব জনগণ, সাধারণ মূর্খ মানুষ; আমরা রাজা বাদশা রাজনীতি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি এইসব জিনিশের কী বুঝি!

তবে আমাদেরও দুটি চোখ আছে, তাতে কিছু কিছু দেখি; আমাদেরও দুটি কান আছে, তাতে কিছু কিছু শুনি; আর দেখেশুনে মনে হয় দুনিয়াটা নানা রকম মালে ভরে গেছে, আর যে-সব মাল উত্তর থেকে দক্ষিণ পুব থেকে পশ্চিমে সবচেয়ে বেশি চলছে, তার মধ্যে এক নম্বর মাল হচ্ছে গণতন্ত্র; এর মতো আর কোনো মাল নেই; ধর্মকর্ম, হ্যাঁমবার্গার, প্রেম, ফিশ অ্যান্ড চিপস্, কাম, কোকাকোলা, বিয়ার, প্রিন্সেস ডায়না, আর রাবারও এতো জনপ্রিয় নয়। গণতন্ত্র এখন আমাদের পাগলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মাল, এর জন্যে পৃথিবীখান অস্থির; উকুনশোভিত ভিখিরি আর শীততাপনিয়ন্ত্রিত কোটিপতি আর তারকাখচিত সেনাপতি সবাই দিনরাত মিছিল করে এখন গণতন্ত্র চান; তাই দিন নেই রাত নেই রাস্তা ঘাট পানশালা পতিতালয় ইস্কুল কলেজ মন্দির মসজিদ মুদির দোকান বিশতলা দালান, এবং আর যতো জায়গা আছে, সবখানেই চলছে গণতন্ত্রের বিষ্যুদ শুক্রবারহীন উৎপাদন। চারদিকে আমরা শুনছি গণতন্ত্র উৎপাদনের ঘটর ঘটর ঝকর ঝকর ভঝর ভঝর ভাঙর ভাঙর শব্দ। বদমাশ রাজাবাদশারা ছিলো এক কালে, বিংশ শতাব্দীর এই সভ্য সময়টা রাজাবাদশাদের নয়; তবে রাজাবাদশাদের ছাইপাঁশ আর পচাগলা মাংস থেকে উৎপন্ন হয়েছেন অসংখ্য অভিনব রাজা; তাদের আর রাজা বলি না আমরা, বিশেষ সম্মানের সাথে বলি রাজনীতিবিদ; তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মহামান্য, মহামাননীয়, এবং তাদের স্ত্রীলিঙ্গরূপও পাওয়া যায়। তারা প্রেমময়, আমাদের অর্থাৎ জনগণের জন্যে তাঁদের প্রেম অনন্ত অসীম; জনগণের অর্থাৎ আমাদের জন্যে তাঁদের চোখে ঘুম নেই, তারা দুই চক্ষু বুজাইতে পারেন না;

জনগণের কল্যাণের জন্যে এমন কাজকাম নেই (ইফতার, হজ, পাঁচতারা হোটেলে পার্টি, উমরা, মিছিল, যুক্তরাষ্ট্রভ্রমণ, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, হরতাল, নামাজ, রোজা, মদ্যপান, ঘুষ, হেলিকপ্টারে চড়ে বন্যার দৃশ্য দেখা, নির্বাচনের আগে ভিখিরির বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাওয়া তাদের জনকল্যাণমূলক ব্যাপক কর্মকাণ্ডের কয়েকটি মাত্র মনে এলো), যা তারা করেন না। সব ব্যবসার সেরা এই মহৎ দেশপ্রেম আর জনগণপ্রেমের ব্যবসা, যার নাম রাজনীতি; একটিমাত্র ব্যবসাই রয়েছে, যা শিখতে হয় না; জনগণের নামে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেই হয়। রাজারা চলে গেলেও, তাদের বিদায় করে দেয়া হলেও তারা চলে যায় নি বলেই আমাদের, গরিব জনগণের, মনে হয়; মরা রাজাগুলো ভুতের মতো চেপে আছে।

আগে রাজবংশ ছিলো, কিন্তু এখন কি নেই? রাজবংশের এখন দরকার নেই? থাকবে না কেনো? থাকতে হবেই; গণতন্ত্রের জন্যেও রাজবংশ চাই আমাদের। আমরা, গরিব মানুষরা, আহাম্মকরা, যাদের কাজ নানান রঙের শ্লোগান দেয়া (শ্লোগান না দিলে বাচন কঠিন, শ্লোগান দিতে দিতে আমাদের গলা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে), দেখতে পাই হঠাৎ কোনো আবদুল করিম মোল্লা বা কুদরত ব্যাপারী একটা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। আমরাও প্রথম বুঝতে পারি না, আর তারাও বুঝতে পারেন না যে তাঁরা একটা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। যখন বুঝতে পারি তখন আমাদের খুশির কোনো শেষ থাকে না, শুধু শ্লোগান দিতে থাকি।

আমরা যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হইতাম (হই নাই তাতে ভালই হইছে), তাহলে নিশ্চয়ই কতকগুলো সূত্র বের করে ফেলতাম; আর গণতান্ত্রিক রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সূত্রগুলো হইতো এমন সরল :

প্রথম সূত্র

পিতা দীর্ঘকাল বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করিবেন, স্বাধীনতার পর তিনি বহু বছর শাসন করিবেন, অন্য কোনো ব্যক্তি, দল বা রাজবংশকে দাঁড়াতে দেবেন না; তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর কন্যা বসিবেন গণতান্ত্রিক সিংহাসনে (পুত্রের বদলে কন্যা থাকলেই ভালো হয়)।

দ্বিতীয় সূত্র।

কোনো এক সেনাপতি এক ভোরবেলা দেশ দখল করে ফেলিবেন, তিনি একটি বিচারপতিকে ডাকবেন, বোকা বিচারপতিটি ভাববেন তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন; তারপর সেনাপতি দেশকে দিতে থাকবেন বুট সানগ্লাস লেফরাইট গণতন্ত্র, দেশের প্রখ্যাত সুবিধাবাদীরা (এই শব্দটি এখন প্রশংসা বোঝায়) জড়ো হতে থাকবেন তার বুট ঘিরে; একদিন তিনি অমর হয়ে যাবেন; তার গণতান্ত্রিক সিংহাসনে বসিবেন তার স্ত্রী (রূপসী হইলেই ভালো হয়)।

তৃতীয় সূত্র

দীর্ঘকাল রাজনীতি করে কেউ একজন মহান নেতা হয়ে উঠিবেন, জনগণ তাঁর কথায় উঠবে বসবে, জনগণের ৯৯%জন তার নামে পাগল থাকবে, ক্ষমতায় এসে তিনি ১০১টি বিশেষণ পরবেন তাঁর গণতান্ত্রিক মুকুটে, নতুন নতুন বিশেষণ আবিষ্কার করতে থাকবেন তাঁর ভক্তরা, এবং জনগণের ১০%জনও তাকে আর সমর্থন করবে না, তিনিও একদিন

অমর হয়ে যাবেন; তাঁর কন্যা দেশে দেশে উদ্বাস্তুর মতো ঘুরে একদিন দেশে ফিরে আসবেন, বসিবেন পিতার সিংহাসনে (একটু সময় লাগিবে)।

আমরা, সাধারণ মানুষরা, দেখতে পাই প্রত্যেক রাজবংশে থাকেন অজস্র। রাজনীতিবিদ; এঁরা গণতন্ত্রের রাজপুত্র। পুরোনো রাজবংশগুলোর উত্থানপতনের মতো গণতান্ত্রিক রাজবংশগুলোরও ঘটে উত্থানপতন; পড়ার ও ওঠার আর্তনাদ ও উল্লাস রয়েছে গণতন্ত্রেও। আমরা, জনগণরা (আমরা সংখ্যায় এতো বেশি যে দুইটি বহুবচন ছাড়া চলে না), এটা খুব উপভোগ করে থাকি। আমরা কারো পড়ে যাওয়া দেখতে যেমন সুখ পাই আবার কারো ওঠা দেখতেও তেমন সুখ পাই। রাজাদের পড়া আর ওঠা দেখা ছাড়া গরিবের আর কী সুখ?

কিছু দিন আগে পড়ে গেছেন একটি বিখ্যাত বড়ো রাজবংশ; অর্থাৎ আমরাই ফেলে দিয়েছি। আমরা, জঘন্য জনগণরা, রাস্তায় রাস্তায় মেতে উঠি তাদের ফেলে দেয়ার জন্যে, আর আমরা নিজেরা রাস্তায় লাশের পর লাশ হয়ে পড়তে থাকি, তবু ফেলবোই রাজবংশটিকে–লাশ হওয়া জনগণের, আমাদের, বিশেষ আনন্দ, এবং ফেলে দিই খালি হাতে আমরা, জনগণ, রাস্তা থেকে ঘরে ফিরি না; তবে আরেকটি রাজবংশ। সরাসরি ক্ষমতায় আসেন না, আসার নিয়ম নেই। কোন্ রাজবংশ ক্ষমতায় বসবেন, তা ঠিক করি আমরাই, রাজারা যাদের বলেন জনগণ; গণতান্ত্রিক রাজবংশগুলো জনগণকে, আমাদের, এই ক্ষমতাটুকু দিতে বাধ্য হয়েছেন। এটুকু ক্ষমতা না দিয়ে উপায় নেই, নিজেদের জন্যেই আমাদের ক্ষমতা দিয়েছেন, পড়ে যাওয়ার পর আমাদের দিয়েই তারা আবার উঠতে পারেন। আমরা না থাকলে তাদের ফেলতো কে, আমরা না থাকলে তাদের তুলতো কে? আমরা, জনগণ, হচ্ছি রাজার রাজা–রাজানির্মাতা; যেমন রাজমিস্ত্রিরা প্রাসাদনির্মাতা।

সব রাজবংশের রাজনীতিবিদরাই বলেন, জনগণ আমাগো সম্পদ, জনগণ আমাগো অ্যাসেট, আমাগো সম্পত্তি।

এই জন্যে অর্থাৎ আমাদের ক্ষমতা বুঝে আমাদের প্রশংসা করার জন্যে আমরা, জনগণরা, খুবই কৃতজ্ঞ আমাদের রাজাদের কাছে; তাদের মহত্ত্বের কোনো শেষ নেই। আমাদেরও তাহলে দাম আছে। আমাদের রাজারা আমাদের মূল্য বোঝেন; এই জন্য আমাদের সুখের শেষ নেই। আমরা শুনেছি এটা হচ্ছে প্রশংসা করার কাল, এই কালে কেউ নিন্দা করে না; দরকার হলে খুন করে।

আমরা, জনগণরা (সম্মানার্থে বা অবজ্ঞার্থে দুই বহুবচন) চমৎকার জিনিশ, বিস্ময়কর ও আদরণীয়ভাবে আহাম্মক; একবার যাকে আমরা নামাই, নামিয়ে বিলের খলশে মাছের মতো ছড়ছড় করে সুখ পাই, কিছু দিন পর তাঁকেই আবার উঠোই, উঠিয়ে গাধার মতো সুখ পাই; আমরা নামাই এবং উঠোই। উঠোনো আর নামানোই আমাদের, আমাগো, মোগো, জনগণের, প্রধান রাজনীতিক কাজ, সবচেয়ে বড়ো বা একমাত্র অধিকার। এ ছাড়া আমাদের আর অধিকার কী? আমরা কি রাজাদের সামনে যেতে পারি? আমরা কি তাদের প্রাসাদে ঢুকতে পারি? ওই সব আমাদের না। তাঁরা মাঝেমাঝে সময় হলে আমাদের কাছে আসেন, তাঁদের দেখে আমাদের বুক ভরে ওঠে। রাজনীতিবিদগণ রাজারা জানেন আমরা, জনগণরা, একেকটি দেখতে মানুষের মতো, মায়ের পেট থেকেই বের হয়েছি, আমাদের মাথা চোখ নাক কান হাত ঠ্যাং সবই আছে, কিন্তু আমাদের মাথার ভেতরে কিছু নেই; আমরা মানুষের সমষ্টি নই, আমরা জনগণ, পত্রিকায় যে লেখে 'লাখ লাখ জনতা', হচ্ছি বস্তু, আমাদের ভেতরে নিহিত রয়েছে শক্তি-আগুন, ঝড়, ভূমিকম্প, ঢল, ঠাডা; তাদের

জানতে হয় আমাদের ভেতর থেকে ওই শক্তি বের করে কাজে লাগানোর বুদ্ধি। তারা কখনো আমাদের ভেতর থেকে আগুন বের করেন, কখনো ঝড় বের করেন, কখনো ভূমিকম্প বের করেন; আরো কতো কী বের করেন। রাজারা জানেন আমরা জনগণরা পছন্দ করি ঠকতে, যাদের ঠগবাজিতে আমরা সবচেয়ে গদগদ হই, মনে করি এইভাবেই আমরা ঠকতে চাই, এইভাবে ঠকলেই আমরা সুখ পাবো, তাঁদেরই উঠোই আমরা।

এখন আমাদের দেশে চলছে নানা রাজবংশের ক্ষমতায় যাওয়ার প্রতিযোগিতার পর্ব। প্রতিযোগিতা খুব জমে উঠেছে, আমরা খুব মজা পাইতেছি।

এই পর্বে দেশের রাজা হইতেছেন মহান স্বর্গীয় দেবদূতগণ।

শুনতে পাই এক কবি নাকি বলে গেছেন এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, কবিটা সত্য কথাই বলেছেন বলে মনে হয় (কবিগুলির কাজ কি সত্য কথা আগে আগেই বলে ফেলা?); আমাদের দেশটাই একমাত্র দেশ, যেখানে আছেন একদল মহান দেবদূত, অ্যাঞ্জেল, ফ্যারেশতা, যারা কখনো ভুল করেন না, পাপ করেন না, কাম করেন না অর্থাৎ নিষ্কাম, এ-পক্ষে থাকেন না, ও-পক্ষে থাকেন না, সে-পক্ষে থাকেন না, চুপচাপ থাকেন শুধু নিজেদের পক্ষে, তারাই দেবদূত, অ্যাঞ্জেল, ফ্যারেশতা। আমরা জনগণ বচ্ছরের পর বচ্ছর আমাদের চারপাশে কোনো দেবদূত দেখতে পাই না, আমাদের চোখ নেই বলে; কিন্তু যখন একটা রাজবংশ পইড়া যায়, আমরা ফালাই দেই, তখন দেখতে পাই সোনালি রুপালি পাখা মেলে স্বর্গ থেকে নামছেন দেবদূতরা। তাই দেশে অনেকেই দেবদূত হওয়ার সাধনা করছেন। কীভাবে বস্তায় বস্তায় বিশুদ্ধ দেবদূত পয়দা করা যায়, তা নিয়েও নানা চিন্তাভাবনা চলছে, কেননা চারপাঁচ বছর পর পর বহু দেবদূতের দরকার হয়, তাই দেশে দেবদূতের

পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকা প্রয়োজন। আমরা জনগণরা শুনেছি একটি প্রস্তাব খুবই গুরুত্ব পাচ্ছে যে একটি জাপানি বা মার্কিন ডিপফ্রিজের মধ্যে পাঁচ বছরের জন্যে বেছে বেছে কিছু লোককে রেখে দিতে হবে, ওই ফ্রিজের নাম হবে 'দেবদূত ডিপফ্রিজ', গভীর নিরপেক্ষ ঠাণ্ডায় তারা নিরপেক্ষ ইলিশ মাছের মতো থাকবেন, হয়ে উঠবেন নিরপেক্ষ দেবদূত। খুবই সুন্দর প্রস্তাব বলে মনে হয়। যখন সময় আসবে ডিপফ্রিজ থেকে বের করে তাদের হাতে দেয়া হবে দেশের রাজত্ব; কয়েক মাস ধরে রাজত্ব করবেন দেবদূতরা। স্বর্গীয় দেবদূতদের যেমন মগজ নেই, এ-দেবদূতদেরও তেমনি হয়তো মগজ নেই (এ নিয়ে তর্কাতর্কি বা বিতর্ক রয়েছে, একদল মনে করেন উন্মাদ ও শিশুদের মগজই শুধু তাদের মগজের সাথে তুলনীয়, তাই তাঁরা নিষ্পাপ); স্বর্গীয় দেবদূতদের যেমন ক্ষমতা নেই, এ-দেবদূতদেরও তেমনি কোনো ক্ষমতা নেই। তাদের একটিই কাজ : কোনো একটি রাজবংশকে নিরপেক্ষভাবে ক্ষমতায় বসিয়ে আবার নিরপেক্ষ সোনালি রুপালি ডানা মেলে স্বর্গে ফিরে যাওয়া; এবং দেবদূত হওয়ার গৌরব উপভোগ করা (আমরা জনগণরা দেখতে পাইতেছি যে দেবদূতরাও গভীর প্রবল প্রত্যাশায় থাকেন যে-রাজবংশটি ক্ষমতায় আসবেন, সেটি তাঁদের কোনো একটা পরিচারকের, আমরা চলতি ভাষায় বলি চাকরের, কাজ দেবেন, যাতে তারা কবরে কবরে ফুলের তোড়া দিতে পারেন, হোটেলে হোটেলে বক্তৃতা দিতে পারেন, মাসে মাসে মিলাদশরিফ পড়তে পারেন; একটি রাজবংশ তাঁদের একজনকে একটা পরিচারকের কাজ দিয়ে ধন্য করেছেন; তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে, চেহারা সুন্দর দেখাইতেছে)। আমরা বুঝতে পারি রাজনীতি খুবই কঠিন, আর শয়তানদের, কাজ; দেবদূত হওয়া–আমাদের মনে হয়–সহজ, তাঁদের কাজও সহজ; রাজনীতি করলে যাদের মুখ আর দেহ হাত আর পা নানা রকম ঘায়ে আর ছুলিতে ছেয়ে যেতো, রেলইস্টিশনের কুষ্ঠরোগীর মতো দেখাতে যাঁদের, দেবদূত হয়ে তাঁরা শরীরকে রাখেন পবিত্র নির্মল, মনে হয় সারাক্ষণ পবিত্র পানিতে গোশল করছেন।

আমরা, জনগণরা, খেলতে পছন্দ করি; আর গণতন্ত্র হচ্ছে খুবই মজার খেলা, বাইল্যকালেও এতো মজার খেলা আমরা খেলি নাই, ডাংগুটি হাডুডু গোল্লাছুটের থেকে অনেক মজার এই গণতন্ত্র। এ-খেলারও আছে কতকগুলো সুন্দর সুন্দর নিয়ম; হাডুডু খেলায় যেমন হাডুডু কুকুৎ করতে হয়, গণতন্ত্র খেলায়ও নির্বাচন করতে হয়, কুকুৎ করতে হয়, হাডুডু করতে হয়, নির্বাচনের জন্যে প্রার্থী মনোনীত করতে হয়। এবার যখন প্রার্থী মনোনয়নের সময় আসে আমাদের ডোবার মতো দেশটি জুড়ে সাড়া পড়ে যায়, ঢেউ উঠতে থাকে; আমরা জনগণরা আমোদে আত্মহারা হয়ে যাই, কোনো রকমে বেঁচে থাকি শুধু রাজবংশগুলোকে ভোট দেয়ার জন্যে। রাজবংশগুলো তাদের প্রার্থী ঠিক করতে অর্থাৎ কারা কারা মাঠে খেলবেন অর্থাৎ প্রার্থী মনোনীত করতে শুরু করেন, আমরা চোখ বড়ো করে তাকিয়ে থাকি। তারা জিতলে রাজপুত্র হবেন, বড়ো বড়ো দালানে ঢুকবেন আর বের হবেন, বড়ো বড়ো গাড়িতে উঠবেন আর নামবেন, গাড়ির যেই দিকে বসবেন সেই দিকে পতাকা উড়াইবেন; আর তাঁদের রাজবংশ বা দল যদি জেতে, তাহলে তাদের রাজবংশ বা দলই রাজত্ব করবেন, তাদের দল থেকেই হবেন রাজা (অর্থাৎ রানী); আর তারা হবেন মন্ত্রী, অমাত্য ও কতো কিছু, যা আমরা জনগণরা জানি না। আমরা, জনগণরা, আর কতোটা জানতে পারি? আমরা তো দেশের ভেতরে নাই, আছি বাইরে। তখন তারা যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারবেন, আর আমরা তাদের লাখ রকমের করাকরি দেখে সুখে আহ্লাদে ভরে উঠবো।

আমাদের প্রতিটি রাজবংশ বা দলের আছে একটি করে বিরাট সিন্দুক; ওই সিন্দুকগুলো পরিপূর্ণ হয়ে আছে অজস্র নীতি ও আদর্শে। দুনিয়ায় যতো নীতি আর আদর্শ আছে, তার সব পাওয়া যায় ওই সিন্দুকগুলোতে। আমাদের গণতান্ত্রিক রাজবংশগুলো নীতি আর আদর্শ

ছাড়া আর কিছু জানেন না; তাই আমাদের মতো নীতি ও আদর্শে বোঝাই জাতি আর নেই। আমাদের প্রতিটি ছিদ্রের ভেতরে ঢোকোনো আছে অজস্র আদর্শ।

আমাদের গণতান্ত্রিক রাজবংশগুলো নীতি-আদর্শ ও অন্যান্য মহৎ ব্যাপার বোঝানো খুবই কঠিন ব্যাপার; তারা নিজেরাও তা ভালোভাবে বোঝেন না; তাগো কাছে জানতে চাইলে বলেন, বুইঝ্যা লইয়েন। আমরা, মূর্খ জনগণরা গরিব মানুষ, কীভাবে তা বুঝি? আমাদের কয়েকটি গণতান্ত্রিক রাজবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে তাদের নীতি আর আদর্শ জ্ঞানী মানুষরা বুঝতে পারবেন।

আমাদের একখানা রাজবংশের নাম 'শক্তির উৎসবাদী গণতান্ত্রিক রাজবংশ বা দল' : দেশে গণতান্ত্রিক রাজবংশ প্রতিষ্ঠার যে-সূত্রগুলো আমরা আগেই বলেছি, তার দ্বিতীয় সূত্রানুসারে এই সম্ভ্রান্ত দল বা রাজবংশটি প্রতিষ্ঠিত। আমাদের রাজবংশগুলোর নাম হয় ইংরেজিতে, উর্দুতে, আরবিতে, ফার্সিতে, হিব্রুতে, হটেনটটে, বুরুশাস্কিতে; এই বংশের নামটা ইংরেজিতে; বাঙলায় বললে নামটা বোঝা যায় না; মনে হয় মঙ্গোলিয়ার বা আজারবাইজানের কোনো রাজবংশের নাম বলছি। এ-রাজবংশখানি মনে করেন জনগণ হচ্ছে শক্তির উৎস, আর তারা হচ্ছেন শক্তির পরিণতি। তাঁদের এই তত্ত্বটা আমরা খুবই পছন্দ করি; উৎস হচ্ছে মূল, আর মূলই হচ্ছে আসল ব্যাপার; তাই আমরা জনগণরা হচ্ছি আসল ব্যাপার, আর ওই পরিণতিরা হচ্ছেন মেকি ব্যাপার। আমাদের এক অমর (এই শব্দটার অর্থ গত বিশ বছরে বদলে গেছে, হঠাৎ কেউ খুন হয়ে গেলে এখন তাকে আমরা অমর বলি; তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামের বুড়ো ভদ্রলোক আর অমর নন, তিনি মৃত, তাঁর খুন হওয়া উচিত ছিলো) সেনাপতি এটি প্রতিষ্ঠা করে দেশে গণতন্ত্রের বন্যা বইয়ে

দিয়েছিলেন; আমরা, জনগণরা, শুনতে পাই তিনি নাকি রাজনীতিবিদদের জন্যে রাজনীতি কঠিন, আর সুবিধাবাদীদের জন্যে সহজ করে তুলতে চেয়েছিলেন; এবং সফল হয়েছিলেন।

আমরা মূর্খরা অবশ্য রাজনীতিবিদ আর সুবিধাবাদীর মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝতে পারি না; এইটা আমাদের দোষ, আমাদের কাছে দুইটি শব্দই সুন্দর, দুটিরই আওয়াজ মিষ্টি। তাঁর অনেক চকচকে বুট ছিলো আর ঝকঝকে কালো সানগ্লাশ ছিলো; আর যা ছিলো সেই সম্পর্কে আমরা কী জানি? আমরা মূর্খ মানুষ। তিনি মাটি কাটতে খুব পছন্দ করতেন, মাটি দেখলেই কোপাতেন; তাই সঙ্গে সব সময় একটি কোদাল রাখতেন; এক মন্ত্রী এইজন্য তাকে একখানা সোনার কোদাল উপহার দিয়েছিলেন (আমাগো দেশে সোনা ছাড়া আর কিছু নেই)। এই রাজবংশে তার সুন্দর বুট ঘিরে জড়ো হয়েছিলেন দেশের যতো প্রসিদ্ধ রাজাকার (আল্লায় তাগো ভেস্তে নসিব করুন), অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল (আমরা গরিবরা বলি অবজেনারেল), মেজর ও অন্যান্য, অধ্যাপক (কোনো দিন পড়ান নাই), আমলা (ছিএছপি, ডিএছপি, ইএছপি, এফএছপি), ডাক্তার (মানুষমারা কবিরাজ), উকিল, ব্যাংকডাকাত (ডাকাতি করে তারা নিজেরাই ব্যাংক দিছেন), মাস্টার (কোনো দিন পড়েন নাই), ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, দোকানদার, কালোবাজারি, শাদাবাজারি, আর বিভিন্ন বাম ও ডান রাজবংশ থেকে ময়লার মতো গড়িয়ে আসা স্ট্যালিন লেনিন কসিগিন মাওজেদুং ও বোচকামারাগণ। রাজবংশটির জন্ম হয়েছিলো ক্ষমতার প্রসবঘরে, তাই ক্ষমতায় থাকা তাঁদের প্রথম স্বভাব; তারা বিশ্বাস করেন তারা ক্ষমতায় থাকলেই জনগণ ক্ষমতায় আছে। তাঁরা দিনরাত গলা ভেঙেচুরে দাবি করেন তাদের অমর নেতা স্বাধীনতার ঘোষক, তিনি ঘোষণা না করলে দেশে স্বাধীনতা আসতো না, তার ডাক শুনেই স্বাধীনতা পোষা বেড়ালের মতো আসে এই দেশে; আর আমরাও না করতে পারি না। বিসমিল্লাহ এই বংশের প্রধান আদর্শ, সাফারি জ্যাকেট দ্বিতীয় আদর্শ। এই বংশখানি সব সময় ভয়ে থাকেন কখন অন্য

বংশ দেশটিকে পাশের দেশের হিন্দুগো কাছে বিক্রি করে দেন। এই দলের প্রধানকে আমরা বলি মহাদেশনেত্রী।

আমাদের আরেকখানা রাজবংশের নাম হলো 'জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশ বা দল' : গণতান্ত্রিক রাজবংশ প্রতিষ্ঠার তৃতীয় সূত্রানুসারে এটি প্রতিষ্ঠিত। এই দলখানি বাঙালি, বাঙলা, বাঙলাদেশের নামে পাগল বলে এর নামখানি রাখা হয়েছে উর্দু ও ইংরেজি ভাষার বিবাহ ও বিবাহোত্তর কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে। এই রাজবংশখানি বিশ্বাস করেন তারাই এনেছেন দেশের স্বাধীনতা, তাই দেশ তখনই স্বাধীন যখন তারা ক্ষমতায় আছেন। এই রাজবংশ মনে করেন তারা যখন স্বৈরাচার করেন, তখন তা হচ্ছে গণতন্ত্র; আর অন্যরা যখন গণতন্ত্র করেন (অবশ্য করেন না), তখন তা হচ্ছে স্বৈরাচার। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মনে করতেন দেশটা তার; আর এ-বংশের অনেকেই মনে করেন দেশটা তাদের। এই রাজবংশ যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তাদের পায়ের নিচে আমরা মাথা দিয়ে রাখতাম; এই রাজবংশের তিনচারজন মহান রাজপুত্র ছিলেন, তাঁরা আমাদের যা করতে বলতেন আমরা তা-ই করতাম; ভাইয়ের মাথা এনে দিতে বললে ভাইয়ের মাথা এনে দিতাম। একরাতে কতকগুলো খুনি, একটা রাজা যাদের বলতেন সূর্যসন্তান, এই বংশটিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। মজার কথা হচ্ছে এই বংশেরই একজন নতুন রাজা হন, আর মন্ত্রী হন এ-বংশেরই অনেকে, যারা একদিন প্রতিষ্ঠাতার পায়ের ধুলো পেলে ধন্য হতেন। আমরা গরিব জনগণ কিছু বুঝতে না পেরে চুপ থাকি। এ-বংশ অনেক বছর ক্ষমতার বাইরে ছিলেন, তাই এ-বংশ থেকে অনেক রাজপরুষই শক্তির উৎসবাদী গণতান্ত্রিক রাজবংশে ও খোজাগণতান্ত্রিক রাজবংশে চলে গেছেন; অনেকে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন; এখন এ-বংশ নানা বংশ আর অবংশ থেকে রাজপুরুষ সংগ্রহ করছেন। এ-বংশের অন্যতম প্রধান সম্পদ দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীরা, মঞ্চ আর টেলিভিশন যাদের খুব ভালো লাগে। এ-

বংশ আগে ধর্মনিরপেক্ষতা নামে এক অদ্ভুত কথা বলতেন (আরো একটি অদ্ভুত কথা বলতেন, যে-কথাটির অর্থ তাঁরা জানতেন না, আমরাও জানি না, কথাটি হচ্ছে সমাজতন্ত্র), তবে মিলাদ পড়তে গিয়ে বলতেন ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়; এবং এখন এ-বংশের রাজপুরুষেরা খুবই ধার্মিক হয়ে উঠেছেন, দাড়ি ও টুপির চর্চায় মন দিয়েছেন, তসবি টিপছেন, মাসে মাসে ওমরা করছেন। এতে আমরা জনগণরা খুব খুশি হচ্ছি, দেশে আর ইসলামের অভাব থাকবে না। এই দলের প্রধানকে আমরা বলি মহাজননেত্রী।

আমাদের আরেকখানি রাজবংশের নাম হচ্ছে 'খোজাগণতান্ত্রিক রাজবংশ বা দল' : এটি একখানি অসামান্য বংশ, গণতান্ত্রিক রাজবংশ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় সূত্রানুসারে এটি প্রতিষ্ঠিত; তবে এর জনক অমর না হওয়ায় তাঁর স্ত্রী মহাগণনেত্রী হয়ে উঠতে পারেন নি; হওয়ার তার সাধ ছিলো, কিন্তু সাধ পূরণ হয় নি; একদিন হয়তো হবে। আমরা মূর্খরা মনে করি ভাঁড় হওয়ার যার কথা ছিলো, ভাঁড়ামো করলে যিনি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আর গোপাল ভাঁড়কে ছাড়িয়ে যেতেন, আমাদের কালচার সমৃদ্ধ হতো, তিনি হয়েছিলেন সেনাপতি; আর তিনি অন্য কিছু জন্ম দিতে না পেরে জন্ম দিয়েছিলেন এই রাজবংশটিকে। শক্তির উৎসবাদী গণতান্ত্রিক রাজবংশের মতো এটিরও জন্ম হয়েছিলো ক্ষমতার প্রসবঘরে, এবং দেশের যতো রাজাকার (আল্লা তাদের ভেস্তে নসিব করুন), অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, মেজর, সুবাদার ও দফাদার, আমলা, কামলা, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, ডাক্তার, কবিরাজ, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকডাকাত, চোর, দোকানদার, চোরাকারবারি, শাদাবাজারি, কালোবাজারি, বাম ও ডান রাজবংশ থেকে গড়িয়ে আসা ইতর মেথর এটিকে পরিপূর্ণ করে তোলেন। বন্ধনির ভেতর এঁদের বিশেষ পরিচয় আর দিলাম না, এককথা বারবার বলতে মুখ ব্যথা হয়ে যায়; শক্তির উৎসবাদী গণতান্ত্রিক রাজবংশে এদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। এ-রাজবংশটি মুঘলদের মতো দীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব করেন, এবং দেশকে ধর্মকর্ম পির মুর্শেদ দশরশি শাহেদাবাদী

অকথ্যবাদী মিথ্যাবাদী ভাঁড়ে ভ'রে দেন। এ-রজবংশের মহাজননেতাকে আমরা ফেলে দিই, এবং তিনি অমর না হয়ে কয়েক বছর কারাগারে অবসর যাপন করেন। এ-বংশের মহাজননেতার আদর্শ প্রেমপিরিতি, আর দলের আদর্শ ইসলাম।

আমাদের আরেকখানি রাজবংশের নাম 'রাজাকারতান্ত্রিক রাজবংশ বা দল' : ইসলামের নামে দেশের প্রধান খুনিদের রাজবংশ এটি। এই বংশটি দিনরাত ছুরি শান দেন বলে এটিকে ছুরিশানদার রাজবংশও বলি আমরা। ১৯৭১-এ আল্লার নামে এ-রাজবংশ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন, আল্লার নামে তারা কাজ করেন পাকিস্থানের জল্লাদবংশরূপে, হাজার মানুষের গলা কাটেন, লাখ নারীকে ধর্ষণ করেন; এবং এখনো তাদের পেটের ভেতরে পাকিস্থান। হাতপায়ের রগ কাটতে তারা দক্ষ, আল্লা তাদের এ-অধিকার দিয়েছেন বলে তারা বিশ্বাস করেন ও বাস্তবায়ন করেন। গণতন্ত্র আর নির্বাচনে তারা বিশ্বাস করেন না, ইসলামে এইসব নেই, তারা বিশ্বাস করেন আল্লায় (এটা তাঁদের ছদ্মবেশ) ও খুনে; তবে উপায় না দেখে তারাও গণতন্ত্র ও নির্বাচনে অংশ নেন। টুপি ও দাড়ি তাদের ব্যবসায়ের প্রতীক। তারা লেখাপড়া জানেন না, আর পড়লে একখানা বই ছাড়া পড়েন না। এই রাজবংশের রাজপুত্ররা এখনো মনে করেন সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, আর যদি না ঘোরে তাহলে সূর্যকে পৃথিবীর চারদিকে তারা ঘুরিয়ে ছাড়বেন, সূর্যের হাতপায়ের রগ কেটে দিয়ে।

আমাদের দেশে আছে আরো নানা গণতান্ত্রিক রাজবংশ।

আমাদের গণতান্ত্রিক রাজবংশগুলো যখন প্রার্থী (তাঁরা বলেন ক্যান্ডিডেট) ঠিক করতে শুরু করেন, আমরা, আহাম্মক জনগণরা, মনে করেছিলাম এবার দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যযুগ;

কেননা রাজবংশগুলো ন্যায়, নীতি, আদর্শ, সততা, কল্যাণ প্রভৃতি ও আরো অনেক ভালো ভালো কথায় মেতে ওঠেন; তাদের মুখ থেকে শ্রাবণের ধারার মতো (অনেকে বলেন থুতুর মতো) ন্যায়, নীতি, সততা ঝরতে থাকে; জনগণ জনগণ ধ্বনিতে তারা দেশ মুখর করে তোলেন। তারা যতো নীতির কথা বলতে থাকেন, আকাশের মেঘে ততো জলও নেই। তারা বলতে থাকেন রাজনীতিকে উদ্ধার করতে হবে সুবিধাবাদী আর অসৎদের হাত থেকে; নির্বাচিত করতে হবে সৎ ও নীতিপরায়ণ মানুষদের (এই জীবটি কতো দিন ধরে আমরা দেখি না), চোরবদমাশদের বের করে দিতে হবে রাজনীতি থেকে (আমরা বলাবলি করতে থাকি তাহলে দেশে কি রাজনীতি থাকবে না, এটা কি দেশ থেকে রাজনীতি উঠিয়ে দেয়ার চক্রান্ত?); কিন্তু, হায়, আমরা বোকারা দেখতে পাই গণতান্ত্রিক রাজবংশগুলো প্রার্থী মনোনয়নের সময় নীতি ও সতোর কোনো বালাই রাখেন না। তা-ই বা কেমন করে বলি? তারা নীতি ও সততা বলতে যা বোঝেন আমরা বোকারা হয়তো তা বুঝতে পারি না; আমরা, জনগণ, নীতি আর সততার কী বুঝি? আমরা বোকারা শুধু বুঝতে পারি মুখে ভালো ভালো কথা বলা আর কাজে তার উল্টোটা করাই হচ্ছে রাজনীতি। রাজাদের নীতি আর বোকাদের নীতি কখনোই এক হতে পারে না।

এবার বাতাস এমনভাবে বইতে থাকলো যে আমাদের রাজনীতিবিদরা বুঝতে পারলেন, এবং এমনকি আমরাও বুঝতে পারলাম, ক্ষমতায় যাবেন দুই বড়ো রাজবংশের এক রাজবংশ–জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশ, নইলে শক্তির উৎসবাদী গণতান্ত্রিক রাজবংশ। তাদের ক্ষমতায় যাওয়া খুবই দরকার; আর সারা দেশের রাজনীতিবিদরা দুই দলে গিয়ে ভেঙে পড়লেন, অনেক নতুন নতুন রাজনীতিবিদেরও উদ্ভব হলো। আমরা মনে করেছিলাম যেই দলের যেই নীতি সেই নীতির লোকেরা যাবেন সেই দলে; কিন্তু যা দেখতে পাই তাতে আমাদের সুখের কোনো শেষ থাকে না। আমরা তো আর সব দেখতে আর শুনতে পাই

না, গরিব মানুষ, জনগণ আমরা, দূর থেকে যা দেখতে পাই আর শুনতে পাই সেই কথাই বলছি।

শুনতে পাই জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশের বৈঠক বসেছে।

তাঁদের বৈঠক যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা বুঝতে পারি। এইবার তাদের ক্ষমতায় যেতেই হবে, অনেক বছর তারা রাজপথে আছেন। তাদের মুখের দিকে তাকালে আমাদের মায়া হয়, মুখ তাদের দরদভরা; মানুষ ক্ষমতার বাইরে থাকলে মানুষ হয়ে ওঠে, এটা আমরা গরিবরা বুঝতে পারি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে। তাঁরা যখন, অনেক আগে, ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তাদের চোখেমুখে এই দরদটা ছিলো না, তখন তাদের দিকে তাকানোই যেতো না; যেমন কয়েক মাস আগেও শক্তির উৎসবাদী রাজবংশের কারো মুখের দিকে আমরা গরিবরা তাকাতে পারতাম না, তাঁদের মুখ থেকে ক্ষমতা ঝিলিক দিয়ে এসে আমাদের মুখ পুড়িয়ে দিতো।

মহাজননেত্রী বললেন, বলেন আপনেরা, এইবার কী নীতি লইতে হবে, কাদের ক্যান্ডিডেট করতে হবে।

আমাগো এইবার ক্ষমতায় যাইতেই হইবো, বললেন রাজবংশের এক বড়ো জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজপুরুষ মোহাম্মদ আবদুর রহমান, ক্ষমতার বাইরে আর থাকন যায় না, বাইরে থেকে থেকে পইচ্যা যাইতেছি। এইবার এমন নীতি আর কৌশল লইতে হবে, যাতে ক্ষমতায় যাইতে পারি।

আবদুর রহমান সাহেবের বয়স হয়েছে, অনেক বিপদের মধ্যেও তিনি এ-বংশ ছেড়ে অন্য বংশে যান নি, গেলে দু-তিনবার মন্ত্রী হতে পারতেন; এখন দাড়ি আর টুপি নিয়েছেন; তাঁর আর সময় নেই।

অনেক বচ্ছর ধইর‍্যা আমরা রোডে আর রাস্তায় আছি, শ্লোগান দিতাছি মিছিল করতাছি, মাইর খাইতাছি, ভাঙচুর করতাছি, আমাগো কোনো পাওয়ার নাই, অনেক বচ্ছর ধইর‍্যা আমরা বঙ্গভবনে নাই, গণভবনে নাই, এইবার আমাদের অই ভবনগুলিতে ঢুকতে হইবো, বললেন আরেক রাজপুরুষ কলিমউদ্দিন মৃধা।

তাঁরও বয়স হয়েছে, অনেক ধৈর্যে তিনি টিকে আছেন এ-রাজবংশে; অনেক প্রলোভন পেয়েছেন অন্য রাজবংশ থেকে, দু-একবার যাওয়ার উপক্রম করেছিলেন; কিন্তু সুবিধা হবে না বুঝে যান নি, তার অনেক সঙ্গীই চলে গেছেন।

বলেন আপনেরা, কী নীতি মাইন্যা আপনেরা ক্যান্ডিডেট দিবেন? জিজ্ঞেস করলেন মহাজননেত্রী।

নীতি একটাই–যে জিতবো বইল্যা মনে করুম, তারেই ক্যান্ডিডেট করুম, যে জিতবো না তারে ক্যান্ডিডেট করুম না, বললেন আরেক রাজপুরুষ নিজামউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, এইবার ক্ষমতায় না গেলে আমাগো ভবিষ্যৎ নাই।

তার অনেক বয়স হয়েছে, চলে যাওয়ার আগে একবার অন্তত মন্ত্রী হয়ে যেতে চান; কয়েকবার হজ করেছেন, আজকাল সব সময় মাথায় টুপি পরেন, রোজা নামাজও করেন, এবং মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন।

ঠিক কথা বলতাছেন, চাচা, যে জিতবো না তারে আমরা নিব না, এইবার আমাদের ইলেকশনে উইন করতেই হবে, বললেন মহাজননেত্রী, আমরা স্বাধীনতা আনলাম আর ফলটা খাইলো অরা। যেভাবেই হোক আমাদের জিততে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর আসন বা সিংহাসনটি একবার ঝলমল করে ওঠে চোখের সামনে।

কয়টা জিনিশ আমাগো দ্যাখতে হইবো, বললেন এক রাজপুরুষ মোহাম্মদ রজ্জব আলি, ওইগুলিন না দ্যাখলে ক্ষমতায় যাইতে পারুম না।

বলেন চাচা, কী কী জিনিশ আমাগো দেখতে হইবো? জিজ্ঞেস করেন মহাজননেত্রী।

তার চোখের সামনে থেকে দূরে মিশে যেতে থাকে সিংহাসনটি।

আমি বোঝতে পারতাছি আমাগো ক্যান্ডিডেট খালি আমাগো দল হইতে লইলে চলবো না, চাচা বলেন, আমাগো কিছু আর্মির লোক দরকার, কয়টা রিটায়ার্ড জেনারেল ব্রিগেডিয়ার কর্নেল মেজর দরকার, অই পাড়াটা যাতে আমাদের লগে থাকে, জনগণরা যাতে বোঝে অই পাড়াটার লগে আমাদের গোলমাল নাই; আমাগো কয়টা আমলা দরকার, অরা আমাগো এইবার অনেক সাহায্য করছে আর অরাই কলকাঠি ঘুরায়; আমাগো কয়টা ব্যাংক ডিফল্টার

দরকার–ট্যাকা তো লাগবো, আর কয়টা রাজাকার দরকার, অরা ইসলাম দেখবো; আর পারলে অন্য দল থেকে কয়টারে ভাগাইয়া আনন দরকার। আর মহাজননেত্রীর আত্মীয়স্বজনরাও থাকবেন। তাইলেই খালি আমরা ক্ষমতার মুখ দ্যাখতে পারুম।

ঠিক কথা বলতাছেন, চাচা, ঠিক কথা বলতাছেন, চাচা, বলেন মহাজননেত্রী, এবং সবাই। তাদের মনে হয় ক্ষমতায় যাওয়ার মূলসূত্র তারা পেয়ে গেছেন।

তবু তারা একবার কেঁপে ওঠে, তবু তারা সবাই উদ্বিগ্ন, তবু তাঁরা সবাই চিন্তিত; তাদের চোখেমুখে তা ধরা পড়ে। এর আগেও একবার তাদের মনে হয়েছিলো ক্ষমতা হাতের মুঠোয় এসে গেছে, দেশটা তাঁদের হয়ে গেছে; তারা সবাই ক্ষমতাসীন রাজবংশের মতো আচরণ করতে শুরু করেছিলেন; কিন্তু ভোটের পর দেখা যায় তারা নেই। জনগণের বিশ্বাসঘাতকতার কোনো শেষ নেই। তাই এবার সাবধান হতে হবে, সবগুলো প্যাঁচ ঠিকঠাক মতো দিতে হবে।

খালি নীতি লইয়া থাকলে হইবো না, বলেন এক রাজপুরুষ মোহাম্মদ আবদুল হাই, খালি স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ আর বাঙালি লইয়া থাকলে আমরা ক্ষমতায় যাইতে পারুম না। এইগুলির কথা আমাগো বলতে হবে কম কম, আর ইসলামের কথা বেশি বলতে হবে, এমনভাবে বলতে হবে যেনো আমরা মক্কা জয় করে এইমাত্র মদিনা থেকে ফিরলাম; ইসলাম ছাড়া আইজকাইল রাজনীতি নাই।

খোজারাজবংশ আর রাজাকার রাজবংশের লগেও আমাগো গোপন সম্পর্ক দরকার, নাইলে শক্তির উৎসওলারা তাগো ভাগাইয়া লইয়া যাইবো, বলেন কলিমউদ্দিন মৃধা, আর অগো

লইয়া তো অনেক বচ্ছর আমরা আন্দোলন করছি, অগো আমাদের সঙ্গে রাখতে হবে। অগো আর রাজাকার স্বৈরাচার বইল্যা দূরে রাখন যাইবো না।

ধর্মনিরপেক্ষতা আর সমাজতন্ত্রের নাম কেহ মোখেও আনবা না, বলেন মোহাম্মদ আবদুর রহমান, অইগুলিনই আমাগো ডুবাইছে; আমরা আর ডুইব্যা থাকতে চাই না।

এইবার আমাগো ধর্মেকর্মে মন দিতে হইবো, বলেন মোহাম্মদ রজ্জব আলি, মহাজননেত্রী আর কয়জনের ওমরা কইরা আসতে হইবো, অগো মতন বকতিতায় বকতিতায় আল্লা আর ইসলামের কথা বলতে হইবো, রাস্তায় রাস্তায় নমাজ পড়তে হইবো, মইধ্যে মইধ্যে জনগণের লিগা কানতে হইবো।

জনগণের জন্যে কাঁদতে গিয়ে মোহাম্মদ রজ্জব আলির নিজের জন্যে কাঁদতে ইচ্ছে হয়। মোহাম্মদ রজ্জব আলি আরো বলেন, আল্লার নাম লইলে আল্লা আমাগো দিকে মোখ ফিরা চাইবো।

তারা সবাই একবার মনে মনে মোনাজাত পাঠ করেন। তারা জানেন আল্লা ছাড়া রাজনীতিতে কোনো ভরসা নেই।

এই ছাড়া আর আমাগো উপায় নাই, বলেন মোহাম্মদ আবদুর রহমান, অগো মতন ইসলামের নাম ভাঙ্গাইতেই হইবো, দ্যাশটা আসলে মুসলমানের এই কথা মনে রাখতে হইবো; অগো দেশনেত্রী কোনো দিন পশ্চিমে মাথা ঠ্যাকায় না, ব্যাংকক থেকে আইন্যা পাঁচটা বিউটিশিয়ান রাখে, কিন্তু দাঁড়াইলেই কয় ইসলাম; অগো জেনারেল আর আমলাগুলি

দিনরাইত মদে ডুইব্যা থাকে, কিন্তু খাকারি দিলেই কয় ইসলাম; আমাগোও তাই করতে হইবো।

এভাবে ক্রমশ কয়েক ঘণ্টায় তাদের নীতি স্থির হয়ে যায়।

শক্তির উৎসবাদী গণতান্ত্রিক রাজবংশের বৈঠক বসতে একটু দেরি হয়, কেননা মহাদেশনেত্রীর ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়; আমরা গরিবরা শুনতে পাই তিনি দুপুরের আগে ঘুম থেকে জাগতে পারেন না। সুখী মানুষ, সুখ বেশি, ঘুমও বেশি; আর তাতে শরিলটাও ভালো থাকে। এটা আমাদের জাতীয় গর্ব, একধরনের জাতীয়তাবাদ; আমরা যখন পাখপাখালির ডাকের আগে ঘুম থেকে উঠে মাঠে ময়দানে যেতে থাকি, আর ঘুমোতে পারি না, ঘুমোলে আমাদের পেট খালি থাকে, সেখানে মহাদেশনেত্রী একটা পর্যন্ত ঘুমোন, আমরা গরিবরা শুনি, আর গর্বে আমাদের পেট ভরে ওঠে। ঘুমে তিনি হয়তো আমাদেরই স্বপ্নে দেখেন, আমরা ফুলের মালা নিয়ে এসেছি, কাঁধে করে সিংহাসন নিয়ে আসছি, ঘুম থেকে উঠে তিনি তাতে বসবেন। মহাদেশনেত্রী সম্রাজ্ঞীর মোন, গরিবরা শুনতে পাই তার রাজবংশের কেউ তার সামনে বসারও সাহস করেন না, দাঁড়ানোরও সাহস করেন না; আমরা গরিব জনগণরা বুঝতে পারি না কীভাবে। তাহলে তারা মহাদেশনেত্রীর সাথে কথা বলেন। প্রাইমারি ইস্কুলে আমরা যেমন নিলডাউন হতাম, সেই কথাটি শুধু আমাদের মনে পড়ে।

মহাদেশনেত্রী হচ্ছেন ওই রাজবংশের মূর্ত রূপ।

দেরি হলেও ওই রাজবংশেরও সভা বসে; না বসে উপায় নেই; সকালে জাগার থেকে ঘুম বড়ো, আর ঘুমের থেকে সিংহাসন বড়ো।

মহাদেশনেত্রী তার আসনে বসে একবার হাসেন, কোনো কথা বলেন না।

তিনি চোখের সামনে একটা সিংহাসনের ছায়া দেখতে পান; এখন তিনি সিংহাসনে নেই ভেবে তার চোখ ঘোলা হয়ে আসে।

তার হাসিটি ম্লান হয়ে আসে; সভাকক্ষের বাতিগুলো যেনো নিভে আসে।

মহাদেশনেত্রীর মুখের হাসি ফিরিয়ে আনার জন্যে শক্তির উৎসবাদী এক গণতান্ত্রিক রাজপুরুষ অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, আমরা আবার ক্ষমতায় যাইতাছি, ম্যাডাম; ক্ষমতায় যাওনের আমাদের দেরি নাই, দুই তিন মাসের মধ্যেই আমরা আবার ক্ষমতায় যামু।

মহাদেশনেত্রী জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে যাবেন?

উই নিড ইসলাম, মানি, অ্যান্ড মাসেল, ম্যাডাম, বলেন অবজেনারেল (তিন দশকের রাজনীতির বিকাশের ফলে এই মূল্যবান শব্দটি ঢুকেছে রাষ্ট্রভাষায়, সমৃদ্ধ হয়েছে রাষ্ট্রভাষা) কেরামতউদ্দিন, টু উইন দিস ইলেকশন, অ্যান্ড ইলেশনে আমাদের জিততেই হবে। দে আর রাসকেলস, উই ক্যানট অ্যালাও দেম টু রুল দি কান্ট্রি। দে বিলং টু দি স্ট্রিট, দে আর শ্লোগানমংগারস।

আমাদের আবার ক্ষমতায় আসতে হবেই, বলেন অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু। ('যেতে'র বদলে তিনি আসতে বলেন, তাঁর মনে হয় তারা এখনো ক্ষমতায় আছেন), পিপল আমাগো পক্ষে, আমরা ক্ষমতার বাইরে থাকতে পারি না, আমরা অই হারামজাদাগো হাতে দ্যাশ ছাইড়া দিতে পারি না। আমাদের ঠিক মতন ক্যান্ডিডেট দিতে হইবে, ঠিক মতন কাজ করতে হবে, আর মাননীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবকেও দরকার হইলে কাজে লাগাতে হবে।

মহাদেশনেত্রী জিজ্ঞেস করেন, ক্যান্ডিডেট করবেন কাদের?

তিনি একবার একটি সিংহাসন দেখতে পান; তাঁর চোখ একবার ঝিলিক দিয়ে উঠে আবার অন্ধকার যায়।

যারা জিতবো, যাদের ট্যাকা আছে, মাসেল আছে, যারা মুসলমান বলে প্রাউড ফিল করে, তাদের ক্যান্ডিডেট করতে হবে, বলেন রাজপুরুষ মোহাম্মদ সোলায়মান হাওলাদার, এককালের মাওপন্থি ছাত্রনেতা, আর আমাদের বংশের নীতি ত ঠিকই করা আছে। মাসেল আর ট্যাকা দরকার, ড্যামক্র্যাসিতে এই দুইটা ছাড়া হয় না।

মহাদেশনেত্রী বলেন, এইটা ভালো করে দেখবেন।

কেরামতউদ্দিন বলেন, ড্যামক্র্যাসি মিস্ মাসল প্লাস মানি, এটা ভুললে আমাদের চলবে না; ড্যামক্র্যাসিতে শুধু মানি ইজ নট ইনাফ।

আমাগো ক্যাডারগো রেডি রাখতে হইবো, বলেন লিয়াকত আলি মিয়া, সারা দেশে ছড়াই দিতে হইবো।

আমাদের ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে মাননীয় জেনারেলরা থাকবেন, ব্রিডেডিয়ার, কর্নেল, মেজর থাকবেন, তাঁরাই আমাদের বংশের মূলশক্তি, বলেন অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু, আর থাকবেন কয়েকজন মাননীয় বুরোক্র্যাট, ব্যারিস্টার; থাকবেন আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় ভাইরা যারা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ করেন নাই, যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন, আর ক্যাডারগো কয়জনরেও লইতে হইবো। আর মাননীয় মহাদেশনেত্রীর রিলেটিভরা তো আছেনই। খালি আমাদের পার্টি থেকে ক্যান্ডিডেট দিলে হইবে না, অন্য পার্টি থেকেও ভাগাইতে হবে।

দ্যাখতে হবে তাদের টাকা আছে কিনা, মাসেল আছে কিনা, বলেন ছয়ফুর চাকলাদার, দ্যাখতে হবে কয়টা ক্যান্দ্র দখলের শক্তি আছে তাগো। দ্যাখতে হইবে তারা হিন্দুগো বাড়িতে আটকাইয়া রাখতে পারে কিনা।

ক্যাডার আর মানি আমাগো প্রব্লেম না, বলেন রুস্তম আলি পন্টু, এই কয় বচ্ছরে এই দুইটা আমাদের হয়ে গেছে।

ইট উইল বি এ ফ্যানাটিকেলি রিলিজিয়াস ইলেকশন, এ হোলি ওয়ার, এ ক্রুসেড, বলেন রাজপুরুষ ব্যারিস্টার কুদরতে খুদা, সবার উপরে থাকবে আমাদের রাষ্ট্রধর্ম। মাননীয় ম্যাডাম প্রথম আমাদের কয়েকজনকে লয়ে ওমরা করবেন, জনগণের উপর ওমরার ইনফ্লুয়েন্স অত্যান্ত বেশি, আমরা মক্কায়ও আলোচনা করবো।

রাজাকার রাজবংশের সঙ্গে আমাদের একটা আতাত দরকার, খোজাগুলির সঙ্গেও বোঝাঁপড়া দরকার, বলেন মোহাম্মদ সোলায়মান হাওলাদার, অইবার রাজাকার রাজবংশ আমাদের হেল্প করছে।

তাদের রাজাকার বলা ঠিক না, বলেন ছয়ফুর চাকলাদার, তারা আমাদের দোস্ত; তাগো অবদান তোলন ঠিক না। তাছাড়া আমাদের মহান নেতা তাগো ভালোবাসতেন, তাগো অনেক পোস্ট দিয়াছিলেন।

কিন্তু অরা কি আমাগো সঙ্গে আসবো?, বলেন অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু, অরা তো আমাগো বিরুদ্ধে তিন বছর আন্দোলন করছে। অগো এতোগুলি সিট দিলাম, এতোগুলি মাইয়ালোক মেম্বার দিলাম; তারপরও অরা বিট্রে করলো।

মহদেশনেত্রী বলেন, পলিটিক্সে শেষ কথা বলে কিছু নেই।

আমরা সেইবার রাজাকারদের জন্যে পঞ্চাশটা আসন ছেড়ে দিয়েছিলাম, বলেন ব্যারিস্টার কুদরতে খুদা, অদের বলতে হবে এইবার ষাইটটা ছেড়ে দিবো যদি অরা পার্টনার হয়; আর খোজাবংশকে বলতে হবে আমাদের সাপোর্ট করলে অদের নেতাকে। জেল থেকে বের করে আনবো, সব মামলা খারিজ করে দিবো।

মহাদেশনেত্রী বলেন, কিন্তু আমি অকে জেলেই রাখতে চাই, অইটাকে আমি বাইরে দেখতে চাই না; আই হেইট হিম, হি ইজ এ কিলার।

মহাদেশনেত্রীর চোখের সামনে আবার সিংহাসন ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

তাইলে একটা উপায় আছে, বলেন রুস্তম আলি পন্টু, অর স্ত্রীর লগে আমরা মিট করতে পারি।

সবাই বলেন, অবশ্যই মিট করতে হবে, শি ইজ ভেরি পাওয়ারফুল ইন দি পার্টি।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, অর স্ত্রী খুবই অ্যামবিশাস, আর অর স্ত্রীও চায় না ও জেল থেকে বের হউক, তার কারণ আপনারা জানেন, অই মিস্ট্রেসগুলিন, আমরা অর স্ত্রীকে বুঝাইতে পারি যে তিনিই হবেন দলের নেত্রী। আমাগো লগে আসলে তাঁকে একদিন আমরা প্রধানমন্ত্রী করবো।

মহাদেশনেত্রী একবার রুস্তম আলি পন্টুর মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকান।

রুস্তম আলি পন্টু কেঁপে উঠে বলেন, অইটা টোপ, ম্যাডাম, অইটা পলিটিক্স।

মহাদেশনেত্রী স্মিত হাসেন, যদিও তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদটি দিয়ে পলিটিক্স পছন্দ করেন না; রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে আসে রুস্তম আলি পন্টুর।

আমরা জনগণরা শুনতে পাই এমন আরো অনেক নীতি আর আদর্শের আলোচনা হয় ওই সভায়; স্থির হয় ক্ষমতায় যেতেই হবে। ওই হারামজাদাদের হাতে ক্ষমতা। ছাড়ার থেকে সেই তাদের হাতে ছাড়া ভালো।

খোজাগণতান্ত্রিক রাজবংশের বৈঠক বসতেও কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়।

কারণ এ-রাজবংশের বাবর, দলের প্রতিষ্ঠাতা, মহাজননেতা কারাগারে আছেন, এখন বের হওয়ার সম্ভাবনা নেই, আর তাদের কয়েকজন রাজপুরুষও পলাতক, এবং কয়েকজন জনগণমন গণতান্ত্রিক ও শক্তির উৎসবাদী গণতান্ত্রিক রাজবংশে যাওয়ার জন্যে নানা পথ খুঁজছেন; তাই দলের রাজপুরুষেরা ঠিক করে উঠতে পারেন না কে তাঁদের দলের সভায় সভাপতিত্ব করবেন–মহাজননেতার পত্নী না উপপত্নী? তাঁর পত্নীকে যদি তাঁরা মহাগণনেত্রী করে তোলেন, তাহলে তাদের অনেক অসুবিধা রয়েছে; ওই মহিলার ক্ষমতা ও টাকার লোভের কোনো শেষ নেই, তাঁদের মহাজননেতাকে তিনি কতোদিন নিজের পায়ের নিচে ফেলে রেখেছেন এটা তাঁরা সবাই দেখেও দেখেন নি; আর যদি মহাজননেতার উপপত্নীদের কাউকে তারা মহাগণনেত্রী করতে চান, তাহলে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কোন জনকে করতে হবে, মহাজননেতার প্রতিদ্বন্দ্বী উপপত্নীর সংখ্যা কম নয়। (একত্রে রাখলে একটি তুর্কি হারেম হয়ে যেতো), আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে দেশের বর্তমান খাঁটি ইসলামি আবহাওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? উমাইয়া ও আব্বাসিয়া রাজাবাদশাদের বড়ো বড়ো হারেম ছিলো; কিন্তু খোজাবংশে হারেম থাকতে পারে কিনা?

এছাড়াও গভীরতর কারণ রয়েছে। রাজবংশটি এখন যিনি দেখছেন, যার ওপর মহাজননেতা ভার দিয়েছেন রাজবংশটির, সেই রাজপুরুষ মনোয়ার হোসেন মোল্লা তার বাসায় দশটি ডিজিটাল ও সেলুলার নিয়ে অপরিসীম ব্যস্ত রয়েছেন। একটির পর একটি টেলিফোন পাচ্ছেন তিনি; তাঁর স্ত্রী ধরছেন, তাঁকে দিচ্ছেন, তিনি ধরছেন, রাখছেন, কথা

বলছেন, রাখছেন, আবার ধরছেন। তিনি এখন খুবই ব্যস্ত, তার বেয়ে এবং বাতাসে ভেসে তাঁর কাছে প্লাবনের মতো পলিটিক্স আসছে; তিনি নিপুণভাবে পলিটিক্স করে চলছেন।

মনোয়ার হোসেন এখন সেলুলার পলিটিক্স করছেন জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশের অন্যতম প্রধান চাচা নিজামউদ্দিন আহমদের সাথে।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, বাবা মোয়ার, আমি তোমার আব্বারে মিয়াভাই বলতাম, তোমার আব্বা আমারে স্নেহ করতেন, তুমি আমার ছেলের মতন। কত দিন তুমি আমার কান্ধে উঠছে।

মনোয়ার হোসেন বলেন, সেইজন্যই তো আপনারে চাচা কই, চাচা; সেই জন্যেই তো আপনার লগে আমার একটা রিলেশন আছে।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, তুমি আমারে চাচা কও এটা আমার গৌরব, আরো গৌরব যে তুমিই এখন তোমাগো দলের নেতা, এইজন্যে আমার সুখের শ্যাষ নাই।

মনোয়ার হোসেন বলেন, কিন্তু চাচা কয়টা বুড়া শয়তান গোলমাল করতেছে, দলটা ভাঙতে চায়; ন্যাতার স্ত্রীও গোলমাল করতেছে।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, তা আমরা জানি, তয় তুমিই নেতা থাকবা; তোমার জননেতা তোমারে বিশ্বাস করেন।

মনোয়ার হোসেন বলেন, সেইটাই আমার পাওয়ার চাচা।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, এইবার তোমরা আমাদের লগে থাকবা, তুমি আমাদের লগে থাকলেই তোমার দলও আমাগো লগে থাকবো।

মনোয়ার হোসেন বলেন, চাচা, আপনাগো লগেই তো আছি; অই ম্যাডামের দলও ফোন করছিলো, আমি থাকতে রাজি হই নাই।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, ঠিক করছো, বাবা, ঠিক করছো; গ্রেট পলিটিশিয়ানের কাজ করছে।

মনোয়ার হোসেন বলেন, আমাদের মহাজননেতা আমারে এককথা বলে দিয়েছেন কিছুতেই আমরা ম্যাডামের সঙ্গে পার্টনারশিপে যাবো না। মহান জননেতাকে সে অনেক ট্রাবল দিয়েছে।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, তিনি খাঁটি পলিটিশিয়ানের মতই কথা বলছেন। তারে যারা জ্যালে রাখলো তাগো লগে তিনি যাইতে পারেন না। তিনি ড্যামোক্র্যাসিতে বিশ্বাস করেন।

মনোয়ার হোসেন বলেন, কিন্তু চাচা, এই বিষয়ে একটা ফাইনাল কথা হইতে হইবো, আমারে বড়ো কিছু দিতে হবে।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, ফাইনাল কথা তো হইবোই, তুমিও বড়ো কিছু পাইবা, মহাজননেত্রী তোমার লগে একটা গোপন বৈঠকে বসতে চাইছেন, তোমারে একটা বড়ো কিছু দিতে পারলে তিনি সুখী হইবেন।

মনোয়ার হোসেন মোল্লা বলেন, আমিও তাই চাই, আমার যা স্ট্যাটাস তাতে ছোটো কিছুতে আমারে মানায় না। আপনাদের জননেত্রীর সঙ্গে কয়েকটা কথা আমার ক্লিয়ার হওয়া দরকার।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, সব কথা ক্লিয়ার কইরাই হবে, বাবা, কথায় কোনো জট থাকবো না। আমরা পরিষ্কার দিলের মানুষ। আমরা ক্ষমতায় আসলে তোমারটা। তুমি সঙ্গে সঙ্গে পাইবা, বঙ্গভবনেই পাইবা, একদিনও দেরি হইব না, তুমি আমাগো হইয়া যাইবা।

মনোয়ার হোসেন টেলিফোন রেখে কফির পেয়ালায় চুমুক দেন।

মনোয়ার মোল্লার স্ত্রী বলেন, পলিটিক্স খুবই ইন্টারেস্টিং, ভেরি অ্যামিউজিং অ্যান্ড হাইলি অ্যাবজর্বিং, মাচ বেটার দ্যান মেকিং লাভ, আমিও পলিটিক্সে জয়েন করতে চাই, মনোয়ার।

মনোয়ার হোসেন মোল্লা বলেন, তোমাকে এবার পার্লামেন্টের মেম্বার কইর‍্যা ছাড়বো, স্বামীস্ত্রীর দুইজনেরই পার্লামেন্টে থাকন দরকার।

অন্য দিকে মহাজননেতার মহীয়সী স্ত্রী গুলবদন বেগমও ব্যস্ত আছেন সেলুলার। পলিটিক্সে। তিনি এখন কথা বলছেন শক্তির উৎসবাদী রাজবংশের অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টুর সাথে।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, আছোলামালেইকুম, ম্যাডাম, আপনার শরিলটা ভালো তো, ম্যাডাম?

গুলবদন বেগম বলেন, শরিলটা ভালো, তবে মনটা ভালো নাই।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, পলিটিক্সে শরিল ভালো থাকে, তাও থাকতে চায় না, ম্যাডাম; কিন্তু মন ভালো রাখন যায় না। আমার মনও ভালো না। অনেক মাস ধইর‍্যাই মনটা ভালো নাই।

গুলবদন বেগম বলেন, আপনাদের কী প্রপোজাল বলেন ভাই, পষ্টাপষ্টি কইর‍্যা বলেন, রাখঢাকা করবেন না।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, ম্যাডাম, আপনাগো লগে আমরা থাকতে চাই; আমরা এক লগে থাকলেই দ্যাশের মঙ্গল।

গুলবদন বেগম বলেন, শোনছেন বোধয় দলে নানা প্যাঁচ লাগছে, আমি সেই দলেই থাকবো যেই দলে সুবিধা পাবো, আই মিন পাওয়ার অ্যান্ড মানি। খালি কথা দিয়ে কেউ আমার মন ভিজাইতে পারবে না।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, আমরা আপনেরে পাওয়ারও দিবো মানিও দিবো, ম্যাডাম, খালি দয়া কইর‍্যা আমাগো লগে থাকবেন।

গুলবদন বেগম বলেন, এই সম্বন্ধে একটা ক্লিয়ার আর ফাইনাল কথা হওন দরকার, আপনেরা কী কী দিবেন।

রুস্তম আলি বলেন, ফাইনাল কথা বলার জন্যে আমরা কয়জন আপনের কাছে আসতে চাই, ম্যাডাম।

গুলবদন বেগম বলেন, আসেন, আমি আপনাদের জন্যে ওয়েট কইর‍্যা রইলাম।

গুলবদন বেগম টেলিফোন রাখার সাথে সাথে আবার বেজে ওঠে। তবু তিনি না ধরে বিয়ারের গ্লাসে একবার চুমুক দেন।

এবার ফোন করেছেন জনগণমন দলের মোহাম্মদ আবদুল হাই। মোহাম্মদ আবদুল হাইয়ের সাথে গুলবদন বেগমের সম্পর্কটি অনেক বছর ধরে বেশ ভালো; নিয়মিতভাবে তিনি গুলবদন বেগমকে ফোন করেন।

মোহাম্মদ আবদুল হাই বলেন, আসোলামুআলাইকুম, ম্যাডাম। অনেক সময় ধইরা চ্যাষ্টা করছি, লাইন অ্যানগেজড আছিল।

গুলবদন বেগম বলেন, এখন তো লাইন অ্যানগেজড় থাকনেরই সময়, ভাই।

মোহাম্মদ আবদুল হাই বলেন, লাইনে আপনারে না পাইয়া অস্থির হইয়া উঠছিলাম, ম্যাডাম।

গুলবদন বেগম বলেন, আমিও মনে মনে আপনার কথা ভাবতেছিলাম, ফাইনাল ক্লিয়ার কথার জইন্যে কখন বসবেন?

মোহাম্মদ আবদুল হাই বলেন, আপনে সময় দিলে আজই বসতে চাই, ম্যাডাম; আপনেরে সন্তুষ্ট করার কথা বলেছেন আমাদের মহাজননেত্রী।

গুলবদন বেগম বলেন, কিন্তু শুনতে পাই আপনেরা মনোয়ার মোল্লার সঙ্গে দ্যানদরবার করছেন, সে তো আমাদের সার্ভেন্ট মাত্র।

আবদুল হাই বলেন, পলিটিক্স হইছে গুজবের ব্যবসা, ম্যাডাম, এইখানে সত্যমিথ্যার মধ্যে তফাৎ করন যায় না। আপনি, ম্যাডাম, গুজবে কান দিবেন না; আমাগো দল আর আপনের দল মিলেমিশেই কাজ করবো। অই মাইয়ালোকটার হাত থেকে ক্ষমতা বাইর করতেই হবে, নাইলে আপনার প্রাণপ্রিয় স্বামী মহাগণনেতাকে জ্যাল থেকে বাইর করন যাইবো না।

গুলবদন বেগম জিজ্ঞেস করেন, আপনেরা কি অই লোকটারে জ্যালের বাইরে আনবেন?

আবদুল হাই বলেন, অবশ্যই আনবো, ম্যাডাম, আপনে দেইখ্যেন।

গুলবদন বেগম বলেন, তবে অই লোকটা আমার বেশি চিন্তার বিষয় না; সে জ্যালের ভেতরে থাকলেই ভাল। কথা হচ্ছে আপনেরা আমারে কী দিবেন?

আবদুল হাই বলেন, আপনে যা চাইবেন তাই পাইবেন।

গুলবদন বেগম বলেন, অরা আমারে প্রধানমন্ত্রী করতে চায়, এইরকমই ইঙ্গিত দিছে।

আবদুল হাই একটু থমকে যান, কথা বলতে একটু সময় নেন, এবং বলেন, আমরাও সেই কথাই ভাবতেছি।

গুলবদন বেগম বলেন, কোন সময় আসবেন বলেন।

গুলবদন বেগম আবদুল হাইকে বিকেলে সময় দেন; আবদুল হাই টেলিফোন রেখে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে চিৎকার করে ওঠেন, এই মাইয়ালোকটা একটা বুড়ী বিচ।

খোজারাজবংশের বৈঠক বসলে দেখা যায় অনেক রাজপুরুষই অনুপস্থিত; কিন্তু মনোয়ার হোসেন মোল্লা বৈঠক শুরু করেন। মহাজননেতার স্ত্রী গুলবদন বেগমও বৈঠকে আসেন নি, মহাজননেতা মনোয়ার হোসেনকে নিষেধ করেছেন তাঁকে বৈঠকে ডাকতে। তার বদলে উপস্থিত আছেন মহাজননেতার প্রিয়তমা উপপত্নী বেগম মর্জিনা আবদুল্লা।

মনোয়ার হোসেন প্রথম মহাজননেতার সাথে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেন।

মনোয়ার হোসেন মোল্লা বলেন, আমাদের লিডার খুবই কষ্টে আছেন, তিনি শীঘ্র বাইরে আসতে চান।

বেগম মর্জিনা আবদুল্লা বলেন, আমাকেও মহাজননেতা তাই বলেছেন। তার কষ্ট দেখে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। হি ওয়াজ এ কিং আর এখন তিনি একটা চোরের মতন আছেন। তারে তাড়াতাড়ি বাইর করতেই হইবো।

বুড়ো শাহ আলম চৌধুরী জিজ্ঞেস করেন, লিডার কীভাবে মুক্তি পাইতে চান? লিডাররে আমরা কেমনে বাইরে আনতে পারি?

বুড়ো একটু ক্ষুণ্ণ, কেননা তার বদলে লিডার দলের ভার দিয়েছেন মনোয়ার হোসেন মোল্লার ওপর, যে তার পোলা হতে পারতো।

মনোয়ার হোসেন বলেন, লিডার বোঝেন এইবার আমরা ক্ষমতায় যাইতে পারবো না, যারা পাওয়ারে যাবে তাদের লগে গোপনে অ্যালায়েন্স করতে হবে। চুক্তি হবে লিডারকে ইমমেডিয়েটলি রিলিজ করতে হবে, আর আমাগো দলরে সুবিধা দিতে হবে।

বেগম মর্জিনা আবদুল্লা বলেন, মহাজননেতাকে রিলিজ করাই আমাদের প্রধান পলিটিক্স। তাইলেই আমাগো দল আবার দাঁড়াইবো। যে ছিলো দেশের রাজা, যার জইন্য জনগণ পাগল তারে অরা জ্যালে বাইন্ধা রাখছে। দিন আসলে এইটা দেখাইয়া দিব, জ্যাল খাটাইয়া ছাড়বো।

মোহাম্মদ ইমাজউদ্দিন ঝন্টু জিজ্ঞেস করেন, আমাগো দল হতে মন্ত্রী করা হইবো না?

শাহ আলম চৌধুরী বলেন, তা অবশ্যই করতে হইবো; আমাগো কয়জনরে মন্ত্রী করতে হইবো। যারা আমাগো মন্ত্রী করবো আমরা তাগো লগেই থাকুম; কিছু ট্যাকাপয়সাও দিতে হইবো।

মনোয়ার হোসেন বলেন, তা ডিপেন্ড করে আমরা কয়জন পাশ করি তার উপর, আমাগো কমপক্ষে পঞ্চাশটা সিট পাইতে হবে।

ব্যারিস্টার শাহেদ মিয়া জিজ্ঞেস করেন, আমরা কি এতগুলা সিট পাবো, আমাদের দলের কি অই অবস্থা আছে।

ব্যারিস্টার শাহেদ মিয়ার আজকের বৈঠকে আসার ইচ্ছে ছিলো না, তিনি আগে ছিলেন শক্তির উৎসবাদী রাজবংশে; আবার সে-রাজবংশে ফিরে যাওয়ার জন্যে তিনি গোপনে প্রাণপণে চেষ্টা করে চলছেন।

মনোয়ার হোসেন বলেন, আমাগো চ্যাষ্টা করতে হবে, উই মাস্ট ট্রাই আওয়ার বেস্ট; লিডার বাইরে থাকলে আমরাই ক্ষমতায় যাইতাম, পিপল তার জইন্যে পাগল; জ্যালে থিকাও একশোটা সিটে দাঁড়াইলে তিনি একশোটা সিটেই পাশ করবেন। কিন্তু আমাগো পঞ্চাশটা সিট পেতে হবে।

সভায় ঠিক হয় মনোয়ার হোসেন মোল্লা মহাজননেতার সঙ্গে আলাপ করে ব্যবস্থা নেবেন।

রাজাকার রাজবংশের এক বড়ো নেতা মওলানা রহমত আলি ভিস্তিও খুবই ব্যস্ত। রয়েছেন সেলুরার (আল্লা পরম দয়ালু, যিনি মানুষরে দিয়াছেন এই পবিত্র জিনিশটি, যা নিয়ে এখন, আমরা দেখতে পাই, আমাদের গার্মেন্টস্ আর পলিটিক্সরা খুবই ব্যস্ত) পলিটিক্সে; আল্লাতাআলার রহমতে তাঁর কাছে বাতাসে ভেসে আসছে থরেথরে দলে দলে পলিটিক্স। তৃতীয় বিবি মাঝেমাঝে পান আর শরবত দিয়ে যাচ্ছেন, গিয়ে দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকছেন, আর পলিটিক্স করে চলছেন মওলানা রহমত আলি ভিস্তি। ওই যে আমাদের একটি মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো, যার কথা আমরা ভুলেই গেছি, খুব না ঠেকলে যার কথা বলতে আমরা বিব্রত হই, যার কথা বললে অন্যরা কেমন চোখে তাকায়, যাতে পাকিস্থানিরা আমাদের খুনের পর খুন করেছিলো, মাবোনকন্যাদের ঘর থেকে টেনে নিয়ে ধর্ষণ করেছিলো, কিন্তু আমরা জয়ী হয়েছিলাম যে-যুদ্ধে, ভিস্তি সাহেব সেই সময় ছিলেন এক মস্ত বড়ো রাজাকার। শুনতে পাই তিনি ছিলেন খুন আর ধর্ষণের এক বড়ো সিপাহিসালার, ইখতেয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি, আঠারো নম্বর গাধাটিতে তিনি ছিলেন, মাথার ওপর তলোয়ার লড়াইতে লড়াইতে তিনি বঙ্গদেশে। এসেছিলেন; তবে খুন হয়ে আর ধর্ষিত হয়ে আমরা মাথা নিচু করি নি (এটা কেমনে হয়েছিলো আজ আর আমরা বুঝতে পারি না, এখন তো আমরা সব সময় মাথা নিচু করেই থাকি); আমরা জয়ী হয়েছিলাম। জয়! আমাদের জীবনের একমাত্র জয়। জয়ের পর স্বাধীন হই আমরা, আর বছরের পর বছর পরাজিত হতে থাকি; এবং ভিস্তি সাহেবরা পরাজয়ের পর বছরের পর বছর জয়ী হতে থাকেন। একাত্তরের সেই বছরটিতে দেশে এতো রাজাকার ছিলো না, আর এখন আমরা চারপাশে তো দেখতে পাই রাজাকার। এখন আমরা, মূর্খ লোকেরা, দেখি আমাদের পরাজয় আর ভিস্তি সাহেবদের জয়। আমরা এখন ভয়ে ভয়ে কথা বলি, কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছি; আর ভিস্তি সাহেবরা গলা ফুলিয়ে আমাদের খুন করে ফেলার ভয় দেখান; আমরা চোখ বুজে থাকি। আল্লা তাদের খুন করার তওফিক দিয়েছেন।

রাজাকারদের নেতা হয়ে ইমানআমান তিনি প্রথমেই পরীক্ষা করেন বাসার কাজের মেয়েটির ওপর। পাকিস্থানে যার বিশ্বাস আছে, তার আবার ভয় কী, তার আবার খুন জখম জেনা করার দ্বিধা কী। শ্বশুরবাড়ি থেকে মাসখানেক আগে তিনি সালেহা নামের কাজের মেয়েটিকে এনেছিলেন; তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী, কাজকাম করতে পারে না, শুধু চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। আনার পর তিনি মেয়েটিকে মন দিয়ে ধর্মকর্ম শেখান, এবং শেখানোর সময় মাঝেমাঝে মেয়েটির বুকের কাপড়ের নিচে হাত দিয়ে শিক্ষার উচ্চতা পরীক্ষা করেন। মেয়েটি ভিস্তি সাহেবের হাত সরিয়ে দিয়ে একটু দূরে গিয়ে ভিস্তি সাহেবের সাথে সাথে শ্লোক আবৃত্তি করতে থাকে।

একদিন তাঁর স্ত্রী গোসলখানায় ঢুকলে ভিস্তি সাহেব তাকে রান্না ঘরে চিৎ করে শোয়ানোর চেষ্টা করেন।

২. আমরা সাধারণ জনগণ

আমরা সাধারণ জনগণ, গরিব মূর্খ অসহায় মানুষ, সারাক্ষণ খুন হওয়ার ভয়ে আছি, এই ইতিহারে বাকিটা কি আর বলতে পারি? আমাদের কি সেই সাহস আছে? একাত্তর সালে সাহস ছিলো, তখন আমাদের মরার ভয় ছিলো, কিন্তু সাহসও ছিলো, ওই সময়টা আমাদের ছিলো; এখন আমাদের মরার ভয় আরো বেশি, কিন্তু সেই সাহস নেই, এই সময়টা আমাদের না। একাত্তরে ভিস্তি সাহেবরাও আমাদের ভয় পেতেন, আজ শুধু আমরাই তাদের ভয় পাই; তারা আমাদের ভয় পান না। হায়, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় গেলো? তারা সবাই মরে গেছে? তখন যারা যুদ্ধ করেছিলো আর এখনো বেঁচে আছে, তারা তো আর মুক্তিযোদ্ধা না। বাকিটা বললে ভিস্তি সাহেবরা আমাদের টুকরা টুকরা করে ফেলবেন না? তবে মুখে যখন ইতিহাসটা এসেই গেছে, চোখ বুজে একবার বলেই ফেলি; তাতে আমাদের শিরার ভেতরের রক্ত একটু ঠাণ্ডা হবে, একটু সাহস পাবো।

সালেহা চিৎ হতে চায় না, তবু চিৎ হতে হয়; এবং সে চিৎকার করে বলে, হুজুর, এইডা আপনে কী করতাছেন, আল্লায় দ্যাখতাছে। আপনে গুনার কাম করতাছেন, হুজুর, আমারে ছাইড়া দ্যান।

ভিস্তি সাহেব তাকে ছাড়েন না; কিন্তু মেয়েটির শরীরে জোর আছে, সে ভিস্তি সাহেবের অণ্ডকোষে চাপ দেয়। ভিস্তি সাহেব ব্যথায় চিৎকার করে ওঠেন।

সালেহা উঠে দাঁড়ায়, ঘোমটা দিতে দিতে বলে, এমুন করলে হুজুর, আমি। খালাম্মারে কইয়া দিমু, আল্লায় আপনেরে দোজগে দিব। আপনে মাইষের বাচ্চা না, আপনে একটা জানোয়ারের পয়দা।

ভিস্তি সাহেবের বলতে ইচ্ছে হয়, তুই আমারে ঠিক চিনছস, সালেহা, আমি কতো বড়ো জানোয়ার তা তরে না, সারা দেশরে দেখাইয়া দিমু।

তবে তিনি তা বলেন না, তিনি সালেহার পা ধরে বলেন, তুই কইছ না, সালেহা, আমারে তুই মাপ কইর‍্যা দে। তরে আমি মহব্বত করি, তরে আমি বিয়া করুম। আইজ রাইতে তর লগে আমি থাকুম।

সালেহা বলে, বিয়ার আমার কাম নাই, এমুন জাউরার লগে আমি বিয়া বহুম না, গ্যারামে আমারে কতজনে বিয়া করতে চায়।

মেয়েটির পেটে একটা ছুরি ঢুকিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় ভিস্তি সাহেবের; কিন্তু মেয়েটির শরীরে এতো গোস্ত, আর ওই গোস্তে এতো মশলা, তা ভালো করে খাওয়ার আগে ছুরি ঢাকোনো ঠিক হবে না বলেই তার মনে হয়। নিজের বিবির শরীরে তিনি গোস্ত খুঁজে পান না, শিনার দিকেও কোনো চর্বি আর গোস্ত পান না, তাই তাকে ভেঙেচুরে তিনি কিছু একটা করেন; কিন্তু সালেহাকে তার মনে হয় কোরবানির চর্বিঅলা গাভীর মতো, যার দেহভরা চর্বি আর ওলানভরা জমাট দুধ। সালেহাকে তিনি এরপর আরো কয়েকবার চিৎ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু পেরে ওঠেন না; মেয়েটি যেমন চালাক, তেমনি শক্তিমান। তিনি শুভদিনের অপেক্ষায় থাকেন, নিশ্চয়ই দিন আসবে, যেদিন তিনি সালেহার গোস্ত খাবেন।

রাজাকারদের সিপাহসালার হয়ে যে-রাতে তিনি বাসায় ফেরেন, ফিরতে ফিরতে ঠিক করেন তাঁর পাকিস্থানে বিশ্বাসটা তিনি প্রথম পরীক্ষা করবেন সালেহার ওপরই। ওই মাইয়াটা দেখতেশুনতে এই দেশটার মতোই, ওর শরিলে একটা জয়বাংলা জয়বাংলা গন্ধ আছে; অর শরিলের জয়বাংলা ছাড়াইয়া দিতে হবে, ওইখানে পাকিস্থান জিন্দাবাদ ঢুকাইয়া দিতে হইবে। পাকিস্থানে যার ইমান আছে, তাকে কোনো কিছুই আটকাতে পারে না, তার সামনে কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

সালেহা দরোজা খুলে দেয়ার পরই তিনি তাকে জোরে জড়িয়ে ধরে রান্না ঘরে নিয়ে ধর্ষণ করেন। সালেহার একটি নখ তার গালে বিধে যায় (ওই দাগটা এখনো আছে), সালেহার চিক্কারে তাঁর বিবি কাঁপতে কাঁপতে রান্না ঘরে এসে দেখে ভিস্তি সাহেব সালেহার গলা চেপে কাজ করে চলছেন।

বিবি চিৎকার করে ওঠে, হুজুর, আপনে এইটা কী করতাছেন? আপনের গুনা হইতাছে। আল্লারসুলের কথা মনে আনেন।

ভিস্তি সাহেব উঠে দাঁড়ান, এবং স্ত্রীকে একটা চড় মারেন। স্ত্রী ঘুরে পড়ে যায়, তবু উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আপনে জিনা করতাছেন, আমার ভাগ অন্য মাইয়ালোকরে দিতাছেন, আপনে দোজগে যাইবেন।

ভিস্তি সাহেব বলেন, বিবি, তুমি ভাইবো না, বান্দির লগে সহবত করলে জিনা হয়, গুনা হয় না। বান্দি মনিবের মাল।

বিবি কাঁদতে কাঁদতে বলে, এই কথা আমি মানি না, আপনে জিনা করছেন, অন্য মাইয়ালোকের ইজ্জত নষ্ট করছেন। আল্লা আপনের লিগা দোজগ লেইখ্যা রাখছে, আপনে হাবিয়ায় যাইবেন।

ভিস্তি সাহেব বলেন, বিবি, চুপ থাকো; আরেকটু টু শব্দও শুনতে চাই না।

বিবি বলে, আমি চুপ থাকুম না।

ভিস্তি সাহেব বিবিকে একটা চড় মারেন, বিবি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়; তিনি আবার সালেহাকে ধর্ষণ করেন।

এখন তার সাথে পলিটিক্স করছেন শক্তির উৎসবাদী বংশের নেতা অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু, এবং তিনি পলিটিক্সে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন পন্টুকে। আমরা জনগণরা দেখেছি এককালে তারা অনেক বছর এক সাথে ছিলেন, দেখে আমাদের ভালো লাগতো, খুশি হতাম আমরা, দুই রাজবংশের মধ্যে শাদিই হয়ে গিয়েছিলো বলে আমরা ভাবতাম, তারপর আবার তালাক হয়ে যায়। রাজবংশগুলোর শাদি আর তালাকে আমরা অবাক। হই না, বিবাহ হলে তো তালাক হতেই পারে, এটাকে আমরা রাজনীতি মনে করি।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, আস্সালামুআলাইকুম, মওলানা রহমত আলি। ভিস্তি সাহেব, আমার সেলাম নেন। অনেক দিন পর কথা বলছি, গলাটা চিনতে পারছেন কি না জানি না।

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, ওআলাইকুমসাল্লাম ওআ রহমতুল্লাহে বরকত হু, আপনে কে কথা বলতাছেন, ভাইজান? আপনের গলাটা চিনা চিনা লাগছে।

রুস্তম আলি বলেন, আমি অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলতেছি। চিনতে পারতেছেন ভাইজান?

রহমত আলি ভিস্তির দিলটি প্রথম একটু বেজার হয়, পরমুহূর্তেই শান্ত হয়ে ওঠে; এবং বলেন, ভাইজান, আপনেরে চিনবো না ক্যান? আপনে দেশের বড় ন্যাতা, অনেক বছর সামনা সামনি দেখা নাই, তয় ভোলনের কথাই ওঠে না।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি বলেন, ভাইজান, এক সোম ত আমরা এক লগেই আছিলাম, আবার এক লগেই থাকতে হইব, আপনের লগে আমি একটু বসতে চাই, মহাদেশনেত্রীও বসতে চান আপনার লগে। আমাগো মহাদেশনেত্রী আপনের কথা মাঝেমাঝেই বলেন আইজকাল।

মওলানা রহমত আলি ভিস্তি বলেন, বসন ত লাগবোই, ভাইজান; খালি রাস্তায় ত পলিটিক্স হয় না, না বসলে আসল পলিটিক্স হয় না। আপনেগো মহাদেশনেত্রীর কথাও আমরা সব সময় কই।

রুস্তম আলি বলেন, রাস্তার পলিটিক্স ত লোকদ্যাখাইন্যা পলিটিক্স, আসল পলিটিক্স হইছে একখানে বইস্যা পলিটিক্স।

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, বলেন ভাইজান, আপনের কথা বলেন।

রুস্তম আলি বলেন, দ্যাশটা হারামজাদা ইন্ডিয়ার দালালগো হাতে চইল্যা যাইবো আবার এইটা ত আপনেরাও চান না, আমরাও চাই না। অগো হাতে গেলেই দ্যাশটা তিনদিনেই বেইচ্যা দিব, দ্যাশে একটাও মুসলমান থাকবো না। আমরা ইসলামের জইন্যে বড়োই চিন্তিত।

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, না, ভাইজান; এইটা মুসলমানের দ্যাশ, মুসলমানের হাতেই থাকতে হইবো, নাইলে দ্যাশটা কাফের হইয়া যাইবো।

রুস্তম আলি বলেন, ভাইজান, আমরা আইজ আছি কাইল নাই, আমাগো থাকন না থাকন কথা না, কথা হইলো ইসলাম থাকতে হইবো। ইসলাম থাকলেই আমরা থাকুম। ইসলামের জন্যেইতো আমাগো মহান ন্যাতা আপনেগো জ্যাল থিকা বাইর করে আনছিলেন, দলরে দাঁড়াইতে দিছিলেন।

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, হ, ভাইজান, পলিটিক্স ত করি ইসলামের লিগা, নিজের লিগা করি না; আর আপনেগো মহান ন্যাতা আমাগোও মহান ন্যাতা।

রুস্তম আলি বলেন, ভাইজান, তাইলে আইজ বৈকালে আসেন আমরা বসি।

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, ভাইজান, আপনের কথা ফ্যালন যায় না, তয় বৈকালে দলের মজলিশ আছে, আর বসনের সময় আরো পাইবো।

রুস্তম আলি বলেন, ভাইজান, মনে হয় আমাগো উপর আপনে বেজার হইয়া আছেন। বেজার হইয়েন না, আমরা মাফ চাই, ভাইজান।

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, ভাইজান, আমি বেজার না, তয় আমাগো আমির সাহেবের সাথে কথা না কইয়া বসতে পারি না, বোঝতেই পারছেন।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, আইজ রাইতেই আবার ফোন করুম, ভাইজান।

রুস্তম আলি পন্টু রাখার সাথে সাথেই আবার সেলুলার বেজে ওঠে মওলানা রহমত আলি ভিস্তির। এ-ফোনটির জন্যেই মনে মনে অপেক্ষা করছিলেন ভিস্তি সাহেব, পেয়ে তিনি শান্তি পান।

এখন সেলুলার চলছে জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশের অন্যতম চাচা মোহাম্মদ রজ্জব আলির সাথে।

মোহাম্মদ রজ্জব আলি বলেন, মওলানা সাহেব, আমাদের মইধ্যে আগে থিকাই ত কথা হয়ে আছে, এখন আমাদের একবার বসন লাগবো। শোনতাছি শক্তিয়ালারা নানা রকম কন্সপিরেছি করতাছে। আমাগো এক লগে থাকতে হইব, আন্দোলনে আমরা যেমুন একলগে আছিলাম।

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, ভাইজান, আপনেগো মহাজননেত্রীর লগে কি সেই সম্পর্কে কথা হইছে, অই যে আমরা ষাইটটা সিট চাইছিলাম? অই কটা সিট আমাগো লাগবো, ভাইজান।

রজ্জব আলি বলেন, তা হইছে মওলানা সাহেব, তবে একসঙ্গে বইস্যা সব ঠিক করুম, সিট ত স্ট্র্যাটেজির ব্যাপার, দ্যাখতে হইব তাতে আপনাগো কী লাব আর আমাগো কী লাব। খালি বেশি সিট লইলেই ত কাম হইব না।

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, অইবার অরা আমাগো পঞ্চাশটা সিট দিছিলো, এইবার আরো বেশি দিতে চায়।

রজ্জব আলি বলেন, মওলানা সাহেব, এইবার আপনাগো নিজেগো অবস্থা অ্যামনেই ভাল, তবু একটা মিলমিশ করন যাইব। আর মওলানা সাহেব, আপনে ত পলিটিশিয়ান, তিন বচ্ছর আমাগো লগে থাইক্যা আপনাগো কতো উপকার হইছে ভাইব্যা দেখেন।

এখন আমরা আর আপনেগো রাজাকার কই না।

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, হ, ইনশাল্লা, আমাদের অবস্থা আগের হইতে অনেক ভাল, এইবার আমরা নিজেরাই পঞ্চাশটা সিট পামু; আমাগো ছাড়া কারো চলবো না। দ্যাশে ইসলামের অবস্থা আগের থিকা অনেক ভাল।

রজ্জব আলি বলেন, এই জন্যেই তো আপনেগো এই বচ্ছর এভো দাম, আমরা ক্ষমতায় যাইতে পারলে আপনেগো অবস্থা আরো ভাল কইরা দিমু। আর ভাই, ইসলামের লিগা আমরাও জান দিয়া দিতেছি।

তারা ঠিক করেন পরের দিন তারা বসবেন।

রাজনীতিবিদরা, আমাদের রাজাবাদশারা, মহান মানুষ, তারা আমাদের প্রভু; তাঁরা যা বোঝেন তা তো আমরা বুঝি না; তারা যেখানে দরকার সেখানে বসতে পারেন, তাদের গায়ে ময়লা লাগে না; সব কিছু মনে রাখলে তাদের চলে না। আমরা জনগণরা মূর্খ মানুষ, আমাদের মাথায় ঘিলু কম, হয়তোবা একেবারেই নেই, তাই আমরাও অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না; কিন্তু অনেক কিছু আমাদের মনে থাকে, আবার মনে থাকলেও আমরা তা ভুলে থাকি। মনে থাকলে কী হবে? আমাদের করার কী আছে? যেমন সালেহার কথা আমরা ভুলে গেছি, আবার সালেহার কথা আমাদের মনেও আছে। এখন তার কথা মনে পড়ছে, যখন আমাদের রাজারা একে অন্যের সাথে মিলেমিশে বসছেন, সালেহাকে ভুলে গেছেন–দেশে সালেহা নামের কেউ ছিলো না।

ভোরে রহমত আলি ভিস্তি সাহেব যখন নামাজ পড়ছিলেন, তখন সালেহা একটি বঠি নিয়ে তার পেছনে এসে দাঁড়ায়; এবং যখন কোপ দিতে উদ্যত হয়, ভিস্তি সাহেবের বিবি অই সালেহা কী করতাছছ, অই সালেহা কী করতাছছ বলে চিৎকার করে সালেহাকে জড়িয়ে ধরে।

সালেহা কেঁদে ওঠে, আমি এই জানোয়ারডারে জব করুম, আমি এই জানোয়ারডারে জব করুম। জানোয়ারডা রাইত ভইর‍্যা আমার দ্যাহডারে আস্ত রাখে নাই।

ভিস্তি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান; এবং চড় দিয়ে সালেহাকে মেঝেতে ফেলে দেন।

তার বিবি বলে, হুজুর, মাইয়াডারে আইজই বাইড়তে পাঠাইয়া দেন।

ভিস্তি সাহেব বলেন, হ, আইজ রাইতেই পাঠামু।

সন্ধ্যার পর ভিস্তি সাহেবের বাড়ির সামনে একটি আর্মির জিপ এসে থামে। জিপের পেছন থেকে নেমে আসেন ভিস্তি সাহেব ও পবিত্র পাকিস্থান আর্মির কয়েকজন খাঁটি জওয়ান।

তারা সালেহাকে চেপে ধরে জিপে উঠোয়, সালেহা নড়তে ও চিৎকার করতে পারে না। পাকিস্থান জিন্দাবাদ বলে তারা গলি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে যায়।

ভিস্তি সাহেবের বিবি জিজ্ঞেস করে, হুজুর, সালেহারে কই পাঠাইলেন?

ভিস্তি সাহেব বলেন, ছেমরিরে চিরকালের লিগা বাড়িতে পাঠাইলাম।

ভিস্তি সাহেবের বিবি কেঁদে ওঠে, হুজুর, আমারেও পাঠাইয়া দেন।

এসব কথা আমরা ভুলি কী করে, আর মনে করে রাখিই কী করে? সকালে উঠে আমাদের ক্ষেতে যেতে হয়, দুপুরেও বাড়িতে ফিরতে পারি না, ক্ষেতের আলে বসেই শানকিতে করে দুটা ভাত খাই; আমাদের মুদিদোকানটা খুলে বসতে হয়, খরিদ্দারের আশায় বসেই থাকি; কলে কাজ করতে গিয়ে আমাদের গেটেই বসে থাকতে হয়, সারাদিন আর সময় পাই না; সারা রাত আমরা নদীতে মাছ খুঁজি, পাই না; আর অফিসে গিয়ে অফিস পালিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গামছাটা লুঙ্গিটা বেচতে হয়; আর কাজকাম না পেয়ে আমাদের নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়, গাড়ির নিচে পড়তে ইচ্ছে হয়। আমাদের রক্ত জ্বলতে জ্বলতে ঘোলা হয়ে গেছে। এসব কথা আমাদের মনে রাখার মতো ম

রাজাকার রাজবংশে, আমরা জনগণরা শুনতে পাই, চলছে দারুণ উত্তেজনা; এবং আমরা মনে মনে ভয় পেতে থাকি।

দাড়ি আর চুলে রাজাকার রাজপুরুষেরা নতুন কলপ লাগিয়েছেন, কাঁচাপাকা দাড়ি হয়ে উঠেছে ঝলমলে কালো আর মেহেদি রঙের, সুরমা দিয়েছেন চোখে, নতুন পাজামা আস্কান টুপি আর চোস্ত পাজামায় সেজেছেন, শরীর থেকে আতরের খুশবু ঝরঝর ঝরছে। মনে হচ্ছে তিন আর চার নম্বর বিবিকে ঘরে তুলতে যাচ্ছেন, শাদিমোবারকের আবহাওয়া তাদের চারদিকে। ওই রাজপুরুষদের চোখ সব সময়ই ছুরির মতো ঝকঝক করে, মনে হয় চোখের ভেতর কয়েকটা জল্লাদ বসে ছুরি শানাচ্ছে, নতুন সুরমায় আরো ঝকঝক করছে, এখনি কারো বুকে ঢুকে লাল হয়ে উঠতে পারলে আরো ঝকঝক করতো। ধর্মে তারা দেশ ভরে ফেলেছেন, এতো ইসলাম দেশে আগে কখনো ছিলো না, এটা তাদের সাফল্য; দেশে আর কয়েকটা কাফের আর মুরতাদ মাত্র বাকি, ওইগুলোকে দমিয়ে দিতে খুন করে ফেলতে পারলে আসবে তাদের রাজত্ব। তাঁদের সাফল্য অশেষ, এক সময়ের কুখ্যাত ঘৃণিত

রাজাকার থেকে তারা হয়ে উঠেছেন। মূল্যবান শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদ, সবই আল্লার দান; এখন ওই মুক্তিযোদ্ধাগুলো তাঁদের পায়ের নিচে বসতে পারলে ধন্য হয়। ভুল বলা হয়ে গেলো, দেশে আর মুক্তিযোদ্ধা কই?

তাদের বড়ো বড়ো আমিরওমরাহরা, আলখাল্লা নেতারা, অধ্যাপক, মওলানারা আর মৌলভিরা পাজেরো হাঁকিয়ে আসেন, ওই যানবাহনটি কাফেররা তৈরি করেছে, তবে ওইটিকে তারা ধর্মে দীক্ষিত করে নিয়েছেন। তাঁদের হাতে সেলুলার; আস্কানের নিচে কী আছে তা আমরা জনগণ বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই যা থাকার তা-ই আছে।

মাগরেবের পর রাজাকার রাজবংশের মজলিশে শুরা বসে। এই রাজবংশের রাজপুরুষেরা সব সময়ই সাবধান, সশস্ত্র প্রহরী ছাড়া তারা চলেন না, কার্যালয়ের চারদিকে পাহারায় রাখেন সশস্ত্র ধার্মিক প্রহরীদের, মোমেনিন সালেহিনদের, যারা হাত আর পায়ের রগ কাটতে পারে চোখের পলকে, গলা কাটতে সময় নেয় আধ মিনিট। প্রহরীরা আজ আরো সাবধান।

রাজাকার রাজবংশের আমির প্রথম আল্লা ও রসুলকে ধন্যবাদ জানান।

আমির সাহেব বলেন, বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম, আল্লার রহমতে আমাদের অবস্থা বছরের পর পর উত্তম হইতেছে, আমাদের নেতা আবু আলা মওদুদি সাহেবের নির্দেশিত পথে আমরা অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছি; অরা আমার নাগরিকত্ব কাড়িয়া নিয়াছিলো, আল্লায় তা আমাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। কাফেররা এইভাবেই মমিন মোসলমানের উপর

অত্যাচার করে, কিন্তু আল্লার রহমতে মমিনের জয় হইবেই, অদের উপর গজব নাজিল হইবে।

সবাই বলেন, আলহামদুলিল্লা।

আমির সাহেব বলেন, আল্লার ইসলামে ড্যামোক্র্যাসি নাই ইলেকশন নাই ভোটার নাই এসেম্বলি নাই পার্লামেন্ট নাই, এইগুলি সব ইহুদি আর খ্রিস্টান কাফেররা তৈরি করেছে, আমরাও ড্যামোক্র্যাসি আর ইলেকশনে বিশ্বাস করি না, আল্লা তা নিষেধ করে দিয়াছেন, ইসলামে আছেন এক আল্লা, আল্লার আইন, আর আল্লার শাসন। আল্লার শাসনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

সবাই গভীর স্বরে বলে ওঠেন, আলহামদুলিল্লা।

আমির সাহেব বলেন, আল্লার রহমতে আমরা একদিন অবশ্যই কায়েম করব আল্লার শাসন; তবে এখনও তা দূরে আছে, তাই আমরা কাফেরদের ড্যামোক্র্যাসি আর ইলেকশন মানিয়া আল্লার পথে কাজ করিতেছি।

তারা সবাই বলেন, আল্লার নিশ্চয়ই আমাদের মাফ করিবেন।

আমির সাহেব বলেন, আল্লার শাসন যখন হইব তখন দ্যাশে আর পলিটিকেল পার্টি থাকব না, পলিটিক্স থাকব না, ড্যামোক্র্যাসি আর ইলেকশন থাকব না, আল্লার বই। ছাড়া আর কোনো বই থাকব না, তখন কাফেরদের স্কুল কলেজ ইনভারসিটি থাকব না, দ্বীনের শিক্ষা ছাড়া আর কোনো শিক্ষা থাকব না।

সবাই বলে ওঠেন, আলহামদুলিল্লা।

আমির সাহেব বলেন, কিন্তু এইবারও আমাদের ইলেকশনে যাইতে হবে, আল্লার শাসনের পথ তৈরি করিতে হবে। দ্যাশে এখন আমাদের অবস্থা আগের হইতে ভাল, আমাদের তারা আর রাজাকার বলে না। আপনাদের একটা কথা আমি জানাইতে চাই আমারে মুরুব্বিরা কয়টা ইঙ্গিত দিয়াছেন।

সবাই বলে, ইঙ্গিতের কথা আপনে আমাদের বলেন, হুজুর।

আমির সাহেব বলেন, আমাদের মুরুব্বিরা ইলেকশনের জইন্যে আমাদের দশলাখ ডলার দান করিবেন। তাঁরা ইঙ্গিত দিয়াছেন তারা দেশে এইবার ক্ষমতার বদল চান, আমাদের সেইভাবে কাজ করিতে হইবে। এইবার আমাদের নায়েবে আমির মওলানা রহমত আলি ভিস্তি সাহেব আপনাদের সব বলিবেন।

রহমত আলি ভিস্তি সাহেব প্রথম আল্লা ও রসুলকে ধন্যবাদ দেন।

তিনি বলেন, মাননীয় মজলিশ, আমাদের সকলের ইমানের বলে ইনশাল্লা আমরা আল্লা, রসুল, আর আমাদের পথপ্রদর্শক আবু আলা মওদুদির নির্দেশিত পথে ঠিক মত আগাইতেছি। কিন্তু দ্যাশ এখনো কাফেরদের হাতে, তাই আমাদের কাফেরদের ড্যামক্র্যাসি মানতে হয়, ইলেকশন করতে হয়। ইসলামি বিপ্লবের সময় আইজও আসে নাই, ইলেকশন

করতে করতে একদিন আমরা ইসলামি বিপ্লব ঘটাইব। তারপর আর ইলেকশন থাকব না, ড্যামক্র্যাসি থাকব না; থাকব আল্লার শাসন।

সবাই বলে, আলহামদুলিল্লা।

মওলানা রহমত আলি ভিস্তি বলতে থাকেন, সারা দেশে আমাদের মুত্তাফিক ভাইরা রেডি হইতেছে, আর দেরি নাই, রোকন ভাইরা রেডি হইতেছে, মোমেনিন সালেহিন ভাইরা রেডি হইতেছে, বিপ্লব ঘটিবেই ঘটিবে। তখন আর আমাদের কাফেরদের ইলেকশন করতে হবে না। দেশে চলবে আল্লার শাসন, চলবে আমাদের রাজবংশের শাসন।

সবাই বলে, আলহামদুলিল্লা।

ভিস্তি সাহেব বলতে থাকেন, আমাদের পথপ্রদর্শক পরম শ্রদ্ধেয় আমিরে আমির আপনাদের জানাইয়াছেন যে আমাদের মুরুব্বিরা এইবার নতুন ইশারা দিয়াছেন, আমাদেরও সেই ইশারা ধরে বিপ্লবের পথে আগাইয়া যাইতে হবে। অইবার আমরা শক্তির উৎসবাদী রাজবংশের সঙ্গে আছিলাম, তারপর আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি, অন্দোলনে আমরা ছিলাম জনগণমন রাজবংশের সঙ্গে; তাগো সঙ্গে থাকিবার ফলে আমাদের অনেক লাভ হইয়াছে। এখন আর তাহারা আমাদের রাজাকার বলিয়া নিন্দা করে না। তাহারাই আমাদের বড় বিপদ, তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকিলে আমাদের কোনো বিপদ নাই।

মওলানা এস এম কোরবান জানতে চান, তাহাদের অই হিন্দু বুদ্ধিজীবী কুত্তাগুলি ত আমাদের পাছে লাগিয়াই আছে, তাহার কী হইবে?

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, অইগুলি পলিটিক্স বোঝে না, অইগুলি আছে চিল্লানের লিগা, ঘেউওঘউ করনের জইন্যে, কিছু খাওনের লিগা, অইগুলির চিল্লানের জইন্যেই আমরা উপরে উঠিতেছি, ইসলামের প্রসার হইতেছে, আমাদের প্রসার হইতেছে। ওইগুলিও আমাদের ডরে এখন ভিতরে ভিতরে মুসলমান হইতেছে, ওইগুলিরে ভয় পাইবার কিছু নাই।

রহমত আলি ভিস্তি দু-তিন গেলাশ পানি পান করেন।

তারপর তিনি বলতে থাকেন, এইবার আমাদের অবস্থা অনেক ভাল, এইবার সত্তর আশিটা সিট আমরা নিজেরাই পাইব, আর আমাদের গোপনে অ্যালাইয়েন্সে আসতে হইবে জনগণমন রাজবংশের সহিত। মনে হইতেছে তাহারাই এইবার ম্যাজরিটি হইবে, তাহাদের সঙ্গে থাকিলেই ভাল; আমাদের মুরুব্বিরাও সেই ইশারাই দিয়াছেন।

সবাই বলেন, আলহামদুলিল্লা, ইশারা মতোই আমাদের চলিতে হবে, তাহা হলেই আমরা আল্লার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, আমরা নিজেরা এইবার ক্ষমতায় যাইতে পারব না, কিন্তু কারা ক্ষমতায় যাইবে তাহা নির্ভর করিবে আমাদের উপর, আমরা তাহাদের আমাদের পথে চালাইব। আমাদের দেখতে হবে কিসে আমাদের লাভ বেশি।

মওলানা সলিমুল্লা জিজ্ঞেস করেন, আমাদের শিবিরের ভাইরা, সালেহিন ভাইরা কী ভূমিকা পালন করিবে? ইলেকশনে তাহাদের কীভাবে কাজে লাগাইব।

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, তাহারা আমাদের সিপাহি, আল্লার নামে তাহাদের আমরা যা করিতে বলিব, তাহারা তাহাই করিবে।

তাঁদের মজলিশে সিদ্ধান্ত হয় আমির ও নায়েবে আমির রাজবংশের মঙ্গলের জন্যে যা ভালো মনে করবেন, তা করবেন, যাদের সাথে বসার তাদের সাথে বসবেন, যাদের সাথে দাঁড়ানোর তাদের সাথে দাঁড়াবেন; আর তারা যা আদেশ করবেন, তা সবাই আল্লার নামে পালন করবে।

আমরা জনগণরা এখন খুবই ক্লান্ত; দু-তিন বছর রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে, গলা চুরমার করে শ্লোগান দিয়ে, বাসে আর ট্রাকে আর গাড়িতে দাউদাউ আগুন জ্বালিয়ে, পুলিশের টিয়ার গ্যাস আর গুলি আর লাঠির বাড়ি খেয়ে, আমরা এখন খুবই শ্রান্ত; আমাদের খেলা শেষ হয়েছে, আমাদের দিয়ে তারা যা খেলাতে চেয়েছেন তা খেলে আমরা এখন আধাঘুমন্ত; এখন আর আমাদের খেলার নেই। আমাদের কাজ এখন খেলা দেখা, আমাদের কাজ এখন আমাদের রাজারা কেমন খেলেন, সেই মজা উপভোগ করা। কোনো টিকেট কিনতে হচ্ছে না, স্টেডিয়ামে যেতে হচ্ছে না; আমরা রাজাদের খেলা দেখছি আর হাততালি দিয়ে মজা পাচ্ছি। খেলুন, আমাদের রাজারা খেলুন; আমরা দেখি।

কিন্তু আমরা, মূর্খ জনগণরা, গরিব মানুষ, আমাদের অতো মজা দেখার সময় কোথায়? অতো আমোদপ্রমোদ হাডুডু কুকুৎ রঙতামাসা উপভোগের উপায় কই আমাদের? আমরা

ব্যস্ত আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজে, মরমর দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে; বাঁচাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ। আমাদের আমরা না বাঁচালে কে বাঁচাবে, আমাদের কে আছে? দেহটার ভেতর মধু আছে, তাই ওটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমরা দিনরাত বিষ খাই; আর এই আকাশ বাতাস মেঘ নদী রোদ ধান আর রাতের বেলা একটু আধটু সুখ ছেড়ে কার সেই পারে চলে যেতে ইচ্ছে করে? আমরা আছি আমাদের দুঃখকষ্টে, আমাদের দুঃখকষ্টই আমাদের জীবনের রঙতামাসা, তাতেই আমরা মজে আছি, রাজারা আছেন তাদের সুখেসম্পদে। তারা আরো ক্ষমতা না পেলে দুঃখ না পান, তাঁদের শরীর জ্বালা করতে থাকে, একশো বছর সিংহাসনে না থাকতে পারলে কষ্ট পান, আরো সম্পদ না পেলে দুঃখ পান, তাঁদের দেহে আগুন জ্বলতে থাকে; তাদের দুঃখ আর আমাদের দুঃখ ভিন্ন। তাদের দুঃখ সোনা দিয়ে তৈরি, আমাদের কষ্ট পচা খড়কুটোয়। রাজারা চিরকাল রাজা থাকবেন আমরা চিরকাল আমরা থাকবো, এটা কে না জানে, রাজারা ও আমরা কোনো দিন এক হবে না।

আমাদের কয়েকটি ছেলের কথা মনে পড়ছে; যদিও ওদের কথা মনে না পড়াই ভালো; আর আমরা মনে করতেও চাই না।

আমাদের ওই ছেলেরা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, আমরা তাই ভাবতাম, আমাদের ছেলেরা তো নষ্ট হবেই, ওদের আমরা জন্মই দিই নষ্ট হওয়ার জন্যে, আমাদের ধাতু আর জরায়ুতেই দোষ আছে, পচন লেগেছে ওই দুই জিনিশে; ওরা ইস্কুল থেকেই পাশ করে বেরোতে পারে নি; আর আমাদের, অর্থাৎ ওদের বাবাদের বড়ো দোষ হচ্ছে তাদের এতো টাকা কই যে ওদের নিউইয়র্ক বা দিল্লি পাঠিয়ে দেবে সভ্য শিক্ষিত হতে, বা কিনে দেবে সাগর ১, ২, ৩, মহাসাগর ৪, ৫, ৬, উপসাগর ৭, ৮, ৯, ১০ নামের পাঁচ দশটা তেতলা লঞ্চ, যেগুলো

চলবে ঢাকা থেকে ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপের পথে, বা দোকান নিয়ে দেবে ঢাকার সুপারমার্কেটে, পাজেরো কিনে দেবে; আর এতো শক্তি কই যে ব্যাংক লুঠ করে এনে দেবে পঞ্চাশ কোটি টাকা। হতো ওরা রাজাদের ছেলে, ওরা নষ্ট হতো না, রাজা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতো। ওদের তখন কিছুই করার ছিলো না, তাই ওরা একটি কাজই করতে পারতো, নষ্ট হতে পারতো। নষ্টই বলি কী করে? ওই এলাকার এলাকার নামও কি বলতে হবে?– বলার দরকার নেই, যে-কোনো এলাকার নাম নিলেই চলবে, এমপি সাহেব যেভাবে এমপি হয়েছেন, ওরা সেই কাজ শুরু করে, টিকে থাকলে ওরাও একদিন এমপি হতো; ওরা প্রথম এমপি সাহেবের রাজবংশে যোগ দেয়। মাননীয় এমপি সাহেবের এমপি হওয়ার জন্যে ওদের খুব দরকার ছিলো।

এমপি সাহেব তখন, আরো অনেক মাননীয় এমপি সাহেবের মতো, এক রাজবংশ থেকে আরেক রাজবংশে এসেছেন; তিনি রাজাদের রাজবংশেই থাকতে পছন্দ করেন। যে-রাজবংশ সিংহাসনে নেই, তিনি সেই রাজবংশে থাকেন না; তাতে পাপ হয়, তাঁর। বিশ্বাস রাজার বিরুদ্ধে থাকা আর আল্লার বিরুদ্ধে থাকা একই কথা। তিনি ইমান নষ্ট করতে চান না; তিনি সব সময় রাজা আর আল্লার পক্ষে থাকতে চান।

এতে তাঁর মঙ্গল হয় এটা আমরা সব সময়ই দেখতে পাই। রাজা আর আল্লা দুই হাতে ঢেলে তাকে সব কিছুই দেন।

কিন্তু ইমানদার লোকেরও শত্রুর অভাব হয় না, অন্য রাজবংশে যোগ দেয়ার পর তারও শত্রু বাড়ে; এবং তিনি আমাদের ওই সাতজন ছেলেকে নিজের বুকে টেনে নেন। নেবেন না কেনো, তিনি ওদের দুঃখ বোঝেন; তিরিশ বছর আগে তাঁর দুঃখ বুঝে সেই কালের

এমপি সাহেবও তাকে বুকে টেনে নিয়ে একখানি জিনিশ ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ওই জিনিশটা তাকে এতো দূর নিয়ে এসেছে। তিনি ওদের সবখানেই নিয়ে যেতেন, তার সাথে ওরা পাজেরোতে চলতো, তিনি গাড়ি থেকে নেমে কোলাকোলি আর দু-হাত মেলানোর সময় ওরা তাকে ঘিরে থাকতো, আমরা দেখতাম ওদের জামা উঁচু হয়ে আছে, পকেট ফুলে আছে, মাঝেমাঝে ওরা কালো জিনিশটি নিয়ে নিজেরাই একলা একলা খেলতো, দেখে আমরা মুগ্ধ হতাম। এমপি সাহেব ওদের আদর করতেন, সবখানেই পরিচয় করিয়ে দিতেন ওরা আমার ছেলে।

এমপি সাহেব মহান পিতা; নিজের দুই পুত্রকে তিনি আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়ে বুকে খুব শূন্যতা অনুভব করতেন, ওরা তার সেই শূন্য বুক ভরে রাখতো। ফ্রি টেলিফোনে তিনি নিজের পুত্রদের সাথে সব সময়ই কথা বলতেন, পুত্ররা লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে শুনে বুক তার ভরে উঠতো; কিন্তু টেলিফোনের কথায় কি পিতৃস্নেহ মেটে, পিতার বুক ভরে? তাই তো তিনি আমাদের ওই সাতটি ছেলেকে নিজের ছেলে করে নিয়েছিলেন।

এমপি সাহেবের ছোটো ছেলে বলতো, আব্বা, আমি দেশে আসতে চাই।

এমপি সাহেব কাতর হয়ে উঠে চিৎকার করতেন, না, বাবা, এখন দ্যাশে আসবা না, এইটা কি দ্যাশ নাকি, এইখানে আসলে তোমার শরিল টিকবো না। আমেরিকারে বাপমায়ের দ্যাশ ভাইব্যা সেইখানেই থাকো।

ছেলেটি বলতো, আব্বা, বিদেশে আমার মন টিকছে না; এখানে আমি একটা থার্ডক্লাশ সিটিজেন হয়ে আছি, এখানে আমি নিগ্রোর থেকেও খারাপ আছি।

এমপি সাহেব বলতেন, বাবা, বোঝ না আমেরিকায় থাডক্লাশ সিটিজেন থাকনও ভাল, নিগ্রোর থাইকা খারাপ থাকনও ভাল। এই বাংলাদ্যাশ একটা দ্যাশ না, এইখানে আইজ আসলে কাইল তুমি খুন হইয়া যাইবা, নাইলে অ্যাকসিডেন্টে মইরা যাইবা, দ্যাশে আসনের কাজ নাই।

ছেলেটি বলতো, কেনো, আব্বা, দেশে অনেক মানুষ তো বেঁচে আছে।

এমপি সাহেব বলতেন, সবগুলি ত একলগে মরতে পারে না, তাই বাইচ্যা আছে, কিন্তু কোনটা কোন সময় মরবো কেউ জানে না। তুমি দ্যাশে আসবা না, বাবা। মন চাইলে তুমি ফ্রান্সে আর অস্ট্রেলিয়ায় মাসখানেক ব্যাড়াইয়া আসো, তোমার নামে দশ হাজার ডলার পাঠাইতেছি।

এমপি সাহেবের বড়ো ছেলে সম্পূর্ণ বিপরীত; তাকে টেলিফোন করতে মনে মনে ভয় পান এমপি সাহেবও। ছেলেটি চিঠি তো লেখেই না, কখনো ফোনও করে না; আর এমপি সাহেব ফোন করলে সে বিরক্ত হয়।

ওই ছেলে বলতো, আব্বা, কাজে অকাজে ফোন করে তুমি পয়সা নষ্ট কোরো না, এদেশে কেউ এভাবে পয়সা নষ্ট করে না।

এমপি সাহেব বলতেন, বাবা, পয়সা আমি নষ্ট করি না, এইটা আমার ফ্রি ফোন, এমপি হিশাবে পাইছি, কোনোদিন বিল দিতে হইবো না। দ্যাশবিদাশে বিজনেস আমি এই ফোনেই করি।

ছেলেটি বলতো, এভাবে তো তুমি ট্যাক্স পেইআরস মানির অপচয় করছো, এখানকার ওরা তা করে না।

এমপি সাহেব হা হা করে উঠতেন, হা হা হা হা, বাবা, অইটা হইলো আমেরিকা, আর এইটা হইলো বাংলাদ্যাশ, এইখানে কেউ ট্যাক্সো দ্যায় না, আর আমরা ট্যাক্স পেয়ারগো মানি নষ্ট করি না, দ্যাশটা চলে লোনের টাকায়।

ছেলেটি বলতো, ওই লোনের টাকা তুমি এভাবে অপচয় করতে পারো না।

এমপি সাহেব ছেলের কথায় হো হো করে হাসতেন, বলতেন, বাবা, তুমি একটা গ্রেট ম্যান হইতেছে, তোমারে লইয়া আমি প্রাউড ফিল করি, আমি আমার এমপি ভাইগো তোমার কথা কই, তারা কয় তুমি জর্জ ওয়াশিংটন আর ইব্রাহিম লিংকনের মতন গ্রেট ম্যান হইবা, আমেরিকা আছো বইল্যাই এইটা হইতে পারতেছো, বাবা; আমাগো দেশে তোমার মতন গ্রেট ম্যান দরকার, গ্রেট লিডার দরকার; তুমি দ্যাশে আসবা, দ্যাশটা উদ্ধার করবা, বড় ন্যাতা হইবা।

এমপি সাহেব কথাগুলো বলে সুখ পান, নিজেকে তার ওয়াশিংটন লিংকনের বাপজান মনে হয়; তার আরো ভালো ভালো কথা বলতে ইচ্ছে হয়, এবং তিনি বলতে থাকেন, বাবা,

আমরা সব এমপি ভাইরা, পলিটিশিয়ানরা, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা আমাগো পোলামাইয়াগো আমেরিকা, ইংল্যান্ড, দিল্লি, দার্জিলিং পাঠাই দিছি তারা সেইখানে থাইক্যা লেখাপড়া শিখ্যা গ্রেট ম্যান হইয়া দ্যাশে ফিরবো, একদিন দ্যাশের ভার লইবো, তুমিও দ্যাশের ভার লইবা, বাবা।

ছেলেটি বলতো, আব্বা, আমি দেশে কখনো আসবো না, তোমাদের কাজ দেখে দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেছে; আই হেইট দোজ করাপ্ট ইলিজিটিমেট এমপিজ অ্যান্ড রাসকল পলিটিশিয়ান্স।

এমপি সাহেব ভয় পেয়ে বলতেন, এইটা তুমি কী বলতেছো, বাবা; তুমি দ্যাশে না আসলে আমি এই মিলকারখানা বাড়িগাড়ি কাগো লিগা করলাম, আর আমি তোমার এমপি হওনের পথও তৈরি কইর‍্যা রাখছি। তুমি এমপি হইবা, মন্ত্রী হইবা, পারলে প্রধান মন্ত্রী হইবা, বাবা।

প্রধান মন্ত্রী কথাটি নিজের কানে শুনেই তিনি ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার মতো ভয় পান, তাকিয়ে দেখেন কেউ আছে কি না, কেউ শুনলে ভাবতে পারে তিনি ষড়যন্ত্র করছেন। সিআইএ, র, বা অন্য কারো সাথে। আমাদের অসাধারণ দেশগুলোতে প্রধান মন্ত্রী কি যে সে হতে পারে? একটি মরা বাপ দাদা নানা স্বামী শ্বশুর থাকতে হবে না? একটা বড়ো মাজার থাকতে হবে না? তিনি কে? তার কী আছে? তার বাপটার লাশ তো জংলা গোরস্থানে কুত্তায় খেয়েছে। হ্যাঁ, তিনি মরে গেলে তার নাম ভাঙিয়ে ছেলেমেয়েরা এমপি হতে পারবে, সে পথ তিনি পরিষ্কার করেছেন। এটাই ক-জন পারে?

ছেলেটি বলতো, এমপি আর মন্ত্রী হওয়ার থেকে আমি কুকুর হওয়াও বেশি পছন্দ করি, আব্বা।

এমপি সাহেব হায় হায় করে ওঠেন, এ কি কথা তুমি বলতেছো, বাবা, আমার বুক ভাইঙা যাইতেছে।

ছেলেটি একদিন বলে, আব্বা, আম্মা ফোন করেছিলো কালকে।

এমপি সাহেব কেঁপে উঠে জিজ্ঞেস করেন, তোমার আম্মায় আবার কী জইন্যো ফোন করলো? আমারে কইলেই ত পারতো।

ছেলেটি বলে, শি কমপ্লেইনড অ্যাগেইনস্ট ইউ, আব্বা।

ভয়ে ভয়ে এমপি সাহেব জিজ্ঞেস করেন, কী কমপ্লেন করলো, বাবা?

ছেলেটি বলে, তা বলতে আমার ঘেন্না হচ্ছে।

এমপি সাহেবের মনে হয় লাইনটা যদি এখন কাট হয়ে যেতো, তাহলে ভালো হতো; এই ঢাকার কলো লাইনই যখনতখন কাট হয়ে যায়, তারপর পাঁচ ঘণ্টা ঘোরালেও আর পাওয়া যায় না, কিন্তু এটা কাট হচ্ছে না, আমেরিকার সঙ্গে লাইন তো, তাই কাট হচ্ছে না। ঘেমে ওঠেন এমপি সাহেব।

ছেলেটি বলে, বাট আই মাস্ট টেল ইউ, আম্মা বলেছেন তুমি মেইড সার্ভেন্টগুলোর সাথেও থাকো, আবার হোস্টেলে অ্যাক্ট্রেস কলগার্লও ওঠাও।

এমপি সাহেব বলেন, তোমার আম্মা বুড়া হইতেছে, আর পাগল হইতেছে, আর আমার নামে যা তা বলতেছে, তার ভাল হইবো না, তারে আমি আইজই বুঝাই দিতেছি।

ছেলেটি বলে, তবে তোমার ওই কাজে আমি বিশেষ হার্ট হই নি, তোমরা পলিটিশিয়ানরা অল অ্যারাউন্ড দি গ্লোব এ-কাজই করছো, পিপলের টাকা চুরি করছো, ব্যাংক লুট করছো, কলগার্লের সঙ্গে রাত কাটাচ্ছো, পরের বউ ভাগাচ্ছো, তিন চারটা মিস্ট্রেস রাখছো, মাফিয়া পুষছে, আর মুখে বড়ো বড়ো কথা বলছো, সব কিছু করাপ্ট করাই তোমাদের কাজ, তা তোমরা করবেই, বাট নেভার ট্রাই টু হিট মাই মাদার অ্যান্ড নেভার থিংক অফ লিভিং হার, তাহলে বিপদে পড়বে, ইউ উইল বি ইন ডিপ ট্রাবল।

তার ছেলে টেলিফোন রেখে দেয়।

এমপি সাহেব হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করেন; আর মনে মনে বলেন, মাইয়ালোকটার সব কিছু যতই ঢিলা হইয়া যাইতেছে, তার মুখটাও ততই ঢিলা হইয়া যাইতেছ, পোলার কাছেও এইসব কয়।

বুকভরা এমন গভীর অসীম শূন্যতা নিয়ে এমপি সাহেব সেই সাতটি ছেলেকে নিজের করে নিয়েছিলেন; তারা তার সাতটি লম্বা শক্ত হাত, যে-হাত দিয়ে তিনি মাঝেমাঝে মগজ ও রক্ত খেতে পছন্দ করেন। একদিন তিনি তাদের একটি কাজ দেন; কাজটি খুবই জরুরি,

পথ পরিষ্কারের কাজ; নিজের পথে কাঁটা থাকা তার ভালো লাগে না, তাই তিনি তাদের কাজ দেন দুটি কাটাকে–আপ্তাজদ্দিন ও তার ছেলেকে, তুলে ফেলার। কাঁটা দুটি খুব বেড়ে উঠেছে, পায়ে লাগছে। সেই ছেলেরা একরাতে পরিষ্কারভাবে দুনিয়া আর রাজনীতি থেকে তুলে ফেলে ওই দুজনকে; আমরা তা জানতে পেরে অল্প অল্প শিউরে উঠি, কিন্তু কোনো কথা বলি না। আপ্তাজদ্দিন ও তার ছেলে গেছে, তাতে আমাদের কী? সেও কি এমনভাবেই তুলে ফেলে নি শেখ আনসারুদ্দিনকে; আর পারলে সে কি তুলে ফেলতে না এমপি সাহেবকে? কাঁটা তুলে ফেললে পথে হাঁটা যায় কী করে? পুলিশ কয়েক দিন খুবই ঘোরাফেরা করলো গ্রামে, এমপি সাহেবের পেছনে পেছনে আমরা তাদের পোষা প্রভুভক্তগুলোর মতো হাঁটতে দেখলাম, ইস্কুলের দুটি ছেলে আর মাঠের তিনটি রাখালকে তারা ধরে নিয়ে গেলো, এমপি সাহেব কয়েক বার গিয়ে আপ্তাজদ্দিনের দুই বউকে ধরে কাদলেন, এবং সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলো।

আমাদের সেই ছেলেরা, এমপি সাহেবের সাত পুত্র, তার লম্বা শক্ত হাতেরা কোথায় গেলো?

আমরা দূরের মানুষ, আমরা কী করে জানবো? আমরা শুধু দেখতে পাই সেই সাত ছেলের বাপেরা আর ভাইয়েরা শুধু ঢাকা যাচ্ছে আর ফিরে আসছে, কারো সাথে বেশি কথা বলছে না, মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ছে পাঁচ সাতবার, মুখ খুব ভার। কয়েক দিন পর দেখতে পেলাম মুখ থেকে ভারটা নেমে গেছে, কিন্তু হাত পা কাঁপছে। কিন্তু আমরা কিছু জানতে পারি না, জানতেও চাই না। সেই ছেলেদের সংবাদটা আমরা পাই অনেক পরে।

শুনতে পাই এমপি সাহেব তাদের নিজের কারখানার গুদামে লুকিয়ে রাখেন; এবং চার দিনের দিন বলেন, পোলারা, ভাবছিলাম তোমাগো বাঁচাইতে পারুম, এখন। দ্যাখতেছি সেইটা সম্ভব হইবো না।

ছেলেরা জানতে চায়, আমাগো কী অইবো, ছার? আপনে আমাগো বাঁচান; আপনের লিগাই তো আমরা ওই কাম করলাম।

এমপি সাহেব বলেন, কামটা তোমরা ভালই করছে, তবে সেই কথা কোনো দিন কারে বইলো না; কিন্তু দ্যাশে থাকলে তোমাগো বাঁচান যাইবো না।

ছেলেরা জিজ্ঞেস করে, আমরা তয় কই যামু? যামু কেমনে?

এমপি সাহেব বলেন, আমি তোমাগো কোরিয়া পাঠাই দিতেছি, আমার ম্যান পাওয়ার কম্পানিই তোমাগো পাঠানের ব্যবস্থা করবো, কেউ জানবো না।

তারা বলে, দ্যান, ছার, আমাগো পাঠাই দ্যান।

এমপি সাহেব বলেন, হ, তোমাগো কোরিয়া পাঠাই দিমু, আমার লোকরা তোমাগো এয়ারপোর্ট পার কইর‍্যা ছাইড়া দিব, তারপর তোমরা নিজেরাই কাজকাম খুইজ্যা লইতে পারবা। কোরিয়ায় কামের আইজকাইল অভাব নাই, জাপানরে হারাই দিতেছে, মালিকরা রাস্তাঘাটে বাংলাদেশি লেবারার খোঁজে।

তারা বলে, হ, পাঠাই দ্যান, ছার, কাম আমরা পামু। কাম করতে আমাগো কষ্ট অইবো না, দিনরাইত খাটুম।

এমপি সাহেব বলেন, এই গুদাম থেইক্যাই দুই তিন দিনের মইধ্যে তোমাগো রাইতে গিয়া প্লেনে উটতে হইবো, বাপমা ভাইবোনের লগে দেখা করতে পারবা না। তয় যাওনের আগে এয়ারপোর্টে একবার দ্যাখা করনের ব্যবস্থা কইরা দিমু। দূর থিকা তাগো দ্যাখতে পাইবা, তোমাগোও তারা দ্যাখতে পাইবো। কোরিয়ায় গিয়া তোমরা লাখ লাখ টাকা কামাই করবা, কোটিপতি হইয়া দশ পোনর বছর পর দ্যাশে ফিরবা।

ছেলেরা খুব কৃতজ্ঞ বোধ করে, এমপি সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে, মনে হয় তিনিই তাদের বাবা।

এমপি সাহেব সাত ছেলের বাপভাইদের নিয়ে গোপনে বসেন।

এমপি সাহেব বলেন, দ্যাশে রাখলে অগো বাঁচান যাইবো না, তাই ভাবতেছি অগো কোরিয়া পাঠাই দিমু।

তারা বলে, দ্যান, ছার, অরা অইখানে গিয়া বাচুক।

তারা খুব কৃতজ্ঞ বোধ করে, এমপি সাহেব মহৎ মানুষ।

এমপি সাহেব বলেন, সব খরচ আমিই দিমু, কোরিয়ায় অগো কামের ব্যবস্থাও কইরা দিমু, তয় প্লেন ফেয়ারটা আপনেগো দিতে হইবো।

তারা সবাই চমকে ওঠে।

এমপি সাহেব বলেন, বেশি লাগবো না, সাতজনের আড়াই লাক তিন লাক হইলেই হইবো।

তারা বলে, এতো টাকা ত আমাগো হাতে নাই, ছার, এত ট্যাকা কই পামু?

এমপি সাহেব বলেন, অরা ত আর সাতরাইয়া যাইতে পারবো না, যাইতে হইবো প্লেনে চইর্যাই, আর তার জইন্যে ভারাও লাগবো। থাকলে আমিই দিতাম, আমার হাতে আইজকাইল ট্যাকা নাই।

তারা কিছু বুঝতে না পেরে এমপি সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এমপি সাহেব বলেন, বাঁচতে চাইলে অগো দ্যাশ ছারনই লাগবো। দরকার হইলে জমিজমা কিছু বেইচ্যা দেন, ট্যাকা উশিল হইয়া যাইবো। কোরিয়ায় গিয়া অরা লাক লাক ট্যাকা কামাই করবো।

কিন্তু জমিজমা যা আছে, তা বেচলে তারা খাবে কী, থাকবে কোথায়; আর এতো তাড়াতাড়ি বেচবেই কার কাছে? তাদের মনে হয় তারা খুন হয়ে গেছে তাদের ছেলেদের হাতে; কিন্তু তাদের ছেলেরা খুন হয়ে যাক ফাঁসিতে ঝুলুক এটা তারা চাইতে পারছে না।

একজন বলে, ছার, যা জমিজমা আছে, তা বেচলে নিজেগো খাঅনই চলবো না, থাকনেরও জায়গা থাকবো না।

এমপি সাহেব বলেন, আল্লায় না খাওয়াই রাখবো না, আল্লায় থাকন খাঅনের একটা ব্যবস্থা কইর‍্যাই দিবো।

এক পিতা বলে, তাও না বেইচ্যাই দিলাম, তয় এত তরাতরি কিনবো কে, কার কাছে বেচুম?

এমপি সাহেব বলেন, হ, সেইটা একটা কথা; আর জানাজানি হইয়া গেলেও বিপদ আছে, লোকে জানতে চাইবো জমিজমা ব্যাচতেছেন কেন?

তারা কিছুক্ষণ ধরে উদ্ধারহীন সংকটে পড়ে, এবং তাদের উদ্ধার করেন এমপি সাহেবই।

এমপি সাহেব বলেন, আমি আপনেগো জইন্যে এইটা করতে পারি চাইলে আপনেরা আমার ছেলেদের কাছে বেচতে পারেন, তাগো নামে রেজিস্ট্রি কইর‍্যা দেন, তাগো ট্যাকা থিকা আমি আপনেগো ট্যাকাটা দিয়া দেই। অই ট্যাকা দিয়া টিকেট কিইন্যা দেই।

এমপি সাহেব মহৎ মানুষ; দু-তিন দিনের মধ্যেই তিনি সেই সাত ছেলেকে কোরিয়া পাঠিয়ে দেন, তার ম্যান পাওয়ার কোম্পানির লোকেরা সেই ছেলেদের এয়ারপোর্ট পার করে রাজধানির পথে ছেড়ে দেয়; বিমান ওঠার আগে দূর থেকে সেই ছেলেরা একবার দেখতে

পায় তাদের পিতামাতাদের, আর পিতামাতারা দূর থেকে দেখতে পায় সেই ছেলেদের। তাদের বুক এই দেখায় ভরে আছে। আমাদের সেই ছেলেরা খুন করতে পারতো; তারা কি কাজ করতে পারতো না? দেশে কাজ নেই, তাই তারা কাজ করবে কোথায়, আর করবেই বা কী কাজ? দেশে খুন করা আছে, কাঁটা তুলে ফেলা আছে, পথ পরিষ্কার করা আছে, তাই তারা খুন করতো, কাঁটা তুলে ফেলতো, পথ পরিষ্কার করতো। কোরিয়ায় কাজ আছে, পলাতকের জন্যেও আছে; সেখানে তারা দিনরাত কাজ করে, লুকিয়ে থেকে কাজ করে, সেখানকার চুং চাং দুং দিং মনিবেরাও জানে কীভাবে ঠকাতে হয়, তারা তাদের ঠকায়, কারখানার জেলের মধ্যে অনেকটা আটকেই রাখে; কিন্তু আমাদের সেই ছেলেরা সেখানে কাজ করে। তাদের হাতে এক সময় পিস্তল ছিলো, সে-কথা তারা ভুলে যায়। দাস হিশেবে তারা ভালো।

চার বছর পর ওই মনিবের কারখানা থেকে তারা বেরিয়ে পড়ে। তাদের সবার চোখে একটি করে স্বপ্ন আছে, সবচেয়ে সুন্দর স্বপ্ন, টাকার স্বপ্ন। তারা বেশ কিছু টাকা করেছে, বুদ্ধি করে দেশেও টাকা পাঠিয়েছে, এমপি সাহেবের মাধ্যমে পাঠায় নি–মনে হয় তারা কী যেনো বুঝতে পেরেছে; আরো বুঝতে পারে দাস হয়ে থাকলে টাকা হয়, আর দাস হয়েই যদি থাকতে হয়, তাহলে কোরিয়ায় কেননা, তার চেয়ে ভালো জাপান। বাঙলাদেশে ফিরতে তাদের ইচ্ছে করে না, মাঝেমাঝে শুধু স্বপ্নে দেশে ফেরে, মাবাবাকে, ভাইবোনকে দেখে, এবং হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে তাদের ঘুম ভেঙে যায়। তাই দেশকে তারা স্বপ্নেও দেখতে চায় না। জাপান হয়ে ওঠে তাদের স্বপ্ন, দাসদের স্বপ্নের দেশ জাপান। তাদের চেনা কয়েকজন এর মাঝে জাপান চলে গেছে, মাসে লাখ টাকা রুজি করছে; তারা আর কোরিয়ায় চল্লিশ হাজার রুজি করতে চায় না। তাদের গলাকাটা পাসপোর্ট আছে, তাদের মতো দাস স্বপ্নের দেশে যাওয়ার অনুমতি পেতে পারে না। কোরিয়াই কি তাদের অনুমতি দিয়েছিলো, তারা

অনুমতি চেয়েছিলো? তবু কি তারা কোরিয়ায় আসে নি, মাসে মাসে চল্লিশ হাজার রুজি করে নি; সুন্দর সুন্দর রঙিন ছবি তোলে নি; দুই চার পাইন্ট বিয়ার খায় নি? অনুমতি চাইলে আর সীমা মানলে এখন তারা কোথায় থাকতো? কেউ তাদের অনুমতি দেবে না, তারাও অনুমতি নেবে না, শুধু তারা সীমা পেরিয়ে যাবে–স্বাধীন হওয়ার জন্যে নয়, বিশ্ব আবিষ্কার করার জন্যে নয়, শুধু দাস হওয়ার জন্যে।

সেই ছেলেরা জানতে পারে জাপানে যাওয়ার উপায় আছে, মানুষ হিশেবে নয়, মাল, হয়ে তারা জাপান যেতে পারে। তাদের চেনা কয়েকজন বাঙালি বাঙলাদেশি মাসখানেক আগে মাল হয়েই জাপানে পৌঁছে গেছে, কোনো অসুবিধা হয় নি, ফোন করে তারা জানিয়েছে, তারা ইয়ামাগুচির জেলেদের কারখানায় মাছ প্যাক করছে, মাসে লাখখানেক থাকবে। মাস তিনেকেই জাপানে আসার খরচটা উঠে যাবে, তারপর শুধু জমবে। স্বর্গ ভরেই টাকা ছড়ানো, দিনে আঠারো ঘণ্টা ধরে কুড়োতে হবে, চাইলে আরো বেশি সময় ধরেও কুড়োতে পারে। তারাও জাপান যাবে, মাল হয়েই যাবে; দাস তো মানুষ না, মালই, মালের থেকেও খারাপ; মালের দামই আজকাল বেশি, মাল ছাড়া অন্য কিছুরই দাম নেই, তাই মাল হ'তে তাদের কোনো কষ্ট নেই, শুধু বেহেস্তে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই হয়, লাখখানেক থাকলেই হয়। পুসানের সাগর পার থেকে উঠতে হবে ট্রলারে, যাত্রী হিশেবে নয়, মাল হিশেবে, তারপর তিনশো কিলোমিটারের মতো সাগর, ইয়ামাগুচির সাগর পারে গিয়ে ট্রলার ভিড়তে লাগবে সাত আট ঘণ্টা; আর ওই সময়টা, ট্রলার ছাড়ার ঘণ্টাখানেক আগে থেকে ট্রলার ভেড়ার ঘণ্টাখানেক পর পর্যন্ত, দশ ঘণ্টার মতো সময় তাদের থাকতে হবে মাছের বিশাল কন্টেইনারের ভেতর ভ'রে কন্টেইনার আটকে দেয়া হবে, মাছের মতো থাকবে তারা, তবে ব্যবস্থাটা বেশ আধুনিক, কোরিয়া জাপানের মতো উন্নত দেশেই সম্ভব, স্মাগলারাও এখানে বিজ্ঞান জানে কন্টেইনারের ভেতর দশ বারোঘণ্টার জন্যে অক্সিজেনেরও ব্যবস্থা করা হবে,

বাতাসের থেকেও ভালো, কোনোই অসুবিধা হবে না। একটু অন্ধকার লাগবে, প্রচুর মাছের গন্ধের স্বাদ পাবে, ইচ্ছে করলে ঘুমিয়েও পড়তে পারে তারা, কোনো বাধা নেই; ঠিক সময়ে দেখতে পাবে কন্টেইনার খুলে বের করা হচ্ছে তাদের, ছেড়ে দেয়া হচ্ছে সাগর পারের নির্জন জঙ্গলে।

সে-রাতে ট্রলার পোঁছতে দেরি হয়ে যায়, মাঝপথে ইঞ্জিন বিকল হয়ে কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়; ইয়ামাগুচিতে যখন কন্টেইনার খুলে আমাদের সেই ছেলেদের বের করা হয়, তখন তারা মাছের মতোই মৃত। অক্সিজেন ফুরিয়ে গিয়েছিলো।

তাদের লাশ ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় কোরীয় উপসাগরে। তারা তাদের স্বপ্নের দেশ জাপানে পৌঁচেছিলো; তাদের আর দুঃস্বপ্নের দেশে ফিরতে হয় নি।

আমরা খোয়বের দেশের মানুষ; রোজ দুই তিন বেলা আমরা ভাত খাই, অনেকে একবেলাও খেতে পাই না, কিন্তু দশ বিশ বেলা আমরা খোয়াব দেখি, তার থেকে বেশিও দেখি হাতে কোনো কাজ না থাকলে, অনেকে সারাজীবনটাই খোয়াবের মধ্যে কাটিয়ে দিই। আমাদের পথেঘাটে বিরাট বিরাট খোয়াবির দেখা মেলে; ওই খোয়াবিদের মহৎ জীবনকাহিনী আমরা দুই হাতে লিখে ছেলেমেয়েদের বইতে পাঠ্য করে দিই। খোয়াব আমাদের দুই রকম, জাগনাখোয়ব আর ঘুমনাখোয়াব; দুই খোয়াবে দু-রকম জিনিশ দেখি আমরা; আর জেগে দেখা স্বপ্ন ও ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্নের গোলমালে আমাদের রক্ত শহরের বস্তির ড্রেনের পানির মতো ময়লা হয়ে যেতে থাকে।

গাদিঘাটের আলালদ্দির খোয়াবের কথাই প্রথম মনে আসছে।

কয়েক দিন আগে আলালদ্দি বাড়ির পুবপাশের জামগাছটির নিচে বসে ছিলো, ছেঁড়া লুঙ্গির ভেতর থেকে বেরিয়ে ঢলঢল করছিলো তার হোল দুটি, কেনো সে বসে ছিলো। সে জানতো না; শুকনো পুকুরটির দিকে তাকিয়ে তার কেমন লাগছিলো, তা সে বুঝতে পারছিলো না; এমন সময় সে খোয়াব দেখে সে বিলের দিকে যাচ্ছে, আর তার সামনে হালটের ওপর লাফিয়ে ওঠে দুটি লাল রুইমাছ। দু-পাশেই পানি টলমল করছে কচুরিপানা আর দলঘাসের ভেতর, মাঝখানে সরু হাটের ওপর লাফাচ্ছে দুটি রুইমাছ; আলালদ্দি দুটির ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটি ধরতে গেলে আরেকটি পিছলে যায়, হাতে একটি দুটি আঁশ আর সারা শরীরে অপূর্ব গন্ধ লেগে থাকে, আর দু-একটি লাফ দিতে পারলেই মাছ দুটি পানিতে গিয়ে পড়বে, আলালদ্দি মাছ দুটির ওপর বারবার লাফিয়ে পড়তে থাকে, কিছুতেই একটিকেও আর পানিতে ফিরে যেতে দেবে না, সে দেয় না, দুটি মাছেরই কানসার ভেতর দিয়ে সে হাত ঢুকিয়ে দেয়, হাত ঢুকোতে গিয়ে হাত তার কেটে যায়, কিন্তু সে মাছ দুটিকে ছাড়ে না, মাছ দুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আনন্দে সে তার ছেলের নাম ধরে চিৎকার করে ডেকে ওঠে।

তার আনন্দ চিৎকার তার স্ত্রী পারলির কানে গিয়ে আর্তনাদের মতো ঢোকে।

তার স্ত্রী ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে, তুমি এত চিল্লাইতে আছ ক্যান, ছুরইত্তার মতন তুমিও পাগল অইয়া গ্যালা নি?

আলালদ্দি লজ্জা পেয়ে বলে, খোয়াব দেকছি, রুই মাছের খোয়াব।

পারলি ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, তোমার বাপেও রুইত মাছ দ্যাহে নাই, তোমার মতন মরদ দ্যাহে রুইত মাছ।

আলালদ্দি বলে, আসল রুইত মাছ না, খোয়াব দেকছি।

পারলি বলে, খোয়াবেও তোমার মিরকা মাছই দ্যাহনের কতা, তুমি মিরকা মাছের পুরুষপোলা।

আলালদ্দি খোয়াবে আচ্ছন্ন বলে রাগতে পারে না, নইলে সে পারলির বাপের নাম ভুলিয়ে দিতো, যেমন সে মাঝেমাঝেই ভুলিয়ে দেয়। পারলি তখন নিজের বাপের নাম ভুলে আলালদ্দির নাম ডাকতে থাকে।

আলালদ্দি বলে, বড়ো সুখ লাগতাছে, রুইত মাছ দেকছি।

পারলি বলে, খোয়াব লইয়াই থাক, রান্ধনের লিগা বইচা মাছও নাই।

ওই আলালদ্দিই রাতের বেলা ঘুমনাখোয়াব দেখে হুহু করে কেঁদে ওঠে।

খোয়াবে সে তার কুমড়ো ক্ষেতটি দেখতে পায়।

আলালদ্দি দেখতে পায় তার ক্ষেত ভ'রে বড়ো বড়ো কুমড়ো হয়েছে, একেকটি একমণ দু-মণ হবে, এতো বড়ো কুমড়ো তার ক্ষেতে আগে কখনো হয় নি, হওয়ার কথাও সে কখনো

ভাবে নি। কুমড়োগুলো শুধু বড়োই নয়, খুবই কচকচে, নলামাছ দিয়ে খেলেও মধুর মতো লাগবে, ইলিশ মাছের সাথে লাগবে রসগোল্লার মতো কুমড়োগুলোকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় আলালদ্দির। ছোঁয়ার সময় তার মনে হয় সে পারলির দেহটা ছুঁচ্ছে; আজকের পারলির নয়, যে-রাতে সে পারলিকে মাফায় করে কান্দিপাড়া থেকে নিয়ে এসেছিলো, সে-রাতের পারলির দেহের মতো। কিন্তু ছুতে গিয়েই ভয় পেতে থাকে আলালদ্দি; প্রথম কুমড়োটি ছুঁতেই তার আঙুল কুমড়োর ভেতরে ঢুকে যায়, তারপর পুরো হাতটিই ঢুকে যায় কুমড়োটির ভেতর, বিরাট কুমড়োর ভেতর থেকে ভজভজ করে বেরোতে থাকে মলমূত্র, কুমড়োটি তাকে টেনে ঢুকিয়ে ফেলতে চায় খোলের ভেতরে। আলালদ্দি কোনো রকমে হাত টেনে সরিয়ে আনে, এবং ছোঁয় আরেকটি কুমড়ো; ছোঁয়ার সাথে সাথে কুমড়োর ভেতর থেকে গলগল করে উপচে পড়ে মলমূত্র, আলালদ্দি মলমূত্রের নিচে তলিয়ে যেতে থাকে, আর কুমড়োটি তাকে চুমুক দিয়ে নিজের খোলর ভেতর ঢুকিয়ে ফেলে। আলালদ্দি চিৎকার করতে চায়, পারে না; সে আবর্জনার ভেতর লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে; শুধু হুহু শব্দ উঠতে থাকে।

পারলি তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করে, অ, রহমানের বাপ, এমন কইর‍্যা গোঙ্গাইতে আছ ক্যান?

আলালদ্দি কাঁপতে কাঁপতে বলে, আমারে ধরিছ না, আমার শরিলে গু-মুত; কুমরাখ্যাত গু-মুতে ভইরা গ্যাছে, আমি গু-মুতে ডুইব্যা গ্যাছি।

পারলি বলে, তুমি কী যে কও, গু-মুত আইব কোন হান থিকা। তুমি আইজকাল ছুরইত্তার মতন পাগল অইয়া যাইতাছ।

আলালদ্দি বলে, কুমরার ভিতর গু-মুত; আমারে ঢাইক্যা ফ্যালছে, আমি বাইর অইতে পারতাছি না।

তারপর আলালদ্দি আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালবেলা পারলি জানতে চায়, তুমি রাইতে কিয়ের গু-মুতের খোয়ব দ্যাকলা, কুমাখ্যাতে গু-মুতের কতা কইলা?

আলালদ্দি তার খোয়ব মনে করতে পারে না।

এমন অজস্র খোয়ব আমরা দিনরাত দেখছি; আমাদের খোয়াবের কথা দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, আমরা সেগুলো নিয়ে খুবই ব্যস্ত রয়েছি।

জনদরদী সমাজসেবক বিশিষ্ট শিল্পপতি বান্দিরগোলা পাড়াকমিটি ও আল মদিনা মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান পশ্চিম ধনেরপাড়া ডিগ্রি কলেজ কমিটির সভাপতি আলমিনার তিনতারা হোটেলের এমডি বিসমিল্লা ব্যাংকের চেয়ারম্যান (এবং ঋণখেলাপি) সুলতানপুর এতিমখানা ফোরকানিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অ্যাপোলো ম্যান পাওয়ার অ্যান্ড ট্রাভেল এজেন্সির চেয়ারম্যান আমেরিকান গার্মেন্টস-এর এমডি ভূতপূর্ব ওয়ার্ড কমিশনার ছলছলাতির পীর সাহেবের মুরিদ ইত্যাদি ইত্যাদি আলহজ্জ মোহাম্মদ হামিদ আলি বিন শমশের সাহেবের ষোড়শী কন্যা মোসাম্মৎ বেনজির হাফসানা রুবাইয়াত বিউটির খোয়াবগুলো আমাদের খুব আশান্বিত করছে এবং ভাবিয়ে তুলেছে।

৩. মিস বেনজির হাফসানা রুবাইয়াত বিউটি

মিস বেনজির হাফসানা রুবাইয়াত বিউটি চার বছর আগে প্রথম ষোড়শী হয়; তারপর তার আর বয়স বাড়ে নি, সে স্থির ষোড়শী হয়ে আছে। গত বছর সে প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করে পরীক্ষার সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং এবারও অসুস্থ ও ফেল করার পর সে খোয়াব দেখতে শুরু করে। আলহজ্জ হামিদ আলি বিন শমশের সাহেব তাকে আমেরিকা পাঠাতে চেয়েছিলেন, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক একজন বিশিষ্ট শিল্পপতির সাথে বিবাহেরও ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু তার ঘোড়শী কন্যা সে-সব বাতিল করে দিয়ে শুধু খোয়াব দেখছে।

একদিন দুপুরে মিস বিউটি চিৎকার করে ওঠে, আম্মা, দেখে যাও, বোম্বে থিকা ফটোগ্রাফার কিষাণকুমার আসছে। এইবার আমার ড্রিম ফুলফিল হইলো।

মিস বিউটি তার শীততাপদমিত শয্যাকক্ষে গেঞ্জিটাকে নিচের দিকে টেনে পেছন কাঁপিয়ে ক্যাট ওয়াক করতে থাকে, কখনো নাচতে থাকে, গান গাইতে থাকে–প্যায়ার প্যায়ার প্যায়ার তনহা তনহা তনহা।

আম্মা বাসায় ছিলেন না, তাই তিনি আসেন না, পীর সাহেবের বাড়ি গেছেন তিনি; দুটি কাজের মেয়ে ভয় পেয়ে দৌড়ে আসে।

ছমিরন বলে, আফা, কী অইছে আপনের আমাগো কন; আপনে এমুন কইরা হাডাহাডি করতাছেন ক্যান?

মিস বিউটি বলে, বোম্বে থিকা ফটোগ্রাফার আসছে, এইবার আমার ড্রিম ফুলফিল হইলো। আমি মডেল হব, হিরোয়িন হব, বোম্বে যাব।

মিস বিউটি তার গেঞ্জি আরো নামিয়ে আনে, দুটি বেশ বড়ো বস্তুর অর্ধেকের বেশি দেখা যায়।

শেফালি বলে, হ আফা, মডেল অইলে আপনেরে বড়ো মানাইব, আপনের ওই দুইডা মইনশা কৈরেলার দুইডারে ছাড়াই গ্যাছে।

মিস বিউটি শেফালিকে জড়িয়ে ধরে বলে, ডারলিং, কথাটা ট্র বললি তো?

ছমিরন বলে, হ আফা, আপনের পাছাও আল্লার রহমতে বড়ো মাদুরির চাইতে, হাডনের সোম খালি ফাল ফারে।

মিস বিউটি খিলখিল করে হাসতে থাকে, আমি মাধুরী হইবো কাজল হইবো; আই অ্যাম হিরোয়িন।

মিস বিউটি ক্যাট ওয়াক করতে থাকে, নাচতে থাকে, গাইতে থাকে; একবার গাছের গুঁড়ি ভেবে কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে।

ছমিরন আর শেফালি রান্নাঘরে গিয়ে একে অন্যকে বলে, দ্যাকতে মুরগির মতন, আর হে অইব মাদুরি, হে অইবো কাজল।

মোসাম্মৎ বেনজির হাফসানা রুবাইয়াত বিউটি ঘুমনাখোয়াবে দেখে ভিন্ন রকম ব্যাপার, যা জানতে আমাদের বেশ দেরি হয়; কেননা তার ওই খোয়াবটিকে চূড়ান্ত গোপনীয় বস্তু বলে অনেক দিন আটকে রাখা হয়। কিন্তু আমাদের সত্যের দেশে কিছুই গোপন থাকে না, সত্য একদিন এখানে প্রকাশ পেয়েই যায়; আমরা সত্য থেকে কখনোই বঞ্চিত হই না। মোসাম্মৎ বেনজিরের ওই সমস্যাটি শুরু থেকেই ছিলো, যেমন আছে আমাদের অধিকাংশ দ্বিতীয় লিঙ্গের, অর্থাৎ তার মাসিক নিয়মিত ছিলো না। কখনো মাসের পর মাস বন্ধ থাকতো, আবার কখনো মাসে দু-বার দেখা দিতে, কখনো গলগল করে ঝরতো, কখনো দেখা দিতে সামান্য ইঙ্গিত। একরাতে সে খোয়াব দেখে তার শরীর খুব ব্যথা করছে, মাথা ফেটে পড়ছে, তলপেট ভারি হয়ে উঠেছে; সে বুঝতে পারে তার সময় এসে গেছে, তাই সে সেনিটারি টাওয়েল খুঁজতে থাকে। কিন্তু সে দেখতে পায় গলগল করে কালচে রক্ত বেরিয়ে আসছে তার মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে, তার সারা শরীরের লোমকূপ দিয়ে; শুধু যেখানে দিয়ে বেরোনোর কথা সে-স্থানটি থাকে ঝামাপাথরের মতো শুষ্ক। মোসাম্মৎ বেনজির হাফসানা রুবাইয়াত বিউটি ময়লা রক্তের স্রোতের নিচে হারিয়ে যেতে থাকে; সে দেখতে পায় রক্তে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে খাটপালং, বাড়িঘর, তাদের চারতলা দালান, বারিধারা, গুলশান, বনানী, বাস, ট্রাক, ঢাকা শহর, বুড়িগঙ্গা, সারাদেশ; সে চিৎকার করে, তার চিৎকার কেউ শুনতে পায় না।

শুধু আমরা নই, আমাদের নদীনালা খালবিল পুকুর জমি গরুগাভী পথঘাট নৌকো। জাল মাছ কাক চিল চড়ই টুনটুনি দোয়েল ঘরবাড়ি গাছপালা সাপ ব্যাঙ কেঁচো শেয়াল কুকর বেড়াল রিকশা লঞ্চ বাস ট্রাক পোল ব্রিজের দিকে তাকালেও মনে হয় তারা সবাই খোয়াব

দেখছে। তাদের খোয়াবের কথা আমরা জানতে পারি না তারা কথা বলতে পারে না বলে; কিন্তু তাদের দিকে তাকালে মনে হয় তারা দিনরাত দুঃস্বপ্ন দেখে চলছে।

আমাদের ওই বালাসুরের পুকুরটির কথাই ধরা যাক; ওটির দিকে তাকালে মনে হয় ওটি পুকুর নয়, এটি কোনো দুঃস্বপ্নগ্রস্ত বদ্ধ পাগলের চোখ।

পুকুরটিতে অনেক বছর ধরে নতুন পানি আসে না। এক সময় ছিলো যখন বোশেখ শেষ হতে না হতে জ্যৈষ্ঠ আসতে না আসতে হালট উপচে খাল দিয়ে ধান তিল আর পাটখেতের ভেতর দিয়ে খেলার মাঠের সবুজ ঘাস কাঁপিয়ে চারদিক উথালপাথাল করে আসতো জোয়ার, থইথই করতো পুকুর, কেঁপে কেঁপে উঠতো; আজ ওই পুকুর কাঁপে না, জোয়ার আর ঢেউ কাকে বলে জানে না। পুকুর অবাক হয়ে ভাবে তার ভেতরের সেই পুঁটি নলা খলশে শিং মাগুর বাইন রয়না ভেটকি বাউশ সরপুঁটি বোয়াল কই আইর রুই কাতল গরমা ফলি চিতল গজার শোল নামের আনন্দগুলো গেলো কই? সেই কম্পনগুলো কোথায়? কোথায় সেই ঘাই ডাব লাফ? কোথায় টাকির পোনার সোনালি ঝাঁক? কোথায় শোলের পোনার লাল নৃত্য? কোথায় পানি? তার বুকে যতোটুকু পানি আছে, তা আর তার কাছে পানি মনে হয় না; মনে হয় চোখ ভরে ছড়িয়ে পড়েছে ঘোলাটে কেতুর। তার চোখ চটচট করছে, বন্ধ হয়ে আসছে; সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

পুকুরটির দিকে তাকালে বুঝতে পারি পুকুরটি জোয়ারের নতুন পানির উল্লাসের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু জোয়ার আর আসবে না।

পুকুরটির দিকে তাকালে বুঝতে পারি পুকুরটি রুইমাছের লাল গতির স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু রুইমাছ আর আসবে না।

পুকুরটির দিকে তাকালে বুঝতে পারি পুকুরটি কেঁপে কেঁপে ওঠার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু পুকুর আর কেঁপে কেঁপে উঠবে না।

আমরা সবাই খোয়াব দেখছি, তবে এখন সবচেয়ে বেশি খোয়াব দেখছেন আমাদের রাজারা; খোয়াবে খোয়াবে তারা ঘেমে উঠছেন, খোয়াবে খোয়াবে তারা সুখে ভ'রে উঠছেন; এবং আমরা তাদের খোয়বের বিবরণ নিয়ে মেতে আছি। ঘর থেকে বেরোলেই আমরা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করি, রাজারা আমাদের আজ কী খোয়াব দেখেছেন? আমরা তাদের খোয়াব নিয়ে দিনরাত আলোচনা করি, তাদের খোয়াবের ওপরই নির্ভর করে আমাদের জীবন, বিশেষ করে মরণ।

প্রথম আমাদের কানে আসে রাজাকার রাজবংশের অধ্যাপক আলি গোলামের খোয়াবের কথা; তাঁর জাগনাখোয়াব আর ঘুমনাখোয়ব দুটির কথাই আমরা জানতে পারি, জেনে আমরা উল্লাস আর ভয়ে কুঁকড়ে যাই।

খেজুরগাছের দেশ থেকে কিছুক্ষণ আগে তিনি এক মুরুব্বির ফোন পেয়েছেন; ফোন রাখার পরই তিনি খোয়াবটি দেখতে শুরু করেন। কয়েক রেকাত সালাতের ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু মধুর খোয়াবটি এসে তাঁকে সালাতের কথা ভুলিয়ে দেয়।

আলি গোলাম প্রথম টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ শব্দ শুনতে পান, তারপর চিঁহিঁ চিঁহিঁ চিঁহিঁ চিঁহিঁ চিঁহিঁ শব্দ শুনতে পান, পরে তলোয়ারের ঠনঠন শব্দ শুনতে পান, আরো পরে শুনতে পান ট্রা ট্রা ট্রা ট্রা ট্রা ট্রা ট্রা ট্রা।

আলি গোলাম দেখতে পান তার অশ্বারোহীরা আসছে, সপ্তদশ নয় হাজার হাজার, আকাশ থেকে বাতাস থেকে সড়ক দিয়ে গলি দিয়ে ধানক্ষেত মাড়িয়ে অ্যাভিনিউ ভেঙেচুরে তারা চানতারা পাক ঝান্ডা উড়িয়ে আসছে; ঘোড়ার খুরের শব্দে তিনি চান-তারা চান-তারা চান-তারা আওয়াজ শুনতে পান। পথে পথে কল্লা খসে পড়ছে বিধর্মীর, কাফেরের ময়লা রক্তে মাটি কালো হয়ে যাচ্ছে, চানতারা উড়ছে গাছে গাছে বাড়ির ছাদে ছাদে; পবিত্র হচ্ছে বাঙলাস্তান। একটু পরে চোখের কেতুর মুছে দেখতে পান ওগুলো অশ্ব নয়, তার সালেহিনরা ঘোড়ায় চড়ে আসে নি, আজকাল ঘোড়া নেই, ঘোড়ায় চড়ে কিছু দখল করা যায় না, তারা আসছে জিপে, ট্রাকে, আসছে ট্যাংকে কামান দাগিয়ে। তাদের হাতে তলোযার নেই, আজকাল তলোয়ারে চলে না; তারা আসছে মেশিনগান এসএলআর হাতে, মর্টার ছুঁড়ে, বেয়নেট চার্জ করতে করতে; আর তাদের পবিত্র পায়ের নিচে আত্মসমর্পণ করছে বিধর্মীরা। দিকে দিকে আহাজারি উঠেছে, ওই আহাজারি কাফেরদের, কাফেরদের আর্তনাদ তার কানে মধুর শ্লোকের মতো লাগছে; তার সালেহিনরা ভেঙে ফেলছে কাফেরদের দুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, বেলেহাজ মেয়েলোকগুলোকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পরিয়ে দিচ্ছে কাফনের মতো কালো বোরখা; তিনি দেখতে পান একটি চানতারা সিংহাসন এগিয়ে আসছে তার দিকে, তিনি গিয়ে বসছেন। চারদিকে শব্দ উঠছে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

আলি গোলাম উল্লাসে লাফিয়ে উঠে বলেন, দ্যাশে আর কাফের থাকিবে না, অন্য কোনো বহি থাকিবে না, আবু আলার রাষ্ট্র স্থাপিত হইল।

তার এমন উল্লাস আগে কেউ দেখে নি, তাঁকে পাহারা দেয় যে সালেহিনরা তারাও দেখে নি। তাঁর উল্লাস দেখে তারা ভয় পায়।

তারা দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করে, হে আমির, আপনি এমন করতেছেন ক্যান? আপনার মৃগীরোগটি কি আবার দ্যাখা দিয়াছে?

আলি গোলাম বলেন, মৃগীরোগ নহে, সালেহিনরা পাক ওয়াতান কায়েম করিয়াছে, তোমরা বন্দুক ফুটাও।

তারা বলে, হে আমির, আপনে খোয়াব দেখিতেছেন, কোনো পাক ওয়াতান কায়েম হয় নাই, বন্দুক ফুটাইলে আমাদের বিপদ হইবে।

আলি গোলাম বেদ্বীন বাস্তবে ফিরে এসে সালাত কায়েম করতে বসেন।

আলি গোলামের জাগনাখোয়াবের থেকে ঘুমনাখোয়াব অনেক বেশি আকর্ষণীয়; তার ওই খোয়বে আমাদের বাজার ছেয়ে গেছে, কয়েক দিন আমরা অন্য খোয়াব খরিদ না করে তাঁর ঘুমনাখোয়াব খেয়েই দিন কাটাই। ওই খোয়াবের মাজেজা আমরা বুঝতে পারি না, বোঝার আগেই আমরা ভয়ে চিৎকার করে উঠি, তারপর আবার ওই খোয়াব নিয়ে ফিসফিস করে আলাপ করি।

আলি গোলাম দুটি আতরমাখা কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে শুয়ে ছিলেন শুক্রবার রাতে, একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিলো তাঁর; কে যেনো তাকে ধমকে বলে, ঘুমাও আলি গোলাম। ধমক খেয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

ঘুমিয়ে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি খোয়াবটি দেখতে শুরু করেন।

আলি গোলাম দেখতে পান তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন, পরেছেন শুধু শালোয়ার, আর কিছু নেই। বুকের দিকে তাকিয়ে তার চোখে পড়ে পাকা পাকা পশমগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, প্রথম বেশ মজা পান তিনি; শীত লাগে নি অথচ পশম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, বুকটিকে তাঁর একটি খেজুরবাগান বলে মনে হয়, কিন্তু বুকে হাত দিতেই কয়েকটি লোম তার হাতে সুচের মতো বিধে যায়। তিনি তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে আনেন। তিনি উপুড় হতে গিয়ে পারেন না, সুচের মতো পশমগুলো বিধে যেতে থাকে; তিনি আবার চিৎ হয়ে শোন। পেটটি তার জন্মসূত্রেই স্ফীত, কিন্তু পেটের দিকে তাকিয়ে দেখেন পেটটি আস্তে আস্তে ফুলে উঠছে। তিনি বেশ তাজ্জব বোধ করেন, পেট ফোলার কোনো কারণ নেই, সেই সকালে দুটি মুরগি আর দশখান রুটি ছাড়া বিশেষ কিছু তিনি আহার করেন নি। অকারণে পেট ফুলে ওঠায় পেটটিকে তিনি কমিন কমজাত বলে তিরস্কার করেন, কিন্তু পেটটি তার ফুলে উঠতেই থাকে একটু একটু করে।

আলি গোলাম কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করেন, কিন্তু তাতে পেটের ফোলা থামে না, বরং ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকে। তিনি দু-হাতে পেটটিকে চেপে ধরেন যাতে আর ফুলতে না পারে, কিন্তু নদীর জোয়ার কেউ চেপে দমাতে পারে না, তার পেটও বাড়তেই থাকে। একবার তিনি উঠে বাথরুমে যেতে চান, কিন্তু নিজেকে এতো ভারি লাগে যে উঠতে পারেন

না; আবার চিৎ হয়ে পড়েন। এখন পেটটি বেশ উঁচু হয়েছে, মোসাম্মৎ গোলাম বিনতে মর্জিনা খাতুনের জন্মের আগে বিবির উদর দেখতে যেমন মরা ভোলা ছাগলের মতো হয়েছিলো তেমন দেখায় তার পেটটি; তিনি বলে ওঠেন, ইহা হইতে পারে না, আমি পুরুষপোলা, আমার পেট হইতে পারে না, আমি সহবত করি নাই।

আলি গোলামের পেট বাড়তে থাকে, ভেতরে একটা খচ্চরের লাশ ঢুকে গেছে বলে মনে হয় তার; তিনি দেখেন সেটি বড়ো বস্তার মতো হয়ে উঠেছে, দু-হাতে বেড় পাচ্ছেন না; চিমটি কাটতে গিয়ে দেখেন চিমটি কাটতে পারছেন না, একবার ঘুষি দিয়ে দেখেন পেটটি লোহার সিন্দুকের মতো শক্ত পেটটি খুবই ভারি হয়ে উঠেছে; এখন তার মনে হয় পেটের ভেতর কী যেনো খটখট ট্রা ট্রা ভোম ভোম করছে, খচ্চর দৌড়াইতেছে, ভেতরে বিস্ফোরণ হচ্ছে। ওই শব্দে তার পেট আর দেহ আর খাট কেঁপেকেঁপে উঠছে। এমন বিস্ফোরণ রাস্তায় হ'লে তার শান্তি লাগতো, কিন্তু পেটের ভেতর হচ্ছে বলে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন।

পেটটি আরো ফুলছে আলি গোলামের, ফুলে ফুলে সিলিংয়ে ঠেকে গেছে, সেলিং হয়তো ভেঙে পড়বে, একবার তার মনে হলো পেটটি এক বিশাল উট হয়ে গেছে, যার আট-দশটা কুঁজ, সামনে পেছনে ডানে বাঁয়ে বেড়ে ঘর ভরে ফেলেছে; আলি গোলাম কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, বিশাল পেটের নিচে তিনি মাছির মতো পড়ে আছেন। আমি কি মাছি, আমি কি তেলাপোকা, আমি কি ইন্দুর, আমি কি টিকটিকি, আমি কি মুরগির ছাও, আমি কি পোটকামাছ? এরকম ভাবনা আসে তার মাথায়, জট পাকিয়ে যায়। ভাবনাগুলো; তিনি একটি দীর্ঘ শ্লোক পড়তে চান, তবে তার মনে আসে না। আমি কাহা, নিজেকে প্রশ্ন করেন আলি গোলাম, আমি কি আছি, আমি কি ছিলাম, আমি কি থাকবো? তাঁর মনে হয় পেটের নিচে তিনি তিনশো চান্দ্র বছর ধরে চাপা পড়ে আছেন; তার পেট আরো ফুলে উঠছে,

দেয়াল সিলিং ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে, পোটকামাছের ভেতর অনেকগুলো উট ঠেলাঠেলি করছে। আলি গোলাম চিৎকার করতে চান, পেটের নিচে তাঁর মুখ চাপা পড়ে আছে বলে পারেন না।

তাঁর পেট ফাটে না, অদ্ভুত পেট, ভেতরে ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হয়, তিনি ওই শব্দ শোনার চেষ্টা করেন, ঠিকমতো শুনতে পান না। তিনি ট্রাট্রাট্রাট্রা শুনতে চান, কিন্তু ঘড়ঘড় শব্দ উঠতে থাকে পেট থেকে। আলি গোলাম হঠাৎ বমি করে ফেলেন; বমি বেরোতে না পেরে পেটের নিচে মুখের ওপর ঘন হয়ে জমে থাকে। আলি গোলাম একটি পরিচিত দুর্গন্ধ পান; ওই গন্ধটিকে তাঁর অদ্ভুত মধুর লাগে। একটু পর মুক্তি ঘটতে শুরু হয় আলি গোলামের পেছনের দিক দিয়ে প্রবল বেগে শুরু হয় নিঃসরণ, প্রচণ্ড শব্দ হতে থাকে, তীব্র বেগে তরলতা উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে দিগ্বিদিক; তরল পদার্থের সাথে বেরোতে থাকে একটি দুটি তিনটি চারটি হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি চানতারা, তিনি দেখতে পান, এতে চানতারা নেই আকাশে, চানতারায় তাঁর ঘর ভরে যেতে থাকে, তার শরীর আর মুখের ওপর দিয়ে প্লাবনের মতো প্রবাহিত হতে থাকে তরল চানতারার ঘন স্রোত; আলি গোলাম হাত দিয়ে মুঠো মুঠো চানতারার তরলতা তুলে চিৎকার করেন, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

আলি গোলামের ঘুম ভেঙে যায়, শুনতে পান বাইরে একপাল কুকুর ডাকছে।

আলি গোলামের খোয়াব, ওই খোয়াবের ইতিবৃত্ত, অভিনবত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে যখন মশগুল ছিলাম আমরা, তখন আমাদের কাছে এসে পৌঁছে খোজারাজবংশের বাবরের খোয়াবের বিবরণ। বাবর সাহেব অনেক বছর আগে শ্রেষ্ঠ খোয়বি হিশেবে নাম করেছিলেন, তাকে আমরা খোয়াববন্ধু, খোয়াবপতি, খোয়াবশিল্পী, খোয়াবকৃষ্ণ প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত

করেছিলাম। তখন তিনি শক্তিশালী ছিলেন, আমাদের খোয়াববিজ্ঞানীরা তার খোয়বাবলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে বিশ্বখোয়াবের ইতিহাসে খোজাবংশের বাবর শ্রেষ্ঠ খোয়াবি; পরে আবার তারাই দেখিয়েছিলেন যে তার খোয়াবগুলো খুবই নিকৃষ্ট, চামাররাও এর থেকে উৎকৃষ্ট খোয়াব দেখে, কেননা ওইগুলো খোয়াব দেখার সাতদিন আগে থেকে পুরোনো সিংগার মেশিনে পুরোনো কাপড়ে শেলাই করা, তালিমারা, জোড়া দেয়া, আঠালাগানো, জংধরা ও পচা। আজকাল তার নাম শুনলেই আমরা হাসি; তার খোয়াবের কথা শুনলে খোয়াব না শুনেই আমরা অতিশয় তৃতীয় শ্রেণীর হাসাহাসি করি।

আমাদের স্বভাবই এই; এককালে যাকে নিয়ে আমরা কাদাকাটি করতাম তাঁকে নিয়ে আজকাল আমরা হাসাহাসি করি। আজকাল যাঁদের নিয়ে আমরা কাদাকাটি করছি আগামীকাল তাঁদের নিয়েও আমরা অতিশয় চতুর্থ শ্রেণীর হাসাহাসি করবো।

খোজারাজবংশের মহাগণনেতা কারাকক্ষের এক কোণে বসে আছেন, এমন সময় খোয়াবটি এসে তাঁকে সরাসরি ধাক্কা দেয়।

কক্ষটি জুড়ে বেশ অন্ধকার, যদিও দুপুরবেলা; দেয়ালের এখান সেখান থেকে চুনকাম খসে পড়েছে, কয়েকটি মাকড়সা সিলিং থেকে সার্কাসের তরুণীদের মতো রগরগে খেলা দেখাচ্ছে, দুটি টিকটিকি হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে তার পা মাড়িয়ে চলে গেলো। একটু দূরে মিলিত হয়েছে দুটি নির্লজ্জ তেলাপোকা।

এমন সময় খোয়াবটি এসে তাকে চাষার মতো সজোরে আক্রমণ করে।

মহাগণনেতা শুনতে পান নগর জুড়ে উৎসবের শব্দ উঠছে, অজস্র বাদ্য বাজছে, লা লাখ কণ্ঠস্বর কী যেনো ধ্বনিত করছে; প্রথম তিনি বুঝতে পারেন না, পরে বুঝতে পারেন নগরের জনগণ তাঁর নাম ধরে উচ্চকণ্ঠে শ্লোগান দিচ্ছে, বাদ্য বাজিয়ে তারা শ্লোগান দিতে দিতে এদিকে আসছে; তিনি স্পষ্ট শুনতে পান তারা জেলের তালা ভাঙবো মহাগণনেতাকে আনবো, তোমার নেতা আমার নেতা মহাগণনেতা মহাগণনেতা, ফুল এনেছি তাজা বেরিয়ে আসো রাজা শ্লোগান দিতে দিতে তারা এদিকে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে জনগণের বন্যার স্রোতে ভেসে যায় জেলখানা, লাখ লাখ মানুষ ঢুকে পড়ে জেলের ভেতরে। জেলের সব প্রহরী পালিয়ে বাঁচে। জনগণ তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে ঘোষণা করে 'হে আমাদের রাজা, তুমি আমাদের চিরকালের রাজা; আমরা সব জালিমকে পুড়িয়ে মেরেছি, তোমাকে নিতে এসেছি আমাদের চিরদিনের রাজা করার জন্যে; তুমি আমাদের সম্রাট।' তিনি দেখতে পান শহরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা (বয়স ৪৫ থেকে ৫৫) চুম্বন করছে তার পদতলে; তারা বলছে, তুমি শুধু দেশের রাজা নও, আমাদের বুকেরও রাজা।

তিনি লাফিয়ে উঠতে গিয়ে দেখেন একটি টিকটিকি ঝুলছে তার কানে (স্থানটি সম্পর্কে বিভিন্নজন বিভিন্ন মত পোষণ করেন)।

রাতে তিনি দেখেন তাঁর ঘুমনাখোয়াবটি।

তিনি দেখতে পান অপরূপ অরণ্যের ভেতর দিয়ে বয়ে চলছে এক অপরূপবতী নদী, সেই বনে সেই যমুনার পারে সেই ব্রজে তিনি বেড়াচ্ছেন, তাঁর বাহুতে পাঁচতারার মতো ঝলমল করছে এক অপরূপসী; তিনি যেই ঠোঁটে চুমো খেতে যাবেন, একপাল রাক্ষস হৈহৈ করে এসে জোর করে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার অপরূপসীকে। তিনি তাদের

পেছনে ছুটতে গিয়ে দেখেন দুই দিক থেকে লাঙলের মতো দাঁত উঁচিয়ে বল্লমের মতো নখ খাড়া করে কোদালের মতো ঠোঁট ঝুলিয়ে তার দিকে আসছে দুই রাক্ষসী। দূরে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটি বুড়ী রাক্ষসী। তিনি দৌড়োতে গিয়ে পিছলে পড়েন; এক রাক্ষসী তাঁর দুই হাত ছিঁড়ে পান্তাভাতের সাথে মুখে গোঁজে আরেক রাক্ষসী তার দুই পা ভেঙে জর্দা বানিয়ে হাতির কানের সমান পানের সঙ্গে খায়, এক রাক্ষসী তাঁর মাথাটি খুলে নিয়ে মারবেল খেলে আরেক রাক্ষসী তার দেহটি ভেঙেচুরে ভর্তা বানিয়ে পোড়া মরিচ দিয়ে আহার করে।

রাক্ষসীরা যখন তাকে আহার করে তখনো তিনি খোয়াব দেখতে থাকেন।

মহাগণনেতার খোয়ব দুটি আলোড়ন তোলে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে; খোয়াববিদরা বলতে থাকেন এই প্রথম তিনি মৌলিক খোয়াব দেখেছেন, এর মধ্যে কোনো ভেজাল, জোড়াতালি, পচা গন্ধ নেই।

আমরা মহাগণনেতা বাবর মুঘলের খোয়াব নিয়ে এক দিনের বেশি ব্যস্ত থাকতে পারি না, তার খোয়বে মৌলিকত্ব থাকলেও কোনো ভবিষ্যৎ নেই, আমরা গরিবেরাও এটা বুঝতে পারি, তার সবই অতীত; আমরা মৌলিক ও ভবিষ্যসম্পন্ন খোয়াবের জন্যে অধীর অপেক্ষা করতে থাকি, এবং পর দিন ভোরবেলার মধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে ট্রাকে বাসে বিপুল পরিমাণ সম্ভাবনাপূর্ণ খোয়াব আমাদের হাটেবাজারে মাঠেঘাটে জমিতে বাড়িতে এসে পৌঁছোতে থাকে। সবচেয়ে মৌলিক মূল্যবান ভবিষ্যৎগর্ভ খোয়ব হচ্ছে দুই মহারানীর, কুইন ভিক্টোরিয়া ও সুলতানা রাজিয়ার–মহাদেশনেত্রী ও মহাজননেত্রীর খোয়াব, তাদের গিঁটেই বাধা আমাদের জীবন, বিশেষ করে মৃত্যু–এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মৃত্যুই আমাদের জীবন; তাদের নখের লালের ওপর নির্ভর করে আমাদের জীবন–এটা আমাদের জন্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

নয়, এটাই আমাদের মৃত্যু, তাঁদের–পায়ের আঙুলের ব্যথার ওপর নির্ভর করে আমাদের মৃত্যু, তাঁদের ঘোমটার পরিধির ওপর নির্ভর করে আমাদের জমির শস্য, তাদের ঘুম থেকে জাগার ওপর নির্ভর করে আমাদের নদীর জল। তারা অবশ্য নিজেদের জন্যে খোয়াব দেখেন না, দেখেন আমাদের জন্যে; আমরা শুনতে পাই দিনরাত তারা খোয়াব দেখছেন, জাগনা আর ঘুমনাখোয়াবের তাণ্ডবে তাদের চোখ লাল নীল সবুজ বেগুনি হলদে কালো হয়ে আছে।

তাদের জাগনাভোয়াব আর ঘুমনাখোয়াবের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকছে না; যা দেখতে পারতেন তারা দুপুরবেলা তা তারা দেখছেন মধ্যরাতে; যা দেখতে পারতেন মধ্যরাতে তা দেখছেন সকাল সাড়ে সাতটায় বা দশটায় দুপুর দেড়টায় বিকেল পাঁচটায়। আমরা টের পাই তাদের ঘুম আর জেগে থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, ঘুম তাদের জন্যে জেগে থাকা আর জেগে থাকা তাদের জন্যে ঘুম। যাদের স্যান্ডেলের নিচে ভবিষ্যৎ তাদের মগজ ঘুম জানে না জাগা জানে না।

মহাদেশনেত্রী জাগনাভোয়াবে দেখেছেন–(এটা ঘুমনাখোয়ব হওয়ারই কথা, তবে ঘুম হচ্ছে না বলে জাগনাখোয়বেই তিনি দেখে ফেলেছেন, ফাইভের বইতে এমন খোয়াবের কথা তিনি হয়তো পড়েছিলেন বা দাদীর কাছে শুনেছিলেন কোনো সন্ধ্যায়, দীর্ঘকাল পরে সেটা তাঁর ভেতর থেকে সহজে জেগে উঠেছে)–আকাশে দশটি নীল আর লাল নতুন তারা উঠেছে, ধীরেধীরে সেগুলো একটি মুকুটে পরিণত হলো, অজস্র শাদা তারারা নেচে নেচে ওই মুকুট পরিয়ে দিলো তার মাথায়, আর আকাশের পশ্চিম থেকে উঠে এলো একটি সিংহাসন, তারারা তাকে সিংহাসনে বসিয়ে নত হয়ে চুম্বন করলো পদতলে।

খুবই উত্তম রাজকীয় ফিলিস্তিনি খোয়াব এটি, তাঁর রাজবংশের রাজপুত্ররা এতে গভীর ইঙ্গিত পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, আমরাও হৈচৈ শুরু করলাম। আমরা বুঝতে পারলাম হেলিকপ্টারে চড়ে আগামী বছরগুলোর বন্যা আর তুফানের সুন্দর দৃশ্যরাশি তারাই দেখবেন।

কিন্তু ঘুমনাখোয়াবে তিনি দেখলেন আকাশে বিশটি লাল আর সবুজ নতুন তারা উঠেছে, সেগুলো ধীরধীরে একটি অপূর্ব মুকুটে পরিণত হলো, অজস্র তারারা সেই তারার মুকুট তার মাথায় পরানোর জন্যে এগিয়ে আসছে, অমন সময় এক ডাইনি রাহু এসে ছোঁ মেরে সেই মুকুট নিয়ে নিজের মাথায় পরলো, তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিলো মেঘ ঝড় অন্ধকার; তিনি অন্ধকারে চিৎকার করে উঠলেন।

খোয়াবটি কয়েক ঘণ্টা গোপন ফাইলে চেপে রাখা হয় পাথর দিয়ে, কিন্তু খোয়াবেরও নিজস্ব প্রাণশক্তি আছে বলে কেঁচোর মতো লিকলিক করে প্রকাশ পেয়ে যায়; তাঁর রাজপুত্ররা এতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, আমরাও উদ্বিগ্ন হই। আমরা বুঝতে পারি হেলিকপ্টারে চড়ে আগামী বছরগুলোর বন্যা আর তুফানের সুন্দর দৃশ্যরাশি অন্যরা দেখবেন।

মহাজননেত্রী জাগনাখোয়াবে দেখেছেন কোটি কোটি মানুষ মুকুট আর সিংহাসন মাথায় করে আসছে তার বাড়ির দিকে, তারা খুঁজছে তাদের প্রাণপ্রিয় রাজকন্যাকে, এবং তাঁর মাথায় পরিয়ে দিচ্ছে মুকুট, নাচতে নাচতে তাঁকে বসাচ্ছে সিংহাসনে। আমরা বুঝতে পারি আগামী বছরগুলোতে বারবার বিদেশভ্রমণে তিনি ও তাঁরাই যাবেন।

মহাজননেত্রী ওই রাতেই ঘুমনাখোয়াবে দেখেন কোটি কোটি মানুষ মুকুট আর সিংহাসন মাথায় করে আসছে তার বাড়ির দিকে, তারা খুঁজছে রাজকন্যাকে, এবং তাঁর মাথায় পরিয়ে দিচ্ছে মুকুট, এমন সময় এক ডাইনি এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় তার মুকুট ও সিংহাসন। আমরা বুঝতে পারি আগামী বছরগুলোতে বারবার বিদেশভ্রমণে অন্যরা যাবেন।

মহাদেশনেত্রী জাগনাখোয়াবে দেখেছেন ইরিক্ষেতের পর ইরিক্ষেতে (অবশ্য কোনো দিন বাস্তবে তিনি ইরিক্ষেত বা পাটক্ষেত বা কোনো ক্ষেতই দেখেন নি, তাঁর উঁচু হিলে মাটি লাগবে ব'লে, তবে দেশকে ভালোবাসেন বলে ক্ষেত জাতীয় ব্যাপারগুলোকে দেখার কাজ তিনি স্বপ্নেই সম্পন্ন করেন) সোনার গাছে হীরের পাতা আর মুক্তোর শীষ দেখা দিয়েছে। আমরা বুঝতে পারি আগামী বছরগুলোতে টেলিভিশনে আর সংবাদপত্রে দিনরাত শুধু তাকেই দেখা যাবে।

তিনি ঘুমনাখোয়াবে দেখেছেন ইরিক্ষেতের পর ইরিক্ষেতে এবং আর যতো ক্ষেত (কী কী ক্ষেত আছে সে সম্পর্কে তার ধারণা রাজকীয়ভাবে অস্পষ্ট) আছে আর শীষ আছে, তাতে পোকা লেগেছে, সব শীষ পচা পোকার মতো পড়ে আছে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত (তিনি অবশ্য স্বপ্নে দেখা এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিত নন, কেননা দেশটির পুব বা পশ্চিম উত্তর দিকে না দক্ষিণ দিকে এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন), পঙ্গপালে ঢেকে গেছে সূর্য। আমরা বুঝতে পারি আগামী বছরগুলোতে টেলিভিশনে আর সংবাদপত্রে দিনরাত অন্য একজনকেই দেখা যাবে।

মহাজননেত্রী জাগনাখোয়াবে দেখেছেন পদ্মা মেঘনা যমুনা ব্রহ্মপুত্র কর্ণফুলি বুড়িগঙ্গা কাঁকড়া কারাঙ্গি ইছামতি মধুমতি সুরমা শীতলক্ষা গোমতি কপোতাক্ষ করতোয়া তুরাগ আরো যতো

নদী আছে সব নদী দিয়ে প্রবল বেগে বইছে জলধারা, আর নদীতে পুকুরে খালে বিলে ভাসছে লাখ লাখ সোনার তরী। আমরা বুঝতে পারি আগামী বছরগুলোতে এ-বংশের রাজপুরুষেরাই পথে পথে স্থাপন করবেন ভিত্তিপ্রস্তর, উদ্বোধন করবেন সেতু সিনেমা হল মুদিদোকান।

তিনি ঘুমনাখোয়াবে দেখেছেন পদ্মা মেঘনা যমুনা ব্রহ্মপুত্র কর্ণফুলি বুড়িগঙ্গা কাঁকড়া কারাঙ্গি ইছামতি মধুমতি সুরমা শীতলক্ষা গোমতি কপোতাক্ষ করতোয়া তুরাগ আরো যতো নদী আছে সব শুকিয়ে সাহারা হয়ে গেছে, ছাইয়ের মতো বালিতে ঢেকে গেছে সুন্দরবন থেকে সাজেক, একদা নদী পুকুর খাল বিলে পড়ে আছে তরীর অজস্র অদ্ভুত ভাঙাচোরা বিশ্লিষ্ট কঙ্কাল। আমরা বুঝতে পারি আগামী বছরগুলোতে অন্য বংশের রাজপুরুষেরাই পথে পথে স্থাপন করবেন ভিত্তিপ্রস্তর, উদ্বোধন করবেন সেতু সিনেমা হল মুদিদোকান।

মহাদেশনেত্রী জাগনাখোয়াবে দেখেছেন তিনি ফুলবনে দখিনা মলয়ে ছন্দে ছন্দে বনফুলের মতো আনন্দে দুলছেন; তার ওপর ঝরে পড়ছে শিউলি বকুল পারুল বেলি মল্লিকা। আমরা বুঝতে পারি আগামী বছরগুলোতে তার বংশের রাজপুত্ররা ব্যাংক থেকে যত খুশি ততো কোটি ডলার তুলে নিয়ে শিল্পপতি হবেন।

তিনি ঘুমনাখোয়াবে দেখেছেন তার চারদিকে আগুন লেগেছে, দাউদাউ দাবানলে কাগজের মতো পুড়ছে বন আর ফুলবন আর দোলনা। আমরা বুঝতে পারি আগামী বছরগুলোতে অন্য বংশের প্রিয়রা আর রাজপুত্ররা ব্যাংক থেকে যতো খুশি ততো কোটি ডলার তুলে নিয়ে শিল্পপতি হবেন।

মহাজননেত্রী জাগনাখোয়াবে দেখেছেন দেশের ৭২৯জন আধুনিক, উপাধুনিক, প্রাগাধুনিক, পরাধুনিক, গলাধুনিক, স্তবাধুনিক কবিয়াল.তার ও তার বংশের নামে ১২৫টি নতুন ছন্দ আবিষ্কার করে পাঁচ হাজার টন পদ্য উৎপাদন করেছেন, আরো তিন হাজার টন পাইপলাইনে রয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই উৎপাদিত হয়ে গলগল করে পথে পথে ঝরে পড়বে। আমরা বুঝতে পারি আগামী বছরগুলোতে তাঁর বংশের মহারাজের নামে নামকরণ করা হবে দেশের সব পথঘাট বিমানবন্দর সেতু সারকারখানা খেলার মাঠ বিশ্ববিদ্যালয়।

তিনি ঘুমনাখোয়াবে দেখেছেন কবিয়ালদের পদ্যগুলো স্তব নয়, প্রচণ্ড শ্লোগান, কাঁপছে পথঘাট শহর গ্রাম দালানকোঠা গাছপালা। আমরা বুঝতে পারি আগামী বছরগুলোতে সব পথঘাট বিমানবন্দর সেতু সারকারখানা খেলার মাঠ কাঁচাবাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হবে অন্যবংশের রাজাধিরাজের নামে।

এই সব স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে আছেন আমাদের রাজারা, আছি আমরা; চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে খোয়াবের কলেরা।

আমরা শুনতে পাই শক্তির উৎসবাদী রাজবংশের অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু, জেনারেল কেরামতউদ্দিন, সোলায়মান হাওলাদার খুবই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন, নিশ্বাস নেয়ার, এমনকি উপপত্নীদেরও এক-আধঘণ্টা দেয়ার মতো সময় পাচ্ছেন না, সময়ের বড়োই অভাব; কিছুটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন রাজবংশটিকে গুছিয়ে আনার জন্যে তারা মহান জেনারেলকে মনে ও তার আদর্শে অবিচল আস্থা রেখে আপ্রাণ সাধনা করে চলছেন। কিছু দিন আগেও তারা রাজা ছিলেন, তারপর এমন হলো যে মনে হচ্ছিলো পাজেরো আর মার্সিডিস ফেলে পালিয়ে যেতে হবে শহর থেকে পালাতে গিয়ে মনে পড়লো পালাবেন কেনো? তারা কি জনগণের

হৃদয়ের ধন ছিলেন না? কিছু দিন আগেও কি তাঁরা দশ কেজি বিশ কেজি ওজনের ফুলের মালা গলায় পরেন নি জনগণের হাত থেকে? দু-মাস আগেও কি একটা সফল, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়ী হয়ে তারা দেশকে বাঁচান নি? তাঁরা দেশ না বাঁচালে কে বাঁচাতো? না হয় আর কোনো দল নির্বাচনে অংশ না-ই নিয়েছিলো, সেগুলো গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না বলে অমন সুন্দর নির্বাচনটিতে অংশ নেয় নি; কিন্তু তারা কি নির্বাচন করে জয়লাভ করেন নি? এখন কি জনগণ তাদের শহর থেকে বের করে দিতে চায়? জনগণকে অবশ্য বিশ্বাস করা যায় না; হারামজাদারা কখন কারে মালা দিবো, কোন নাঙ্গের লগে ঘুমাইবো, কারে সিংহাসনে বসাইবো তার ঠিক নাই। তবে আসল বদমাইশ ওই জনগণমন রাজবংশের শয়তানগুলো, জনগণ যাদের চায় না, যাদের তিনশো বছরের মধ্যেও রাজা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু রাজা হওয়ার জন্যে যারা কার্তিকের কুত্তার মতো পাগলা হয়ে উঠেছে, তারাই নানা মিথ্যে কথা বলে বাস্ট্রাক ভেঙে আগুন লাগিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলেছে জনগণকে। আর আছে হাড্ডিতে হাড়িতে শুয়ারের বাচ্চা আমলাগুলো;–ওইগুলোকে সকালে বিকেলে মাগরেবে এশায় এতো প্রমোশন দেয়া হলো, কোটি কোটি টাকা চুরি করার সুযোগ দেয়া হলো, পরস্পরের বউ ভাগানোর জন্যে এতো পুরস্কার দেয়া হলো, তবু বাঞ্চতগুলো রাস্তার দিকে ছুটলো, জনগণমন রাজবংশের বাঁশের কেল্লায় লাফিয়ে উঠে গলা ফুলিয়ে চিল্লাপাল্লা শুরু করে দিলো। দেখে নেয়া হবে সময় এলে, একটাকেও ছাড়া হবে না।

তখন শহরের গাছপালাগুলোর ডালপালা থেকে পথে পথে পাতা ঝরে পড়ছে, অমন নিষ্ঠুর সুন্দর সময়ে শহর ছেড়ে প্রায় পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম করেছিলেন এ-বংশের রাজপুরুষেরা, তাঁদের দুর্ধর্ষ রাজপুত্ররা–এতো ভয় তারা আর কখনো পান নি; কিন্তু পালানোর জন্যে বেরিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু, জেনারেল কেরামত, সোলায়মান হাওলাদার, বিশেষ করে অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু; এবং রুখে দাঁড়ানোর ফল

পাওয়া গিয়েছিলো সঙ্গে সঙ্গে। জনগণমনের দুষ্কৃতিকারীগুলো তাদের তাড়া করে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু যেই রুখে দাঁড়ালেন অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু, নিজেদের বাঁশের কেল্লা বানিয়ে ঘোষণা করলেন চোখের বদলে চোখ নাকের বদলে নাক ছিঁড়ে নেয়া হবে, তাদের দিকে একটুকু হাতপা বাড়ালে হাতপা গুড়ো করে দেয়া হবে, তখন থমকে দাঁড়ালো জনগণমনের দুষ্কৃতিকারীগুলো, তারা ভয়ই পেয়ে গেলো; এবং এক বিকেলে অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু নতুন করে পরিণত হলেন নায়কে।

আমরা জনগণরা কোনো দিন বুঝতেই পারি নি যে অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টুর থলথলে বুকে এতো সাহস, গলা এতো উচ্চ, কণ্ঠে এতো বজ্র। সুযোগ থাকলে নতুন কোনো দেশের তিনি জাতির পিতা হতে পারতেন; এক গর্জনে তিনি দেশছাড়া করতে পারতেন দখলদার বাহিনীকে।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু কেল্লায় ওঠেন প্রথম বক্তৃতা দিতে, বা তাকেই প্রথম বক্তৃতা দেয়ার জন্যে কেল্লায় ওঠানো হয়; এবং তার প্রথম কথায়ই সবাই গর্জন করে ওঠে তার সাথে, বিকেল ও সন্ধ্যে ভরে তিনি একলাই বক্তৃতা দেন। তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেন। তার বজ্রকণ্ঠের পর আর কারো বক্তৃতা দেয়ার সাহস হয় না, দরকারও হয় না; অন্যরা শুধু তার সাথে শ্লোগান দিতে থাকেন চারপাশ কাপিয়ে, আর শহরের নানা দিক থেকে শক্তির উৎসবাদী দলের প্রজারা এসে পথের উত্তর থেকে দক্ষিণ কোণ পর্যন্ত কানায় কানায় ভরে ফেলে নিজেদের ঝকঝকে জিনিশগুলো জামার নিচে নিয়ে দৌড়ে আসতে থাকেন দলের দুর্ধর্ষ ক্যাডার বা রাজপুত্ররা, যারা দুপুরেও শহর ছেড়ে চুপচাপ পালিয়ে গিয়ে জনগণমন রাজবংশে যোগ দেয়ার কথা গভীরভাবে বিবেচনা করছিলেন। তাঁরা জানেন ক্যাডারদের কোনো দিন অমর্যাদা হয় না, ক্যাডার সর্বত্র পূজিত।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু প্রথম গলা খুলেই বলেন, উৎসবাদী রাজবংশের দুর্ধর্ষ বীরেরা, বুলডজারের মতো সিপাহিরা, তোমরা রুইখ্যা দারাও।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে ওঠে সবাই, আমরা রুইখ্যা দারাইছি, আমরা রুইখ্যা দারাইছি। তাদের গর্জন দশ মিনিট ধরে চলতে থাকে।

তিনি বলেন, এই দিকে অরা এক পাও বাড়াইলে তোমরা অগো হাত পাও মাথা ছাতু কইরা দিবা, মগজ ভর্তা কইর‍্যা দিবা, চউক্ষের বদলে চউক্ষু নিবা, নাকের বদলে নাক নিবা, অগো শহর থিকা বাইর কইর‍্যা দিবা।

তাঁর বক্তৃতা শুনে উত্বাদী দলের রাস্তায় নোক উপচে পড়ে, দুর্ধর্ষ ক্যাডাররা আকাশের দিকে তুবড়ি ছুঁড়তে থাকে, দূর থেকে শুনে ভয়ে আমরা জনগণরা কাঁপতে থাকি; আর এ-সংবাদ দুই মাইল দূরে জনগণমন বংশের রাস্তায় ও কেল্লায় গিয়ে পৌঁছলে জনগণমন বংশের রাজপুরুষরা ও ক্যাডাররা ডরে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। খুব ভয় পান তারা, তাই কয়েক মুহূর্ত তারা বরফের মতো জমে থাকেন, গলা দিয়ে তাদের গর্জন বেরোতে চায় না। জমাট গর্জন তাঁদের গলায় আটকে থাকে। জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশের ভয়টা, আমাদের মনে হয়, দু-রকম: প্রথম ভয়টা হচ্ছে ক্যাডারে ক্যাডারে লাগলে তারা হয়তো পেরে উঠবেন না, তাদের ক্যাডারগুলোরে ভালো করে তৈরি করা হয় নি, আর দ্বিতীয় ভয়টা হচ্ছে এ-সময় যদি কোনো গোলমাল হয়ে যায়, যদি দেশের বড়ো ক্যাডাররা নেমে পড়ে, তাহলে তাদেরও পালাতে হবে, সব মাটি হয়ে যাবে। বড়ো ক্যাডাররা নামলে তো আবার দশ বছর। সব মাটি করার জন্যে কি তারা তিন বছর ধরে এতো দামি দামি ঘাম ফেললেন? তাদের মাথার

ঘামের বড়ো বড়ো ফোঁটায় শহরের পথঘাট ভিজে গেছে, তাই তারা এমন সময়ে এমন কাজ করতে পারেন না, যাতে সব কিছু বাঙলাদেশের মাটির থেকেও মাটি হয়ে যায়।

রুখে দাঁড়ানোর কয়েক দিন আগে অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু, জেনারেল কেরামতউদ্দিন, আর সোলায়মান হাওলাদারের মাথায় আরেকটি অব্যর্থ বুদ্ধিও এসেছিলো, কিন্তু সেটি তারা বাস্তবায়িত করতে পারেন নি; পারলে আর রুখে দাঁড়ানোর দরকার হতো না, তারাই এখনো থাকতেন রাজা; জনগণমনদের লেজ নামিয়ে পথ থেকে সরে যেতে হতো। আমরা মূর্খ জনগণরা রাজনীতির আর কী বুঝি? রাজনীতির রয়েছে দশ কোটি কানাগলি, পাঁচ কোটি উপগলি, সাতাশ লক্ষ ষড়যন্ত্র, বত্রিশ লক্ষ বদমাশি, আরো কতো রাজকীয় ব্যাপার; রাজকীয় কারবারে সবই সুন্দর যদি শুধু ক্ষমতা হাতের মুঠোয় থাকে। জনগণমন রাজবংশের রাজপুরুষরা যখন কেল্লা বানিয়ে রাস্তা জুড়ে গোলমাল করে চলছেন, তিন চারটা মোটাগাটা আমলা যখন কেল্লায় উঠে বড়ো বড়ো বক্তৃতা ঝাড়ছেন গণতন্ত্রের জন্যে, তখন অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু, জেনারেল কেরামতউদ্দিন, সোলায়মান হাওলাদার বুঝতে পারেন গোলমালের মূল কোনো মোটাগাটা আমলা নয়, কোনো বড়ো রাজপুরুষ নয়, মূল হচ্ছে একটি রোগাপটকা দারোয়ান। ওই দারোয়ানটাই সব নষ্টের মূল, সবচেয়ে শক্তিমান।

ওই রোগাপটকা দারোয়ানটির নাম মোঃ হামিদ মিয়া।

মোঃ হামিদ মিয়া দারোয়ান, তবে তিনি শুধু দারোয়ান নন। মোটাগাটাচ্যাপ্টা আমলাদের জন্যে দেয়াল দিয়ে ঘিরে যে একটি বিশাল প্রাসাদপল্লী বানিয়ে দেয়া হয়েছে, হামিদ মিয়া সেখানকার দারোয়ান; তবে তিনি নেতা, ওই প্রাসাদপল্লীর নিম্নবর্ণের কর্মচারীদের তিনি এক নম্বর নেতা। তিনি বিদ্রোহ করেছেন বলেই ওই প্রাসাদপল্লী ভেঙে পড়েছে, তাঁর

আদেশেই নিম্নবর্ণের কর্মচারীরা গলা ধাক্কা দিয়ে প্রাসাদপল্লী থেকে বের করে দিয়েছেন শক্তির উৎসবাদী রাজবংশের রাজাদের। তিনি দেখা দিয়েছেন প্রচণ্ড শক্তিমান রূপে। মোঃ হামিদ মিয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন প্রাসাদপল্লী, তাঁর কথায় সবাই উঠছে বসছে, এবং তিনি গিয়ে উঠেছেন জনগণমন রাজবংশের বাঁশের কেল্লায়। বাঁশের কেল্লায় দাঁড়িয়ে মোঃ হামিদ মিয়া অগ্নিগিরির মতো বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছেন, আর তাতে কেঁপে উঠছে নগর।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু, জেনারেল কেরামতউদ্দিন, সোলায়মান হাওলাদার খোঁজ নিতে থাকেন, বুঝতে পারেন মোঃ হামিদ মিয়াই মূল শক্তি; তাঁকে বশ করা গেলে থেমে যাবে ওই বাঁশের কেল্লার বিপ্লব।

দ্রুত পান করতে করতে তাঁরা তাঁদের কর্মপদ্ধতি স্থির করছিলেন।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, হামিদ মিয়াটাই নষ্টের মূল, ওই ব্যাটাই খ্যাপাইয়া তোলছে সচিবালয়, কুত্তারবাচ্চারে আমিই ঢুকাইছিলাম।

জেনারেল কেরামতউদ্দিন বলেন, কয়টা ক্যাডার লাগাই দেই, দে উইল সলভ দি প্রব্লেম বিফোর ডন।

সোলায়মান হাওলাদার বলেন, ক্যাডাররা আরেকটা নতুন গোলমাল পাকাইয়া তোলতে পারে, ক্যাডার দিয়া কাম হবে না।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, মিলিটারি অ্যাকশনে এখন হইবো না, এখন দরকার পলিটিক্যাল অ্যাকশন। হামিদ মিয়া আইজকাল একটা বড় ন্যাতা হইছে, জনগণমনআলাগো বড়ো বড়ো ন্যাতার লগে ওঠছে বসছে, তাই তারে পলিটিক্যালি ট্যাকেল করতে হইবো।

জেনারেল কেরামতউদ্দিন গেলাশটি শেষ করে আরেক গেলাশ ভরতে ভরতে জিজ্ঞেস করেন, হাউ উইল ইউ ট্যাকেল দি বাস্টার্ড?

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, অর লগে আইজ রাইতেই যোগাযোগ করতে হইবো, লাখ পাঁচেক ট্যাকা গছাইয়া দিতে পারলে ও চুপ কইর‍্যা যাইবো।

সোলায়মান হাওলাদার জিজ্ঞেস করেন, ব্যাটারে পাওন যাইব কই? অইটা তো জনগণমনআলাগো বড়ো বড়ো ন্যাতাগো পাশই ছাড়ে না।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, হাওলাদার সাব, আপনে ত আর পলিটিক্সে জ্যানারেল ভাইর মতো নিউকামার না, এত বামপন্থী ডাইনপন্থী পলিটিক্স কইরাও আপনে হোল টুথটা বোঝতে পারতেছেন না।

সোলায়মান হাওলাদার গেলাশটা শূন্য করতে করতে বলেন, অধ্যক্ষ ভাইর মতন পলিটিশিয়ান আইজও হইতে পারলাম না, অধ্যক্ষ ভাই হইছেন আমাগো পলিটিক্সের প্রিন্সিপাল, পলিটিক্সের ভাইচচ্যাঞ্চেলার। এখন হোল ট্রথটা বুঝাইয়া বলেন।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, মোঃ হামিদ মিয়া আইজকাল ক্ষমতার স্বাদ পাইছে, কেল্লায় উইঠ্যা সামনে এত মানুষ দেইখ্যা পাগল হইয়া গেছে, প্রত্যেক পলিটিশিয়ানই সামনে মানুষ দেইখ্যা পাগল হইয়া যায়। মদ খাওনের মতন লাগে। বড়ো বড়ো ন্যাতাগো লগে থাইক্যা সেও নিজেরে বড়ো ন্যাতা ভাবতেছে। আর আমার মনে হয় ওই জনগণমনআলারাও তারে ছাড়তেছে না, সে যাতে ভাইগ্যা না যায় সেই কারণে হামিদরে সব সময় পাশে পাশে রাখতেছে। তবে আইজ রাইতেই তার লগে কন্টাক্ট করতে হইবো।

মোঃ হামিদ মিয়ার সাথে কন্টাক্ট করার জন্যে অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু রাতেই জনপাঁচেক দূত নিয়োগ করেন।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু দক্ষ রাজপুরুষ; তিনি দূত হিশেবে কোনো পরিচিত রাজপুরুষকে পাঠান না; সাংবাদিক হিশেবে পাঠান দুজনকে, পাঠান আমলাপল্লীর দুজন নিম্নবর্ণের কর্মচারীকে, এবং আরো দু-একজনকে।

কিন্তু তারা কোথাও মোঃ হামিদ মিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন না। মোঃ হামিদ মিয়া রাতে বাসায় ফেরেন না; কেল্লার মঞ্চে তাঁকে দেখা যায়, কিন্তু তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভব হয় না। কেল্লা থেকে নেমেই মোঃ হামিদ মিয়া জনগণমন রাজবংশের দুই রাজপুরুষের সাথে কোথায় যেনো মিলিয়ে যান।

বুদ্ধিটা কয়েক দিন আগে আসে জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশের নিজামউদ্দিন। আহমদ ও মোহাম্মদ আবদুল হাইয়ের মাথায়। মোঃ হামিদ মিয়া আমলাপল্লীতে যেদিন তোলপাড় সৃষ্টি করে ফেলেন, নিজের হাতে গ্রহণ করেন আমলাপল্লীর শাসনভার, সেদিনটিকে লাল

অক্ষরে লেখা দিন হিশেবে গণ্য করেন নিজামউদ্দিন আহমদ ও মোহাম্মদ আবদুল হাই; তারা দ্রুত গিয়ে দেখা করেন মোঃ হামিদ মিয়ার সাথে, এবং তাকে এনে তোলেন তাঁদের বাঁশের কেল্লায়।

মোঃ হামিদ মিয়া বাঁশের কেল্লার মঞ্চে দাঁড়িয়ে সামনে জনসমুদ্র দেখে প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়তে চান, পরে তিনি শক্ত হন; তার মনে হয় তিনি ওই জনগণের মাথার ওপর তার পা দুটি রেখে দাঁড়িয়ে আছেন।

বক্তৃতা দিতে উঠে আরো বদলে যান মোঃ হামিদ মিয়া। তার মনে হতে থাকে তার কণ্ঠ থেকে একটির পর একটি ঠাঠা গর্জন করতে করতে গিয়ে পড়ছে বড়ো বড়ো আমগাছের ওপর, জামগাছের ওপর, ধানক্ষেতে পাটক্ষেতে; আর চারদিক দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে। তাঁর মনে হতে থাকে তিনি সাপুড়ে, সাপ খেলা দেখাচ্ছেন; তাঁর বাঁশিতে সাপের মতো দুলছে সামনের জনগণ। তাঁর মনে হতে থাকে ওগুলো মানুষ নয়, ওগুলো তাঁর হাতের পুতুল; তিনি যেভাবে আঙুল নাড়ছেন সেভাবেই নাচছে ওই পুতুলগুলো।

এক জন্মে মানুষ, আর ওই ছাগল ভেড়া গরু গাধা, বহুবার জন্ম নেয়; বাঁশের কেল্লায় মোঃ হামিদ মিয়ারও নতুন জন্ম হয়; তিনি আমলাপল্লীর নেতা থেকে জননেতা হয়ে ওঠেন।

নিজামউদ্দিন আহমদ ও মোহাম্মদ আবদুল হাই বিশাল সম্ভাবনা আর বিকট ভয় দেখতে পান মোঃ হামিদ মিয়ার মধ্যে।

বাঁশের কেল্লার সভা শেষ হলে নিজামউদ্দিন আহমদ ও মোহাম্মদ আবদুল হাই পাজেরোতে উঠিয়ে মোঃ হামিদ মিয়াকে নিয়ে আসেন গুলশানে নিজামউদ্দিন আহমদের ভবনে।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, ভাই হামিদ মিয়া, চল্লিশ পাঁচপল্লিশ বচ্ছর ধইরা পলিটিক্স করতেছি, পাকিস্থানিগো বকতিতা দিয়া কাঁপাই দিতাম; কিন্তু ভাই আপনের মতন বকতিতা আইজও দিতে পারি না।

মোঃ হামিদ মিয়ার পাঁজরের হাড়গুলো অনেকখানি ফুলে ওঠে, তাঁর সামনের নেতা দুটিকেও তার মনে হয় তুচ্ছ; সাজানো ড্রয়িংরুমটিকেই তাঁর মনে হয় বাঁশের কেল্লা, তাঁর গলা থেকে গলগল করে বক্তৃতা বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু হামিদ মিয়া বক্তৃতা দেন না, কথা বলেন।

মোঃ হামিদ মিয়া বলেন, বকতিতা দেওন কোনো কামই না, ছার, পান্তাভাত খাওনের মতন, আমি বকতিতা দিয়া রোডে বিল্ডিংয়ে আগুন লাগাই দিতে পারি। আপনেগো বকতিতা হুইন্যা হুইন্যাই বকতিতা শিকছি, ছার।

নিজামউদ্দিন ও আবদুল হাই টের পান লোকটি বেশ নির্বোধ অহমিকাপূর্ণ, শস্তা রাজনীতিবিদ হওয়ার জন্যে সর্বাংশে উপযুক্ত; সে শক্তির উৎসবাদীদের জন্যে যেমন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে তেমনি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে তাদের জন্যেও। তাই তাকে তৃপ্ত রাখতে হবে, এবং রাখতে হবে সন্ত্রস্ত; আর রাখতে হবে পরোক্ষভাবে বন্দী। তাকে তৃপ্ত, ব্রস্ত, বন্দী রাখা বিশেষ কঠিন হবে না; মনে হচ্ছে সহজেই সে ফুলে ওঠে, পাজেরোতে উঠতে গৌরব বোধ করে, আর তাদের সঙ্গলাভে জাতীয় নেতার মহিমা লাভের সুখ পায়।

আবদুল হাই বলেন, হামিদ ভাই, আপনে যে কী কন; আইজ আপনের বকতিতা শুইন্যা ত মনে হইল আপনের কাছেই আমাগো শিখনের অনেক কিছু আছে; এক বকতিতায়ই ত আপনে জাতীয় ন্যাতা হইয়া গ্যাছেন, আমাগো লাগছে চল্লিশ পাঁচচল্লিশ বচ্ছ।

মোঃ হামিদ মিয়া বলেন, আইজ, ছার, গলাটায় একটু ব্যাদনা আছিলো, নাইলে আরও আগুন জ্বালাই দিতে পারতাম, আরও পোরাইতে পারতাম, কাইল সব ঠিক হইয়া যাইবো দেইখ্যেন, ছার।

নিজামউদ্দিন বলেন, আপনের ভবিষ্যৎ খুবই ভাল, হামিদ ভাই, জনন্যাতা ত আপনে হইয়াই গ্যাছেন, আমাগো দিন আইলে আপনে মন্ত্রী নাইলে হাউজ বিল্ডিংয়ের চ্যায়ারম্যান নাইলে অ্যামবাসাডারও হইতে পারেন।

হামিদ মিয়া বেশ ফুলে ওঠেন, সামনের খাবার গোগ্রাসে গিলতে থাকেন, বাঁশের কেল্লায় এই মুহূর্তেই আবার তাঁর লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে।

হামিদ মিয়া বলেন, রাজনীতি ত করি, ছার, জনগণের লিগা, মন্ত্রী আর চ্যায়ারম্যান হওনের লিগা না; তয় মন্ত্রীগো গাড়ি আর ফ্যালাগ দেইখ্যা দেইখ্যা মাঝে মইধ্যে মন্ত্রী হওনেরও মন চায়।

নিজামউদ্দিন ও আবদুল হাই এততক্ষণ পড়ছিলেন লোকটিকে, এবার তাদের পড়া শেষ হয়; শেষ পাতা পর্যন্ত পড়ে লোকটিকে তারা মুখস্থ করে ফেলেছেন; লোকটির কোনো বানান আর বাক্য তাঁদের ভুল হবে না।

আবদুল হাই বলেন, আমরা পাওয়ারে আসলে মন্ত্রী আপনে অবশ্যই হইবেন, হামিদ ভাই, তবে আপনের একটু সাবদানে থাকতে হইবো। আমরা যা খবর পাইছি, তাতে খুব চিন্তার মইধ্যে আছি, সেইজইন্যেই ত আপনেরে সাথে কইরা লইয়া আসলাম, একলা ছাইর‍্যা দিতে পারলাম না।

কথাটি শুনে ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠেন মোঃ হামিদ মিয়া।

মোঃ হামিদ মিয়া কেঁপে কেঁপে জিজ্ঞেস করে, ক্যান সাবদানে থাকতে হইবো, ছার, কী খবর পাইছেন, ছার?

নিজামউদ্দিন বলেন, শক্তির উৎসআলারা লোক লাগাই দিছে, আপনেরে দুনিয়া থিকা সরাই দিতে চায়।

ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন মোঃ হামিদ মিয়া।

আবদুল হাই বলেন, হামিদ ভাই, আমাগো স্পাইরা সারাদ্যাশ ভইর‍্যা কাম করতেছে, দ্যাশের কোন জায়গায় কোন কন্সপিরেসি হইতেছে কোন চক্রান্ত হইতেছে সব খবর আমরা পাইতেছি; আমাগো মহাজননেত্রীরে তারা যেমুন সরাই দিতে চায়, আপনেরেও সরাই দিতে চায়। আপনে অগো টার্গেট।

হামিদ মিয়া কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, আমি এখন কী করুম, ছার?

নিজামউদ্দিন বলেন, ডরাইবেন না, হামিদ মিয়া, আপনে আমার বাড়িতেই থাকবেন খাইবেন, আমাগো লগেই যাওয়া আসা করবেন, আমাগো বডিগার্ড আছে, বডিগার্ড ছাড়া আমরা বাইর হই না, আপনেও হইবেন না।

মোঃ হামিদ মিয়া বেশ নিরাপদ বোধ করেন; চারদিকে বডিগার্ড দেখার জন্যে তাকান, দেখেন কয়েকটি শক্ত পেশি দূরে বসে আছে, দেখে তিনি শান্তি পান।

আবদুল হাই বলেন, আইজ রাইতে আপনের বাসায় লোক পাঠাইয়া খবর নিমু অগো কোনো লোক আপনের বাসায় গ্যাছে কি না? গ্যালেই ব্যাপারটা ভাল কইর‍্যা বোঝতে পারুম, আরো সাবধান হমু।

হামিদ মিয়া বলেন, দ্যাহেন, ছার, আমি আপনেগো লগেই থাকুম, আমারে আপনেগো লগেই রাইখেন। আমার খুব ডর লাগতেছে।

নিজামউদ্দিন বলেন, তয় বকতিতা দেওনের সময় ডরাইবেন না, ভাই, কোনো ব্যাডা য্যান বোঝতে না পারে আপনে ডরাইছেন; আপনে অগোই ডর লাগাই দিবেন। ডরাইলে রাজনীতি করন যায় না, রাজনীতি করতে হয় ডর দ্যাখাইয়া। ডরাইলেই ডর।

হামিদ মিয়া বলেন, কাউলকা আমি অগো কইলজার ভিতরে ডর লাগাই দিমু। চাইরপাশ পোরাইয়া দিমু; অরা আমারে সরাই দিতে চায়, মানুষ চিনে নাই।

মোঃ হামিদ মিয়া উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, গলায় তার আগুন জ্বলতে থাকে, বস্ত্র গমগম করে উঠতে চায়, তিনি বাঁশের কেল্লার দিকে এখনই পা বাড়াতে চান।

৪. রাতেই খবর নিয়ে জানা যায়

রাতেই খবর নিয়ে জানা যায় কয়েকটি লোক মোঃ হামিদ মিয়ার বাসায় বেশ কয়েকবার তার খোঁজ করেছে; তাদের চোখমুখ দেখে ও কথা শুনে ভালো লাগে নি। হামিদ মিয়ার স্ত্রী ছমিরন বেগমের, তাদের ফিসফিস কথাও তার কানে এসেছে; এবং তিনি খুব উদ্বেগে আছেন। হামিদ মিয়া কোথায় আছেন, তা দেখার জন্যে ছেলেকে নিয়ে তিনি নিজেই চলে এসেছেন স্পাইদের সাথে। তিনি এখন একজন নেতার স্ত্রী, তার উদ্বেগ আর রাজনীতিবোধও নেতার স্ত্রীর মতোই তাঁর কিশোর ছেলেটি ও তিনি এই প্রথম পাজেরোতে উঠেছেন, তাঁদের বাসা পর্যন্ত পাজেরো যেতে পারে নি বলে কষ্ট পেয়েছেন ছমিরন বেগম ও তার ছেলেটি–লোকরা দেকতে পাইল না তারা কোন গাড়িতে চরছে; কিন্তু পাজেরোতে বসে রাস্তা দেখতে তাদের ভালো লাগে, পথের মানুষগুলোকে ময়লা পোকামাকড় মনে হয়, এবং নিজামউদ্দিন আহমদের বাড়িতে ঢোকার সময় তাদের মনে একরকম অলৌকিক আবেগ জন্মে, যার ভার বহন করা তাদের পক্ষে বেশ কঠিন হয়, তাঁদের বক্ষে বেদনা অপার হয়ে ওঠে।

নিজামউদ্দিন আহমদ ও মোহাম্মদ আবদুল হাই খুব সম্মানের সাথে মোঃ হামিদ মিয়ার স্ত্রী ছমিরন বেগম ও তাদের পুত্রটিকে ড্রয়িংরুমে এনে বসান, বডিগার্ডরা তাঁদের ঘিরে থাকে, বডিগার্ডদের দেখতে ভালো লাগে ছমিরন বেগমের ভেতর থেকে তাদের। জন্যে প্রচুর খাবার আসে। আবার অলৌকিক আনন্দের আর কোন স্বর্গ থেকে ভেসে এসে যেনো তাদের শরীরে ভর করে।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, ভাবী সাহেব, ভাল মন্দ খবরাদি কন; আপনেরা ক্যামুন আছেন? আপনেগো লিগা আমরা চিন্তায় আছি।

ছমিরন বেগম বেশ সপ্রতিভ রাজনীতিবিদের স্ত্রী, আয়তনে মোঃ হামিদ মিয়ার দ্বিগুণ, তিনিই আমলাপ্লীর নেত্রী হলে ভালো মানাতো।

ছমিরন বেগম বলেন, উনি ন্যাতা হওনের পর থিকা ত দিনরাইত চিন্তার মইদ্যেই আছি, ভাইজান, অহন আবার নতুন চিন্তা বাড়ছে।

আবদুল হাই জিজ্ঞেস করেন, বুঝাইয়া কন, ভাবীসাব, নতুন চিন্তার কী হইল?

ছমিরন বেগম বলেন, লোকজন ওনারে মাজেমইদ্যেই বিচরাইতে আইতাছে, তাগো চোখমোখ দেইখ্যা ভাল ঠ্যাকতাছে না, হেরা আবার ফিসফিস কইর‍্যাও কতা কয়, ক্যামুন কইর‍্যা চায়।

স্ত্রীর বর্ণনা শুনে মোঃ হামিদ মিয়া বিচলিত বোধ করেন।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, ভাবীসাব, সেইজইন্যেই ত হামিদ মিয়াভাইরে আমরা লইয়া আসলাম, তারে অরা সরাই দিতে চায়।

শুনে চিৎকার করে ওঠেন ছমিরন বেগম।

আবদুল হাই বলেন, ভাবীসাব, চিন্তা করবেন না, পলিটিক্সে অনেক রিক্স আবার অনেক মজা, হামিদ ভাই এখন থেকে আমাগো লগেই থাকবো, বডিগার্ড ছাড়া বাইর হইবো না, হামিদ ভাই কই আছে ভুলেও কারে কইবেন না।

ছমিরন বেগম বলেন, না, ভাইজান, সেই কথা কি কইতে পারি, তয় একটু দেইখ্যা শুইন্যা রাইখেন।

নিজামউদ্দিন আহমদ দশ হাজার টাকার একটি বান্ডিল তুলে দেন ছমিরন বেগমের হাতে, এবং বলেন, ভাবীসাব, এইটা রাখেন, কখন কী লাগবো বলন ত যায় না, দুই এক দিন আরেকটা বান্ডিল পাঠামু।

আবদুল হাই বলেন, ভাবীসাব, হামিদ ভাই ন্যাশনাল লিডার হইয়া গ্যাছেন, তার গলার আওয়াজে তোপখানায় আগুন ধইরা যায়, আমরা পাওয়ারে আসলে হামিদ ভাই মন্ত্রী নাইলে অ্যামবাসাডার হইবো।

ছমিরন বেগম জিজ্ঞেস করেন, এই দুইবার মইদ্যে কোন বড়, ভাইজান?

মোঃ হামিদ মিয়া বলেন, দুইডাই বড়, দাকতে পাইবা।

নিজামউদ্দিন বলেন, তয় অ্যামব্যাসাডার হইলে ভাবীরে ইংরাজি কইতে হইব।

ছমিরন বেগম বলেন, না, ভাইজান, এই বয়সে আর ইংরাজি কইতে পারুম না, শরম লাগবো, তয় হিন্দি কইতে পারি দুই একটা।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টুর পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি বলেই সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে; কিন্তু তিনি রুখে দাঁড়িয়ে টিকিয়ে দিয়েছেন রাজবংশটিকে, না রুখে না দাঁড়ালে নিজেকে টেকানো যায় না, ভেঙে পড়তে দেন নি মহাদেশনেত্রীকে, তাই তিনি এখনো নিজেকে ভাবছেন দেশের প্রধান মন্ত্রী–ভেবে সুখে আছেন, এটা রাজবংশের জন্যে একটি প্লাস পয়েন্ট; তিনি ভেঙে পড়লেই সব কিছু মাইনাস হয়ে যেতো। তার একটু অসুবিধা হচ্ছে যে তিনি জেগেই সিংহাসনে বসতে পারছেন না, বেরোলেই একশোটা যানবাহন আর সেপাই তাঁকে ঘিরে থাকছে না, নামলেই দুশোটি মাথা তার পদধূলি নিচ্ছে না। কয়েক মাস এটা তাকে সহ্য করতে হবে, উপায় নেই। বংশের রাজপুরুষদের নিয়ে অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু সব কিছু গুছিয়ে তুলছেন; যেমন অন্যান্য বংশের রাজপুরুষরাও দিনরাত গোছাচ্ছেন; গোছাতে গোছাতে তারা সময় পাচ্ছেন না; পত্নীদের সাথে দেখা করার দরকার তো অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে, এমনকি উপপত্নীদের সাথেও দেখা করার মতো সময় করে উঠতে পারছেন না (এটা শুধু ভাগ্যবানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। নিষ্পাপ দেবদূতরা দেশ শাসন করছেন, সব কিছু অবাধ নিরপেক্ষ জাতিসংঘভাবে হবে; ওই অফসেটে ছাপা ব্যাপারগুলো দেখবেন সোনালি ডানার দেবদূতরা, নির্বাচন কমিশনের পাকপবিত্র অপাপবিদ্ধ ফেরেশতারা, আন্তর্জাতিক সত্যদর্শীরা; কিন্তু ওই সবে রাজনীতিবিদদের চলে না, তাদের দেখতে হবে তাদের ব্যাপার।

নিম্নলিখিত জিনিশগুলিন তাগো দ্যাখতে হইবো, নাইলে চলবে না :

(১) ক্যাডারভাইরা ঠিক আছে কি না, তাগো যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কি না, তাগো আরো যন্ত্রপাতি লাগবে কি না, আরো নতুন ক্যাডারভাই লাগবে কি না; ক্যাডারভাইরা অন্য রাজবংশে চইল্যা যাইতে চাইছে কি না–এইটা খারাপ লক্ষণ, এমুন হইলে বোঝতে হইবো ওই রাজবংশই ক্ষ্যামতায় আসবো; খালি ঢাকা শহরের ক্যাডারভাইদের ঠিক রাখলে চলবো না, দ্যাশের প্রত্যেইক গ্রাম, প্রত্যেইক ইউনিয়ন, প্রত্যেইক থানার ক্যাডারভাইদের ঠিক রাকতে হইবো; ক্যাডারভাইরা হইল দলের মূলশক্তি;

(২) ইনভারসিটির হলগুলি দখলে আছে কি না; ইনভারসিটি দখলে থাকলে আল্লার রহমতে দ্যাশ দখল করনে অসুবিধা হইবো না; ইনভারসিটিই বাংলাদ্যাশ, এইটা দখলে রাখতে হইবো; এইজহৈন্যে দুই চাইরটা লাশ পড়লেও ক্ষ্যাতি নাই;

(৩) নিজেগো রাজবংশ হইতে সুবিধাবাদী রাজপুরুষরা অন্য রাজবংশে চলে যাইতেছে কি না, চলে যাওনের পথ খোঁজতেছে কি না এইটা দাকতে হইবো;

(৪) অন্য রাজবংশ হইতে ভাল ক্যান্ডিডেট ভাগাইয়া আনন যায় কি না, কারে কারে ভাগাইয়া আনলে লাব হইবো; কয়টা জেনারেল ব্রিগেডিয়ার মেজর কর্নেল দলে যোগ দিতে চাইছে, কয়টা সেক্রেটারি দলে আসতে চাইছে, কয়টা ব্যাংক ডিফলটার যোগ দিতে চাইছে, অন্য দলের কয়টা প্রাক্তন মন্ত্রী এমপি মেয়র দলে যোগ দিতে চাইছে, কয়টা নামকরা রাজাকার দলে যোগ দিতে চাইছে, কয়টা রজাকার ভাগাইয়া আনন যাইবো, রাজাকারগো অবস্থা আইজকাইল ভাল;

(৫) কন্ট্রিবিউটাররা ঠিক মতো চান্দা দিতেছে কি না; কে কে চান্দা দেওন বন্ধ করছে, আর কে কে নতুন চান্দা দিতেছে; নতুন কন্ট্রিবিউটার আসলে বোঝতে হইবো দল এইবার জিতবো; চান্দা বেশি কইর‍্যা তোলতে হইবো, বেশি চান্দা পাইলে বোঝতে হইবো দল জিতবো;

(৬) দ্যাকতে হইবো ব্যাংক ডিফলটারগুলিন ঠিক আছে কি না; তারা মোটা টাকা দিতেছে কি না, আর কয় কোটি কইর‍্যা তাগো থিকা তোলন যাইব; তারা কোন বংশের দিকে ঝোঁকছে সেইটা দ্যাকতে হইবো, তারা যেই দিকে ঝোঁকবো সেই দিকই ক্ষ্যামতায় আসবো; দাকতে হইব তাগো কারখানায় ক্যাডারভাই পাঠাইতে হইব কি না;

(৭) ক্যান্ডিডেটরা কে কয় কোটি টাকা দিতে পারবো সেইটা দ্যাকতে হইবো, স্মাগলার পাইলে বোঝতে হইব ভাল মালপানি হাতে আছে, পাঁচদশ কোটি খসাইতে কষ্ট হইব না, তাগো ক্যান্ডিডেট করনই ভাল হইব; আর দাকতে হইব তারা নির্বাচনরে অবাধ নিরপেক্ষ রাইখ্যা ভোটার ভাগাইতে পারবো কি না;

(৮) ডিছি, ওছি, এছপি, টিএনওগুলিরে ঠিক রাকতে হইবে; অরা ঠিক থাকলে অবাধে ভোটের বাক্স বোঝাই হইবো, নিরপেক্ষতা রক্ষা পাইবো;

(৯) আরও বিবিধ রকম জিনিশ দ্যাকতে হইবো, সময় বুইঝ্যা কাম করতে হইবো।

আমরা জনগণরা যা শুনতে পাই, খবরের কাগজে মুখের যে-চেহারা দেখতে পাই–আগে তাদের চেহারা কী সুন্দর লাগতো, মনে হতো ফুলবনে রাজকুমাররা গান গাইতেছেন–

তাতে বুঝতে পারি, আমাদের বোঝায় ভুলও হতে পারে, যে অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু, জেনারেল কেরামতউদ্দিন, সোলায়মান হাওলাদার, মোহাম্মদ কুদ্দুস চৌধুরী, লিয়াকত আলি মিয়া, ব্যারিস্টার কুদরতে খুদা, ছয়ফুর চাকলাদার, ডঃ কদম রসুল এবং শক্তির উৎসবাদী রাজবংশের আর আর অনেক রাজপুরুষের মাংসে আর রক্তে একটু একটু জ্বালা ধরে আছে, ওই জ্বালাকে তারা পাত্তা দিচ্ছেন না, কিন্তু জ্বালায় একটু একটু মাথা ধরছে; জ্বালাটা হচ্ছে ওই জনগণমন রাজবংশের শয়তানগুলো, যেগুলো তিনশো বছরেও ক্ষমতায় যেতে পারবে না, তাদের বিচার চায়; তারা না কি কোটি কোটি টাকা চুরি করেছেন তার জন্যে জেলে পাঠাতে চায়। ওইগুলো বেশি বেড়ে গেছে, দেখে নিতে হবে ওইগুলোকে; ওরা শুধু রাজপুরুষদেরই বিচার চাচ্ছে না, এমনকি মহাদেশনেত্রীরও বিচার চাচ্ছে, কী বেয়াদবি, ওইগুলোকে দেখে নিতে হবে, বড়ো বেশি বেড়ে গেছে, মহাদেশনেত্রী সকল আইনের ওপরে, সকল বিধানের ওপরে, সকল সংবিধানের ওপরে, তার আবার বিচার কী। শুধু ওইগুলো নয়, জ্বালাটা আরো বেড়ে যায় যখন দেখেন খোজারাজবংশ আর রাজাকার রাজবংশও ওইগুলির সঙ্গে গলা মিলিয়েছে; সব শয়তান সুযোগ বুঝে ফেরেশতা হয়ে উঠেছে, এক রা ধরেছে। তবে এসব চুলরে পাত্তা দিলে রাজনীতিবিদদের চলে না, এই সব চুলে কবে পেটের পোলা আটকে রাখতে পেরেছে; এই সব পাত্তা না দেয়াও রাজনীতি, আবার দুর্নীতি নিয়ে দিনরাত গলাবাজি করাও রাজনীতি। রাজনীতি করতে গেলে একটা ইশু দরকার। জ্বলন্ত ইশু লইয়া হট্টগোল ভাঙ্গনচোরন জ্বালানপোড়ান করলে জনগণ পাগল হইয়া ভোট দেয়, মনে করে। ইশুআলারা দুই হাতে টাইন্যা দুনিয়াতে ভেস্ত নামাইতে যাইতেছে। তারাও কি কয়েক বছর আগে ই করেন নি খোজারাজবংশের দুর্নীতিকে, সম্রাট বাবরের লাম্পট্যকে গলা ফুলিয়ে দুর্নীতি, দুর্নীতি, লাম্পট্য, লাম্পট্য গর্জনে দেশরে তোলপাড় করেন নি, দ্যাশরে মাতাইয়া তোলেন নাই? খোজারাজবংশের বাবর মুঘলকে কি সাভারের কাদায় ডোবা মইষের মতো ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া ঢোকান নাই খোয়াড়ে? দুর্নীতিবাজদের লম্বা

লম্বা তালিকা কি তারা ছেপে দেন নি; খবরের কাগজে তারা বড়ো বড়ো করে কি ব্যাংক ডিফলটারদের নাম ঝুলাইয়া দ্যান নাই? কারো নামে ৫০০ কোটি, কারো নামে ৬৭৫ কোটি, কারো নামে ৯০০ কোটি, কারো নামে ২৫ কোটি? ঘোষণা কি দেন নি যে ওই ডিফলটারদের খোয়াড়ে পাঠানো হবে, টাকাগুলো উঠিয়ে দেশটিকে আমেরিকা করে তোলা হবে? তারপর তারা কয়টারে জ্যালে পাঠাইছেন? বরং ডিফলটাররা যাতে খোয়াড়ে না যায়, তাদের চর্বি যাতে আরো বাড়ে, চামড়া মসৃণ থাকে, ব্যাংকে ঢুইক্যা আরো ধান খাইতে পারে, ক্ষেতে ক্ষেতে গাভী পাইলেই পাল দিতে পারে, সেটা কি তাঁদের দেখতে হয় নি? এর জন্যে তারা বেশ পেয়েছেন কোটি কোটি টাকা ঢুকেছে তাগো স্ত্রীগো বিদেশি অ্যাকাউন্টে, আল্লা যখন চান তখন তাঁর বান্দাগো এভাবেই দেন এইজইন্যেই পরম করুণাময় আল্লাতালায় ইমান দরকার; আল্লা তাঁদের দিয়েছেন, না নিয়ে তারা কী করতে পারেন?

ডঃ কদম রসুল ভাইর জন্যে আমরা জনগণরা কাঁদবো না হাসবো, বুঝতে পারি না। অতো বড়ো একটা অইধ্যাপক আছিলেন, তারপর অ্যাতনা বড়ো একটা পলিটিশিয়ান হইলেন, দ্যাশরে ধইন্য করলেন। ওই ডঃ কদম রসুল সাহেবকে হারামজাদারা শ্লোগান দিয়ে তিন দিনের জন্যে হাজতে ঢুকিয়ে দিলো, কিন্তু আটকে রাখতে পারে নি; পারবে কেননা, সব ঠিকঠাক করে রাখেন নি? প্রাইমারি ইস্কুল হইতে চোখবান্ধা মাইয়ালোকটা পর্যন্ত? ওই কানা মাইয়ালোকটা কাগো? সব ঠিকঠাক আছে, তাগো আটকাইয়া রাখনের কোনো উপায় নাই। পাঁচ মিনিটে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে বাট্রাকসমিতির প্রেডিডেন্ট, ইটের ভাটার মালিক, টাউটগুলিরে বসাই দিছেন; এখন সবাই আগাম নিয়ে রাখছেন, তাগো আটকায় কে? আর সেই জাগায় তো বইসা আছেন তাগোই লোক, আলহজ আলফাজ মাঝিরে তো সেইখানেই বসাই রাখা হইছে, এত দিন পর তরে রাজা কইর‍্যা দেয়া হয়েছে,

খামখা রাখন হয় নাই, তিনি কলকাঠি লাড়বেন। দরকার হইলে এমন কলকাঠি লাড়াইবেন যে সব কিছু পইড়া যাইবো, নাদিরশারা দলে দলে দেখা দিবো, মঙ্গোলিয়ার ক্যাডাররা ছুটে আসবো।

ডঃ কদম রসুল মুক্তি পাওয়ার পর গাঁদাফুলে ঢেকে তাকে ছোড়োখালো শেক মজিবের মতো বের করে নিয়ে এলাম আমরা (এই দ্যাশে জাল থেকে যে-ই বাইর হয় সে-ই ছোড়োখাড়ো শেক মজিবের মতো বাইর হয়, সে-ই সবার মডেল), অর্থাৎ আমরা যারা শক্তির উৎসবাদী রাজবংশের; শহরের দশটা না বিশটা রাস্তা বন্ধ করে। দিলাম, এর পর শহরের আর থাকে কী, মহাদেশনেত্রী আর তাঁর অমর সেনাপতি আর কদম রসুল আর অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পল্টর নামে শ্লোগান দিয়ে আমরা শহর ফাটিয়ে। জানিয়ে দিলাম যে তাদের আটকে রাখার মতো কোনো খোয়াড় নেই; আর এমন বেয়াদবি করলে সব কিছু উল্টেপাল্টে দেয়া হবে। তাঁহাদের গায়ে একটা ফুলের টোকাও দেয়া চলবে না।

ডঃ কদম রসুল তাঁর মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয়েছিলেন কিংবদন্তিতে (তবে তিনি একা কিংবদন্তি নন, বাঙলাদেশি গিনিজ রেকর্ডসে আরো বহু সোনার নাম সোনার কালিতে ছাপা আছে)।

তিনি ছিলেন মাঝারি আর নিম্ন আমলাগুলোর নিরন্তর আলাপের আনন্দ।

স্যারেরা খান, খাওনের জন্যইতো স্যারেরা আসেন, কিন্তু এই বাস্টার্ডের পোর খাওন দেইখ্যা তাজ্জব হইয়া যাই, বোয়াল মাছের মতো খালি গিলে।

বাস্টার্ডটা বিশ বচ্ছর কলেজের মাস্টার আছিলো, কিন্তু খাওনে গিলনে চোরা পলিটিশিয়ানগুলিরে ছারাইয়া গেছে। মাস্টারগুলির খিদা বেশি, আগে তো খাওনের সুযোগ পায় নাই, পরেও পাইবো না।

বউর নামে তিনশো কোটি, মাইয়ার নামে একশো কোটি, পোলাগো নামে দুইশো কোটি; দুইটা মিস্ট্রেসের নামে দুই কোটি। গাজিপুরে দুইশো একর, সাভারে একশো একর। আর কয় দিন সময় পাইলে সবগুলি রেলগাড়ি, ইস্টিশন আর জংশনই খাইয়া ফেলবো।

ডঃ কদম রসুল সব খাওয়ার আগেই জনগণ তাদের ফেলে দেয়; অনেকের মতো কদম রসুল কয়েক দিন পালিয়ে থাকেন।

ডঃ কদম রসুলের মুক্তি উপলক্ষে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাস্তাভাঙা সংবর্ধনার পর জেনারেল। কেরামতউদ্দিন বিশেষ পার্টির আয়োজন করেছেন গাজিপুর রেস্টহাউজে। এখান থেকে তিনি তাঁর কলকারখানা ব্যবসাবাণিজ্য গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজগুলো দেখেন, এবং আরো অনেক কিছু দেখেন নিবিড় অন্তরঙ্গ উন্মুক্তভাবে; এবং বিশেষ রাজনীতি আলোচনা হয় এখানেই। পার্টিতে এসেছেন প্রধান রাজপুরুষেরা।

একটু পানাহার একটু নৃত্যগীত আর প্রচুর রাজনীতি পার্টির উদ্দেশ্য। বিবেচনা আলোচনার প্রধান বিষয় টাকাপয়সাগুলো–ওই যে পাঁচ বছরে সামান্য কয়টা পয়সা তারা করেছেন, যতোটা ইচ্ছে ছিলো ততোটা পারেন নি, ওই ময়লা সিকি আধলি আর ছেঁড়া এক টাকার নোটের ওপর শকুনের মতো চোখ পড়ে আছে শয়তানগো, তাগো মাঝেমইধ্যে খোয়াড়ে ঢোকানোর চেষ্টা চলছে, এই ব্যাপারটি ক্যামনে ট্যাকেল করা যায়, কীভাবে ওগুলোকে

দেখিয়ে আর শিখিয়ে দেয়া যায়, তার ফর্মুলা বের করার জন্যেই এই পার্টি। ফর্মুলাটা বের করতে না পারলে দেশে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়বে, আসলে বিপন্ন হইয়া পড়ছে, দেশ বিক্রি হইয়া যাইবো হিন্দুগো কাছে; অবশ্য পাকিস্থানি মুসলমান ভাইগো কাছে হইলে অন্য কথা, তবে সেই বেচাকেনাটা তারা করবেন।

বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে লতা আর পুষ্পঘেরা একটি কুঞ্জের নাম লাইলি। তাঁরা শীততাপনিয়ন্ত্রণ যেমন পছন্দ করেন, লতাপুষ্পও পছন্দ করেন; এই কালে নেচারকে যারা ভালোবাসে না, তারা মানুষ না, তারা পৃথিবীর ওজনলেয়ার ফাটাইয়া দিতে চায়। জেনারেল কেরামতই লাইলি নামটি রেখেছেন; এবং গুল্মের অক্ষরে কুঞ্জের প্রবেশ পথেই নামটিকে পুষ্পিত গুস্মিত করে রেখেছেন তিনি। এটি জেনারেল কেরামতের কুঞ্জপানশালা।

সবাই অল্প অল্প পানাচ্ছেন, আর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছেন।

ডঃ কদম রসুলের শরীরটা র‍্যাদনা করছে, একটু জ্বরজ্বরও লাগছে; সংবর্ধনার ফলে জ্বরটা একটু কমেছে, গাঁদা ফুলের রসে ব্যথাটাও একটু কমেছে, স্কচে আরেকটু কমছে; তবু তিনি জ্বরটা আর ব্যাদনাটা ভুলতে পারছেন না। তাঁর ভয় লাগছে রাত বাড়লেই হয়তো কেউ তাকে গুতোতে পিষতে ডলতে আসবে।

ডঃ কদম রসুল প্রথম মুখ খোলেন, বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় ন্যাতারা, রেসপেক্টেবল ভাইরা, আপনেগো কাছে আমি এভার গ্রেটফুল অল্প সময়ের মইধ্যে আমারে বাইর কইর‍্যা আনছেন বইল্যা, কবর যাওন পর্যন্ত গ্রেটফুল থাকবো; দেরি হইলে আমার অসুবিধা হইতো, মইরা যাইতাম।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, ডাক্তার রসুল ভাই, সব আমাগো খুইল্যা বলেন; আপনের শরিলটা খারাপ দেখাইতেছে, অমন দ্যাহটা তিন দিনেই কাহিল হইয়া পড়ছে।

ডঃ কদম রসুল বলেন, বলতে শরম লাগতেছে, কিন্তু না বইল্যাও পারতেছি না, আপনেগো কাছে বলনই লাগবে।

জেনারেল কেরামতউদ্দিন চিৎকার করে ওঠেন, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ডক্টর কদম রসুল, দি বাস্টার্ডস মাস্ট হ্যাভ বিটেন ইউ ইন কাস্টডি, দি বাস্টার্ডস্ আর দি অ্যাজেন্টস অফ দি নগনআলাজ, উই মাস্ট টিচ দেম এ গুড লেসন হোয়েন উই গো ব্যাক টু পাওয়ার। উই মাস্ট গো টু পাওয়ার।

ডঃ কদম রসুল বলেন, রাইত হইলেই দুই তিনটা পুলিশ আইসা ল্যাংটা করাইয়া আমারে ছ্যাচতো, ডলতো, পাথর দিয়া গুতাইতো; রক্ত বাইর হইত না, হাড়ি ভাঙতো কিন্তু ব্যাদনায় ফাঁইট্যা যাইতাম। এতো দিন মন্ত্রী আছিলাম, তার জইন্যো একটু মাইন্যগইন্যও করে নাই। তার বদলে গালি দিয়া বলতো, আয় শালা, মন্ত্রী হওন দ্যাখাই।

ব্যারিস্টার কুদরতে খুদা বলেন, বাট উই আর ভিআইপিজ।

মোহাম্মদ কুদ্দুস চৌধুরী বলেন, দি পুলিস ফোর্স ইজ এ প্যাক অব ব্যান্ডিটস, হার্টলেস কিলার্স অ্যান্ড রেপিস্ট, কয় দিন আগেও আমাদের সালামের পর সালাম দিতো, স্যালুট

করতো, কয় দিন পর আবারও দিবে, কিন্তু এখন পাইলেই দে উইল বিট আস লাইক এনিথিং, দে আর সেডিস্ট।

পানির মতো পান করে চলছেন তাঁরা।

ডঃ কদম রসুল বলেন, আমারে গুতাইয়া, ডইল্যা, আর ছেইচ্যাই ছাড়ে নাই, অছিটা আমার থিকা পঞ্চাশ লাখ নগদ আদায় করছে, আইজ বাইর হইতে না পারলে আরও পঞ্চাশ লাখ দিতে হইত। আমাগো আর অ্যারেস্ট হওন চলবো না, আমাগো ধরনের উদ্দেইশ্য হইছে গুতাইয়া ডইল্যা ট্যাকা বাইর কইর‍্যা নেওন। এই কয় বছরে কয়টাই ট্যাকা করছি, তা লইয়া গ্যালে পলিটিক্স করুম কি দিয়া।

ব্যারিস্টার কুদরতে খুদা বলেন, উই হ্যাভ অলরেডি আন্ডারস্ট্রড ইট অ্যান্ড টেকেন নেসেসারি মিজার, সেইজইন্য আইনগত ব্যবস্থা নিয়াছি, দি কন্সটিটিউশন ইজ ইন আওয়ার ফেভার, সকলের আগাম নিয়া রেখেছি, নোবডি ক্যান টাচ আস অ্যানি মোর।

ছয়ফুর চাকলাদার বলেন, এর পর ধরতে আসলে হাত ছিইর‍্যা ফালামু, আমাগো চিনে নাই। শুয়ারবাচ্চাগো পাছা ফাডাই দিমু, আর আল্লায় মুখ তুইল্যা চাইলে মনে যা আছে তা কইর‍্যা ছারুম।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, আমাগো দুর্নীতি লইয়া বাড়াবাড়ি করন আর সইজ্য করুম না; কী আর দুর্নীতি করছি আমরা, কয় ট্যাকা বানাইছি? পলিটিক্স করবো আর ট্যাকাপয়সা বানাইবো না এইটা কোন দ্যাশে হয়? আমেরিকায় পলিটিশিয়ান ভাইরা ট্যাকাপয়সা বানায়

না? ক্লিনটন ট্যাকা বানায় নাই? নাইলে তাগো চলে ক্যামনে? ইংলন্ডের ভাইরা বানায় না? বিনা পয়সায় ধনীগো ফাইভ ইস্টার হোটেলে থাকে না মাইয়ালোক লইয়া? জাপানের ভাইরা বানায় না? কোরিয়ার ভাইরা বানায় না? পাকিস্থানের ভাইরা বানায় না? ইন্ডিয়ার ভাইরা বানায় না? ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইটালি, জার্মানির ভাইরা বানায় না? বানাইলে রাজনীতি করুম কি কেলা চুইষ্যা?

সোলায়মান হাওলাদার বলেন, সব মাছেই গু খায় নাম হয় পাংগাশ মাছের; দ্যাশের কোন শালা ট্যাকা বানায় না? দোষ খালি আমাদের, পলিটিশিয়ানগো, য্যান খালি আমরাই শয়তান, অন্যেরা ফ্যারেশতা।

এমন সময় চারটি গায়িকা ও নর্তকী দেখা দেয়। তারা পাতাঘেরা মঞ্চে ওঠে; গায়িকাটি গান গাইতে শুরু করে, নর্তকী তিনটি নাচতে শুরু করে। তাদের কণ্ঠ ও শরীর থেকে রক্তিম সুর ঝরে পড়তে থাকে।

জেনারেল কেরামত বলেন, টেন্ডার ইজ দি নাইট, অ্যান্ড হ্যাঁপলি দি কুইন মুন ইজ অন হার থ্রোন, ইউ গো অন ড্যান্সিং অ্যান্ড সিংগিং বিউটিফুল রোউজেজ।

গায়িকা ও নর্তকীরা মধুর হাসে।

লিয়াকত আলি মিয়া বলেন, দ্যাশটা গরিব, আমাগো চলতে হয় লোনের ট্যাকায়, তাও কয় ট্যাকাই আমরা লোন পাই, চাইর পাঁচ বচ্ছরে আর কয় ট্যাকাই আমরা বানাইতে পারি? রাজীব গান্ধিটারে দ্যাখেন, চ্যাহারা আর হাসিখান দ্যাখলে মনে হয় গীতাপাঠ ছাড়া আর

কিছু জানে না; কিন্তু এক বেফোর্স কম্পানির থিকাই খাইছে দুই শো কোটি ডলার, যেই ফাঁইটার বিমান কোনো কামে লাগবো না তাঅই কিনছে পাশশোটা।

সোলায়মান হাওলাদার বলেন, আমাগো চৈদ্দপুরুষেও ওই ট্যাকা স্বপ্নেও দ্যাকতে পারে না; ইন্ডিয়ানরা খায় ইন্ডিয়ানগো মতন।

ছয়ফুর চাকলাদার বলেন, আমাগো পাকিস্থানি ভাইগো আর বইনগোই ধরেন না ক্যান; বেনজির আফা অক্সফোর্ডে না কোন জায়গায় পইর‍্যা আইলেন, বিশ পঁচিশটা বয়ফ্রেন্ডের লগে ঘোমাইলেন, কয়বার প্যাট খালাশ করলেন, কত আন্দোলন করলেন, খাঁটি মুসলমান হইলেন, প্রধান মন্ত্রী হইলেন, তারপর দুই তিনটা বউআলা জারদারিরে বিয়া কইর‍্যা হাজার কোটি বানাইলেন। আমাগো মহাদেশনেত্রী আর কয় ট্যাকা বানাইছেন?

জেনারেল কেরামতউদ্দিন বলেন, ব্যুরোক্র্যাটগুলোর কথাই ধরেন না ভাই, দে আর করাপ্ট টু দি ব্যাক বোউন, অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার হয়ে ঢোকার পর থেকে খাইতে থাকে, হোয়েরেভার দে গো দে ডিস্কভার গোল্ড মাইস্, দি ডিসিজ, জয়েন্ট অ্যান্ড এডিশনাল সেক্রেটারিজ, চেয়ারমেন অফ করপোরেশন্স, রাষ্ট্রদূতগুলি, অ্যান্ড সেক্রেটারিজ টাকার পাহাড় বানায়, কিন্তু দোষ হয় পলিটিশিয়ানদের। পলিটিশিয়ানরা কয় বছরই আর চান্স পায়?

কুদ্দুস চৌধুরী, তিন চারটা মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব, গেলাশ ভরে নিতে নিতে বলেন, কতোটা বলবেন গেলাশে চুমুক দিতে দিতে তা ঠিক করেন, এবং বলেন, জেনারেল কেরামত ভাই যা বলেছেন দ্যাট ইজ ট্রু, বাট হি হ্যাঁজ মিস্ড় সাম ভেরি ইমপরটেন্ট পয়েন্ট;

আওয়ার ব্রাদার্স ইন দি আর্মড় ফোর্সেস অলসো মেক মাচ মানি, দে মেইক টু মাচ আই শ্যড সে, আমরা তা অডিটও করি না; ব্যুরোক্র্যাটরা কেনো টাকা বানায় তার কজগুলি দেখতে হবে। নাউ এ ডেইজ অল আওয়ার কোটিপতিজ আর স্মাগলারস, অ্যান্ড দি সোকন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস্ আর থিভস্; অ্যান্ড দে আর অল ইলিটারেট আনএডুকেটেড পিম্প। দে ইভেন ক্যানট স্পেল দি ওয়ার্ড 'মিলিয়ন', ইয়েট দে আর মিলিয়নিয়ার্স।

লিয়াকত আলি মিয়া বলেন, আমার কতা কইলেন না ত কুদ্দুস ভাই? স্মাগলিং না। করলে ত আপনেগো কাছে আসতে পারতাম না, পাঁচ দশ কোটি দিতে পারতাম না। স্মাগলিং কামটা অত্যান্ত কঠিন; সবাই পারবো না। ইংরাজি সব বোঝতে পারি নাই, তয় কতাগুলিন ভালই লাগছিলো; মদ খাইয়া ইংরাজি শোনতে আর কইতে ভালই লাগে, মনে হয় নতুন মাইয়ামানুষ লইয়া ফাইভ স্টারে শুইয়া, আছি কুদ্দুস ভাই, আরো কন।

তারপর গায়িকা ও নর্তকীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ও সিংগার ড্যাঞ্চার সিস্টাররা, আমাগো কুলকার্নি হ্যাঁমামালিনি বইনরা একটু চুলি কা নিচে কাহে চুরাকে দিল মেরা ড্যাঞ্চ ধরেন।

নর্তকী তিনটি হেসে কয়েকবার শিনা ঝাঁকুনি দেয়, কয়েকবার পাছা দোলায়।

কুদ্দুস চৌধুরী বলেন, দেশের সোসিও-ইকনমিক ফেনোমেননগুলি দেখতে হবে; উই মাস্ট ফেস রিয়েলিটি। সারা জীবন ফার্স্ট সেকন্ডে হয়ে, ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ক্লাশ সেকেন্ড কাশ ফার্স্ট সেকেন্ড হয়ে বিসিএস পাশ করে যে-ছেলেটি ব্যুরোক্র্যাট হলো, তার বেতন কতত? বিশ বছর চাকুরি করার পর সে ক-টাকা জমাতে পারে? একটাকাও না। অথচ

সে দেখতে পায় তার সাথে যে-ছেলেটা ফেল করতো, থার্ড ডিভিশন পেয়েছিলো সে মস্তানি করে, ঠিকাদারি করে, স্মাগলিং করে কোটিপতি হয়ে গেছে; আর কোটিপতিটি স্যার, স্যার' করে কাজগুলি বাগিয়ে নিচ্ছে তারই কাছ থেকে। তখন হি ক্যানট রিমেইন এ সেইন্ট, হি শুড নট রিমেইন অনেস্ট। রাস্তার পাজেরোগুলি কারা দৌড়ায়? গুড স্টুডেন্টস্ ক্যান নেভার ড্রিম অফ এ পাজেরো; নাউ এ ডেইজ অল বিউটিফুল বাক্সম সেক্সি উইমেন অ্যান্ড পাজেরোজ বিলং টু ইলিটারেট রাস্কেলস্।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, সবাই খাইতেছে, কিন্তু স্কেপগোট হইতেছি আমরা। পলিটিশিয়ানরা, আমাগো বদনামে দুনিয়া ছাইয়া যাইতেছে, আমরা পলিটিশিয়ানরা মাইর খাইতেছি, জ্যালে পচতেছি, পোলামাইয়া ইস্ত্রীগো কাছে মোখ দ্যাখাইতে পারতেছি না, আর অন্যরা তখন ফাইভ স্টার হোটেলে ছেমরি লইয়া ডিস্কো নাচতেছে, অন্যের বউরে লইয়া ব্যাংকক সিঙ্গাপুর যাইতেছে।

ছয়ফুর চাকলাদার একটু বেশি পান করেছেন, বা বেশি পান করেন নি, অল্প পান করলেই তার ঠোঁটে গান আসে দেহে নাচ আসে, অধিকাংশই হিন্দি গান হিন্দি নাচ; তিনি একটু নাচ আর গান শুরু করেন; এবং নাচতে নাচতে বলেন, এইর জইন্যে দোষ আমরাগোই, কাউয়ার গোস্ত কাউয়ায় খায় না শোনছি কিন্তু পলিটিশিয়ানরা পলিটিশিয়ানগো গোস্ত দিনরাইত খায়। পাওয়ারে যাওনের লিগা আমরা লাফাইয়া লাফাইয়া অন্যেগো চোর কই; এখন অরা আমরাগো চোর বলছে; এইটা হইছে পলিটিক্স। যদ্দিন পলিটিক্স থাকবো তদ্দিন এইটা থাকবো, নাইলে আমরা পলিটিশিয়ানরা খামু কী কইর‍্যা?

জেনারেল কেরামত বলেন, ঠিকই বলছে ছয়ফুরভাই, উই ডু নট হ্যাভ মেনি ইস ফর পলিটিক্স, সো উই হ্যাভ টু ডিপেন্ড অন আদার্স করাপশন অ্যান্ড রিলিজিয়ন ফর গোয়িং টু পাওয়ার। আমরাও ক্ষমতায় আসনের আগে খোজাবংশের করাপশন নিয়ে শাউট করছি, ব্যাংক ডিফলটারদের নাম পাবলিশ করছি; লেটার অন দে বিকেইম আওয়ার ফ্রেইন্ডস অ্যান্ড মাস্টার্স। আমাদের মহাদেশনেত্রী হ্যাঁজ টোল্ড দি ফাঁইন্যাল টুথ দ্যাট ইন পলিটিক্স নাথিং ইজ ফাঁইন্যাল, ইন পলিটিক্স দ্যায়ার ইজ নো পারম্যানেন্ট ফ্রেইন্ড অর ফো।

আমরা জনগণরাও এইটা বুঝতে পারতেছি। অন্যের করাপশন লইয়া কে চিল্লাপাল্লা করে নাই? পাওয়ারে আইসা কে করাপশন করে নাই? চিল্লাপাল্লা হচ্ছে পলিটিক্স, রাজনীতি। যারা অন্যের করাপশন লইয়া চিল্লাপাল্লা করেন, নিজেদের করাপশন লইয়া অন্যেরা চিল্লাপাল্লা করলে বলেন গণতন্ত্র বিপন্ন, দেশ বেচে দেয়া হচ্ছে, একেবারে বিনা পয়সায় একেবারে পানির দরে ছাইড়া দেয়া হচ্ছে, তারা রাজনীতিবিদ, পলিটিশিয়ান। বহু বচ্ছর আগে জনগণমনবংশ ক্ষমতায় এসেছিলেন, তাঁরা তখন ছিলেন রাজার রাজা, রাজাধিরাজ, সম্রাটের সম্রাট, তখন সদ্য স্বাধীন হইছি, কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ পাইতেছিলাম না, বা এমনভাবে পাচ্ছিলাম যে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম, রগে রগে টান লাগতেছিলো, ছুঁইল্যা যাইতেছিলাম, তাঁরা স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন বলে মানতে বাধ্য করেছিলেন, আমরা মেনে নিয়েছিলাম (পরে অন্যরা মানতে বাধ্য করেছিলেন যে জনগণমনবংশ স্বাধীনতা আনে নি, তারা কলকাতা গিয়ে শুধু তিনতারা হোটেলে ঘুমিয়েছে, সোনাগাছিতে মজা করেছে, হিন্দুমাইয়াগো লইয়া ঢলাঢলি করেছে, মাঝেমইধ্যে রবীন্দ্রনাথের বই খুইল্যা গান গাইছে, আর একজন তো পাকিস্থানে গিয়া পায়ের ওপর পা রাইখ্যা খালি অ্যারিয়োর তামুক টানছে পাইপ ভইর‍্যা, আর চোখে কালা চশমা দিয়া দিনরাইত ইশঠাশ ঠুশঠাশ যুদ্ধ করছে খালি তাগো একনম্বর ফ্রিডম ফাইটার একনম্বর মেজর একটা ঘোষণা দিয়াই সে দ্যাশ স্বাধীন

কইর‍্যা ফেলছে, আমরা তাও মেনে নিয়েছিলাম : মানা ছাড়া আমরা জনগণরা কী করতে পারি?), আমরা তাদের দেখলেই মাথা নিচু করে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতাম, আমরা সবাই দল বেঁধে কইলকাতা যাইতে পারি নাই, তাদের আমরা সব ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু ক্ষমতায় তাদের পেট ভরে নাই।

আমরা আধুরা জনগণ, বেশি কথা বলা আমাদের উচিত না, আমাদের গলায় বেশি কথা সাজে না, গলা আমাদের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা উচিত, আল্লাতাল্লা গফুরের রাহিম সব কথা বলার ক্ষমতা দিছেন শুধু রাজাগো। আমরা তো তারে সব ক্ষমতা দিছিলাম, বাঙলায় ক্যাপিটাল লেটার থাকলে সেটা দিয়েই আমরা জনগণরা 'তাঁরে' লিখতাম, যতোটা দেওনের আছিল বাকি রাখি নাই, আরো থাকলে আরো দিতাম, দিনরাইত তাঁর গুণগান গাইতে গলারে অবসর দেই নাই, তিনি বিদেশ থিকা বিদেশির মতো দেশে এসেছিলেন, বিমান থেকে নেমে ট্র্যাকে উঠে তিনি দ্যাশটা দেখে চিনতে পারতেছিলেন না, তার চোখমুখের দিকে তাকিয়ে তা-ই মনে হচ্ছিলো; তিনি কোন ক্ষমতা পেলে সুখ পাবেন বুঝতে পারছিলেন না, রাষ্ট্রপতি হবেন না রাজা হবেন না আবার রাষ্ট্রপতি হবেন না বাদশাহ্ হবেন না সুলতান হবেন না মহারাজ হবেন না সম্রাট হবেন না একলাই সব হবেন না ভাইগ্না ভাইস্তা শালা বোনের জামাই পোলামাইয়ারে দেশটা দিয়ে দেবেন, দেশটারে কয় ভাগে ভাগ করবেন, কয়টা সুবাদার লাগাইবেন, তা ঠিক করতে পারতেছিলেন না; তখন বড়ো ক্যাডাররা দেখা দিলো, শক্তির উৎসবাদী রাজবংশের উৎপত্তি হলো; নতুন কালিতে সব নতুন ইতিহাস লেখা হলো। আমরা ইতিহাস লেখালেখি বড়ো পছন্দ করি, কয়েক বছর পর পর আমরা নতুন কালিতে সব নতুন ইতিহাস লিখি, নতুন নতুন ইতিহাস মুখস্থ করি।

পাওয়ার হচ্ছে আসল কথা; পাওয়ার পেলে করাপশন করতেই হয়। পাওয়ার হচ্ছে দামড়া পুরুষপোলা, সব সময় খাড়া হইয়া আছে, আর করাপশন হইছে পাটক্ষেতে ডেকড়ি মাইয়ালোক; তাই করতেই হয়। হাজার বচ্ছর ধরে করাপশনে থাকতে থাকতে করাপশনরে আমরা খারাপ মনে করি না, পলিটিশিয়ানরা যতোই চিৎকার করুক, আমরা জানি ওইটা হইছে খালি আওয়াজ; যারা করাপশন করে, করতে পারে তাদের আমরা ভক্তিশ্রদ্ধাই করি। আমরা যাগো ছবি বঙ্গভবনে ভঙ্গভবনে বান্ধাইয়া রাখছি তাগো মইধ্যে কে করাপশন করেন নাই? তাই বলে কি আমরা তাগো মায়ের পেট হইতে খালাশ হওনের দিনে আর দুনিয়া থেকে আমাগো কান্দাইয়া যাওনের দিনে ইস্কুলের। পোলাপানরে ছুটি দিয়া খুশি করি না?

পাওয়ার? তা কে চায় না? আমরা হাজার বচ্ছরে পাওয়ার পাই নাই, তাই আমরা সবাই পাওয়ার চাই; আমরা একদল লর্ড ক্লাইভ হইতে চাই, আরেকদল আইউব খা হ'তে চাই; পাওয়ার পাওয়ার পর তাদের ছাড়িয়ে যেতে চাই। ছাড়াবাড়ির খুদির মায় পাওয়ার চায়, ঢালারপাড়ের রকমান পাওয়ার চায়। পাওয়ার পেলে খুদির মার মস্তক ঠিক থাকে না, দিনে পাঁচসাতবার পাগল হয়; রকমানের অণ্ড ফুলে ওঠে, কোষ ফুলে ওঠে, সব জায়গায় পাওয়ার বোধ করে।

ওই যখন বড়ো ক্যাডাররা প্রথমবার আসলো। ক্যাডাররা এসে চাষাভুষাগো বিধিবিধান খোঁচা দিয়ে লাথি মেরে বাতিল করে ক্যাডারগো ধরো মারো ঝোলাও গুতাওগুলি চালু করলো, চাষাভুষার নিয়ম চিৎ হয়ে পড়লো খাড়া হয়ে দেখা দিলো ক্যাডারগোগুলি; চালু করার জন্যে তারা চাষাগো মানুষগোই কামে লাগাইলো। আমরা চাষা চামারকামাররা না খেয়ে পাছা উদলা রেখে তাগো মোটামোটা বেতন দেই, গাড়িবাড়ি ফ্লাগ দেই, তারা আমাগো নিয়ম বাঁচাইবো ব'লে; কিন্তু আমরা কী দেখতে পাইলাম? যা দেখতে পাইলাম, তা বলন

যায় না। ক্যাডাররা এসে আমাগো তাগো গোমস্তা বানাইলো, তারা খুশি হয়ে গোমস্তা হইলো। আমি কান্দি মাইয়ার লিগা মাইয়া কান্দে নাঙ্গের লিগা। এইটা আমরা আগেও দেখছি; ক্যাডাররা আইসাই খোঁজে তাগো, আর তাঁরা ফজরবেল ক্যাডারদের ট্রাকের আওয়াজ পাওয়ার পর থেকেই অজু গোশল কুলুপ ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে সেলাত আদায় করে কাজের মেয়ের হাতে (বৃদ্ধা স্ত্রী নিদ্রিত) আখের গুড়ের মুড়ির মোয়া আর চা খেয়ে স্যুটকোটটাই পরে নিজের হাতে জুতো পালিশ করে অপেক্ষা করতে থাকেন, কখন ক্যাডাররা নিতে আসবে। কখন জিপের শব্দ পাওয়া যাবে। কখন পাওয়ারে বসাবে, মহামান্য প্রেছিডেন্ট করবে, সর্বশক্তিমান ছিএমএলএ করবে। আমি কান্দি মাইয়ার লিগা মাইয়া কান্দে নাঙ্গের লিগা।

এইটা কি রাজনীতি না? রাজনীতি কি হয় খালি শ্লোগান দিলে আগুন লাগাইলে ভাঙলে চুরলে মিছিল করলে ভোট চাইলে ভোট ডাকাতি করলে? ছৈজদ্দি ব্যাপারী বলে শ্লোগান দিয়ে আগুন লাগিয়ে মিছিল করে ভেঙেচুরে রাজনীতি করতে হলে পোতার ওপর সেইটা থাকতে হয় খাড়াইতে হয় দাঁড়াইতে হয়; আর বড়ো ক্যাডার আসার পর স্যুটকোট ফিলে প্রেছিডেন্ট ছিএমএলএ হওয়ার জন্যে দরকার হচ্ছে–দরকার হচ্ছে পোতা না থাকন সেইটা না থাকন। ইসহাক মওলানা সাব বলেন তাগো সেইটা কাইট্যা নুন ভইর‍্যা দেওয়া হইছে। ছৈজদ্দি ব্যাপারী বলে এগো নাম পোতাছাড়া পলিটিশিয়ান, করনের ইচ্ছা আছে ষোলো আনা কিন্তু খাড়ায় না; ক্যাডাররা বুটের লাথি দিয়ে এগো সিংগাসনে বসিয়ে দেয়, আবার পাছায় লাথি মেরে নামিয়ে দেয়। এতেই তাদের আনন্দ।

দালানের ওপরের আন্ধা মেয়েলোকটা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, পাগলির মতো খলখল করে হাসে কলকল করে কাঁদে রাস্তায় পড়ে গড়াগড়ি খায় চুল ঘেঁড়ে। পাটের

দড়িতে বান্ধা বেতের দাঁড়িপাল্লা এদের মাথার ওপর ঠাশ ঠাশ করে ছিঁড়ে পড়ে; তারা বুঝতে পারে না।

সেই প্রথম বড়ো ক্যাডাররা এসে বড়ো সেইটাছাড়ার বাড়ি জিপ পাঠায়।

সেইটাছাড়া স্যুটকোট পরে প্রস্তুত হয়েই বসে ছিলেন, কয়েক দিন ধরেই বসে ছিলেন, ডাক আসতে একটু সময় লাগে, তারা তখনো খুনাখুনি শেষ করে উঠতে পারে নি, বসে থাকতে থাকতে তার পাছায় বাত ধরে যায়; হঠাৎ একঝক ক্যাডার দরোজা ভেঙে ঢুকছে দেখে তিনি ভয় পেয়ে যান, দৌড়ে গিয়ে বাথরুমে ঢোকেন; কমোডের ওপর বসে পড়েন, কিন্তু কমোডে বসে কী করতে হয় ভুলে যান; এবং উল্টোপাল্টা কাজ করতে থাকেন। একবার লাফিয়ে কমোডের ভেতরে ঢুকে পড়তে চান, কিন্তু মাথায় বাড়ি লেগে আবার কমোডে বসেন; আবার কমোডের ঢাকনার ওপর বসে পড়েন যেমন ছেলেবেলায় পিঁড়িতে বসতেন। ব'সে জীবনে এতো আরাম আর কখনো তিনি পান নি।

তিনি বলেন, কমোড, আমারে রক্ষা করিও, জীবন দান করিও।

কমোড থপথপ শব্দ করতে থাকে।

এক ক্যাডার দরোজায় লাথি মেরে বলে, স্যার, প্লিজ কাম আউট, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেইড; আওয়ার লিডার হ্যাঁজ অর্ডার্ড আস টু মেইক ইউ অ্যাভেইলেবল অ্যাট বঙ্গভবন ইন টেন মিনিটস টাইম; হি উইল মেইক ইউ দি প্রেছিডেন্ট অ্যান্ড দি ছিএমএলএ। দ্যাশে

ইম্মেডিয়েটলি ড্যামোক্রেসি দরকার, প্লিজ কাম আউট উইদাউট মাচ ডিলে; দি বাথরুম ইজ নট ইয়োর প্রপার প্লেস, বঙ্গভবন কস্ ইউ; আওয়ার ড্যামোক্রেসি ওয়ান্টস্ ইউ।

সেইটাছাড়া বাথরুম থেকে বেরিয়ে ক্যাডারদের স্যালুট দেন।

ক্যাডাররা তাকে কোলে করে জিপে তোলে। সান্ধ্য আইন বুঝে নভেম্বরের হাল্কা কুয়াশা তখন বিব্রতভাবে ছড়িয়ে আছে চারদিকে, পথে কোনো মানুষ নেই, কয়েকটি কুকুর রাজত্ব করছে রাজপথে, ক্যাডাররা তাঁকে জিপে তুলে দেখে বসার জায়গা নেই। তারা তাকে কোলেই তুলে রাখে–বেশ হাল্কাপাতলা জিনিশ, দেশি মুরগির মতো; এবং বঙ্গভবনের ভেতরে ঢুকে প্রধান ক্যাডারের সামনে বাজারের থলের মতো ছুঁড়ে দেয়।

সেইটাছাড়া কোনো মতে দাঁড়িয়ে প্রধান ক্যাডারকে স্যালুট দেন।

প্রধান ক্যাডার বলেন, ইউ শুড নট স্যালুট মি, ইনস্টেড আই শ্যাল স্যালুট ইউ; আই অ্যাম গোয়িং টু মেক ইউ দি প্রেছিডেন্ট অ্যান্ড দি ছিএমএলএ রাইট নাউ। দ্যাশে ড্যামোক্রেসি দরকার, পিপল আর হাংরি ফর ড্যামোক্রেসি, ড্যামোক্রেসি নিড়স্ ইউ ফর দি টাইম বিয়িং।

প্রধান ক্যাডার একটা মারাত্মক স্যালুট মারেন, তাঁর বুটের আঘাতে বঙ্গভবন ভেঙে পড়তে চায়; সেইটাছাড়া স্যালুটের শব্দে ভয় পেয়ে যান।

প্রধান ক্যাডার বলেন, নাউ, ইউ আর দি প্রেছিডেন্ট অ্যান্ড দি ছিএমএলএ। আমি যেভাবে বলবো, সেভাবে আপনি কান্ট্রি রুল করবেন; তাহলে ড্যামোক্রেসি আসতে দেরি হবে না;

উই অল বিলিভ ইন ড্যামোক্রেসি, আমরা দ্যাশে ড্যামোক্রেসি এনে ছাড়বো, ড্যামোক্রেসি ছাড়া কান্ট্রি চলতে পারে না।

প্রেসিডিএমএলএ প্রধান ক্যাডারের গোঁফ দেখতে পান, কিন্তু চোখ দেখতে পান না; তার চোখ দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সানগ্লাসের সামরিক বেরিয়ার পেরিয়ে ওই অসূর্যম্পশ্য চোখ দুটি তিনি দেখতে পান না।

প্রধান ক্যাডারের কথায় চমকে উঠে তিনি বলেন, ইয়েস, স্যার।

প্রধান ক্যাডার বলেন, ইউ আর দি প্রেছিডেন্ট অ্যান্ড দি ছিএমএলএ, ডোন্ট অ্যাড্রেস মি অ্যাজ স্যার; আই অ্যান্ড উই অল উইল অ্যাড্রেস ইউ অ্যাজ স্যার। ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ড্যামোক্রেসিতে দি প্রেছিডেন্ট অ্যান্ড দি ছিএমএলএ ইজ অ্যাবাভ অল।

প্রেসিছিএমএলএ বলেন, ইয়েস, মাই প্রভু, জি, আমার মনিব।

প্রধান ক্যাডার বলেন, ইউ আর দি প্রেছিডেন্ট অ্যান্ড ছিএমএলএ; আই অ্যাম দি ডিজিএমএলএ নাম্বার ওয়ান, দ্যায়ার আর টু মোর ডিছিএমএলএস; অ্যান্ড দিজ গাইজ আর ইওর অ্যাডভাইজারস্। হিয়ার ইজ এ রিটায়ার্ড জাস্টিস অফ দি সুপ্রিম কোর্ট, হি উইল অ্যাক্ট অ্যাজ ইউর স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্ট, বাট ইন ফ্যাক্ট হি উইল অ্যাক্ট অ্যাজ মাই ব্যাটম্যান। উই অল আর ওয়েটিং ফর ড্যামোক্রেসি।

প্রেছিছিএমএলএ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন, আমার কী কাজ হইবে, আপনি আমাকে কী কাজ দিবেন দয়া করিয়া?

প্রেছিছিএমএলএ অভ্যাসবশত একটি সম্বোধন করতে গিয়ে সানগ্লাসের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে থেমে যান। সানগ্লাসে তিনি কালো আগুন জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠতে দেখেন।

প্রধান ক্যাডার বলেন, আপনার কিছুই করতে হবে না, আমরাই সব কাজ করবো; আপনি শুধু অনারেবল প্রেছিডেন্ট অ্যান্ড ছিএমএলএ থাকবেন, আপনি বঙ্গভবনে ঘুমাইবেন খাইবেন অ্যাচ মাচ অ্যাজ ইউ নিড, আর না দেখে সাইন করবেন, আমরা তখন ইলেকশন আর ড্যামোক্রেসির রাস্তা পাকা করবো। দি কান্ট্রি নিস্ ড্যামোক্রেসি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল।

কোনো কাজ করতে হবে না শুনে খুব খুশি হন প্রেছিছিএমএলএ।

প্রধান ক্যাডার বলেন, ইউ ওয়্যার এ ফেসলেস নেমলেস আননৌন টপ লিগাল ব্যুরোক্র্যাট; ন্যাশন আপনাকে চিনে না, এইবার আপনাকে ন্যাশন চিনতে পারবে, এভরি নাউ অ্যান্ড দেন যখন উই উইল ফিল নিড আপনাকে টেলিভিশনে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের নিচে বসে ড্যামোক্রেসি আর আমাদের মহৎ পারপাস সম্পর্কে ন্যাশনকে অ্যাড্রেস করতে হবে। আই শ্যাল ডিক্টেট দি অ্যাড্রেস হুইচ ইউ উইল রিড। ঠিক মতো রিডিং পড়া শিখতে হবে, যেমন ক্লাশ ফোর ফাইভে পড়তেন। ভেরি সুন ইউ উইল বি এ নৌন ফিগার ইন দি কান্ট্রি। আই অ্যাম শিউর ইউ উইল এনজয় ইট।

প্রেছিছিএমএলএ বলেন, আমি রিডিং পড়িতে পারিব, চিরকাল আমি রিডিংই পাঠ করিয়া আসিয়াছি; ইহা করিতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইব, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রধান ক্যাডার বলেন, আপনাকে বেশি দিন কষ্ট দেবো না, স্যার, ইউ আর অ্যান অোল্ড হ্যাঁগার্ড, বছরখানের মধ্যেই আই শ্যাল বি দি ছিএমএলএ, তখন আমরা ড্যামোক্রেসির দিকে কয়েক স্টেপ প্রসিড করবো, উই নিড ড্যামোক্রেসি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল; তখন আপনার কাজ কমবে, কম সাইন করতে হবে, কম অ্যাড্রেস করতে হবে।

প্রেছিছিএমএলএ বলেন, দ্যাট উইল বি ভেরি কাইভ অফ ইউ, বৃদ্ধ মানুষ আমি বেশি পরিশ্রম করিতে কষ্ট হইবে।

প্রধান ক্যাডার বলেন, বছর দেড়েকের মধ্যে ইউ উইল বি টু জৌল্ড অ্যান্ড ইউজলেস, বাই দিস টাইম দি কান্ট্রি উইল বি রেডি ফর ড্যামোক্রেসি, আই শ্যাল গিভ বার্থ টু এ ন্যাশনালিস্ট পলিটিক্যাল পার্টি; দেন ইউ উইল রিজাইন ইন মাই ফেভার। মেনশনিং দি রিজন ফর রেলিনকুইশমেন্ট অফ দি অফিস অ্যাজ অফ ইল হেলথ অ্যান্ড ইন ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট। ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট মিস্ ড্যামোক্রেসি।

প্রেছিছিএমএলএ বলেন, দ্যাট উইল বি মাই কন্ট্রিবিউশন টু ড্যামোক্রেসি, দেশে ড্যামোক্রেসি আনিয়া আমি ধন্য বোধ করিব, চিরকাল আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিব, আপনি জাতিকে পুণ্যপন্থা দেখাইবেন।

প্রধান ক্যাডার বলেন, দেন উই উইল হ্যাং ইউর ফটোগ্রাফ ইন বঙ্গভবন।

হ্যাং শব্দটি শুনে কেঁপে ওঠেন প্রেছিছিএমএলএ; পরে বুঝতে পারেন তাঁকে নয়, তার ছবি লটকানো হবে বঙ্গভবনে। তিনি স্বস্তি বোধ করেন।

বছর দেড়েক পর নুনভরাকে সেইটাছাড়াকে পাঁজাকোলে করে একদল ক্যাডার ফেলে দিয়ে আসে তার বাড়ির ডাস্টবিনের পাশে। সেদিন দেশে নতুন গণতন্ত্র দেখা দেয়। এমন সেইটাছাড়া পলিটিশিয়ান আরো অনেক জন্ম নিয়েছে দেশে, তবে সকলের কথা বলার দরকার নেই, বলতে ঘেন্নাও লাগে।

পার্টি বেশ গভীর ঘন নিবিড় হয়ে জমেছে।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, অরা চাইর বছর যা পাইছিলো খাইছিলো, অনেক বচ্ছর খায় নাই, এইবার খাইতে চায়। খাওয়াইয়া দিমু অগো।

ডঃ কদম রসুলের বেশ লাগছে; ওই তিন রাতের পর এই রাতটিকে জান্নাতুল ফেরদৌসের রাত মনে হচ্ছে। তার কয়েক রেকাত সালাত আদায়ের ইচ্ছে হয়।

তিনি বলেন, অগো ভয় পাওয়াইয়া দিতে হইবো, আমলাগুলিরেও ভয় পাওয়াইতে হইবো, পুলিশগুলিরেও ডর লাগাইতে হইবো। আমাদের ভয় পাইলে চলবে না, সকলকে ভয় লাগাইয়া দিতে হইবো।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, ডর অনেক আগেই লাগাই দিছি; অরা চাইছিলো আমাগো ঢাকা থিকা দ্যাশ থিকা খ্যাদাইয়া দিয়া পাওয়ারে আসতে; শুরুতেই অই যে ধমক দিলাম, ডর লাগাইয়া দিলাম, তাই আইজকাইল মিনমিন কইর‍্যা খালি করাপশনের পাচালি গায়। অরা কবিয়ালা, অগো পাচালি গাওন ছাড়া আর কাম নাই।

জেনারেল কেরামতের একটি অন্তরঙ্গ প্রব্লেম তাঁকে মাঝেমাঝে খোঁচা দিচ্ছে। তিনি সেটা অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টুর সাথে একটু আলোচনা করতে চান, কেননা অধ্যক্ষই তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন, কেননা অধ্যক্ষই সেটি বিশদভাবে জানেন। তবে অধ্যক্ষ যা জানেন, তা মধুর; তাতে কোনো খোঁচাখুঁচি নেই, বা থাকতেও পারে, এখন খোঁচাখুঁচিটা বেড়েছে।

জেনারেল অধ্যক্ষের কাছে এসে বলে, অধ্যক্ষ ভাই, আই হ্যাভ সাম ভেরি পারসোন্যাল অ্যান্ড ইন্টিমেট ডিসকাশন উইথ ইউ।

অধ্যক্ষ উঠে দাঁড়ান; তারা লাইলি পুষ্পকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে আরেকটি কুঞ্জে ঢোকেন, যেটির কোনো নাম নেই; পরে কখনো নাম দেয়া হতে পারে, হয়তো পরে কোনো শিরিন পুষ্পকুঞ্জ বিকশিত হতে পারে।

জেনারেল বলেন, ভাই, একটা প্রব্লেম অ্যারাইজ করেছে; আপনেই শুধু তা সত্ করতে পারেন, অনলি ইউ ক্যান সলভ ইট ফর মি।

অধ্যক্ষ বলেন, আমি ত অল টাইম আপনের সার্ভিসে আছিই। তাছাড়া জ্যানারেলগো কোনো প্রব্লেম থাকা ঠিক না, তাইলে কান্ট্রির ডিফেন্স পাওয়ার নষ্ট হইয়া যায়, কান্ট্রি উইক হইয়া পড়ে।

জেনারেল বলেন, লাইলি।

অধ্যক্ষ হাসতে হাসতে বলেন, অহ, নতুন ভাবীসাব অ্যাটাক করছে বুঝি? তাইলে ত এনিমি ইজ ভেরি স্ট্রং, ইন্ডিয়া পাকিস্থান না, আপনে সুপার পাওয়ারের অ্যাটাকে পড়ছেন; ডিফেন্স নষ্ট কইরা ফেলছে নি?

জেনারেল বলেন, লাইলি আর গোপন ওয়াইফের লাইফ লিড করতে চায় না, ওপেনলি সে আমার সঙ্গে থাকতে চায়, ওয়ান্ট টু বি হেভিলি প্র্যাগনেন্ট, সে সব কনডম আর পিল ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সে ওয়াইফের ফুল স্ট্যাটাস চায়, মিস্ট্রেসের মতন থাকতে চায় না।

অধ্যক্ষ বলেন, বেশ মেজর প্রব্লেম মনে হইতেছে।

জেনারেল বলেন, নট অনলি দ্যাট, লাইলি ইলেকশনেও দারাতে চায়, সে নমিনেশন চায়।

অধ্যক্ষ একটু চিন্তিত হন; এবং বলেন, জ্যানারেলভাই, আপনের প্রব্লেম দুইটা; প্রথমটা লাইলিভাবী ওপেন স্বীকৃতি চায়, তারপর ইলেকশনে দারাইতে চায়। দুইটা প্রব্লেমই সল্ভ করতে হবে।

জেনারেল বলেন, হ্যাঁ, ভাই; আপনেই এইটা সলভ করতে পারেন।

অধ্যক্ষ বলেন, কোনো প্রব্লেমই কঠিন না, সব প্রব্লেমই সলভ করন যায়। তবে এই কাজে আপনের পাঁচ দশ কোটি টাকা খসাইতে হইবে।

জেনারেল বলেন, মানি ইজ নো প্রব্লেম, টাকা আমি খরচ করতে রাজি, আই হ্যাভ ইনফ মানি টু কিপ সেভারেল ওয়াইভস্ অ্যান্ড মিস্ট্রেসেস; আপনি শুধু প্রব্লেম দুইটা সভ করে দেন ভাই।

অধ্যক্ষ বলেন, প্রথম প্রব্লেম বড়ভাবী, তারে কি আপনে ডাইভোর্স করে লাইলি ভাবীর সঙ্গে সংসার করতে চান?

জেনারেল বলেন, নো, নো; ডাইভোর্স করতে চাই না। তাতে আমার ইমেজ টোটালি নষ্ট হয়ে যাবে, মাই পলিটিক্যাল কেরিয়ার উইল বি শ্যাটার্ড।

অধ্যক্ষ বলেন, এইটা পলিটিশিয়ানের মতন কথা। পলিটিশিয়ানরা মিস্ট্রেস রাখতে পারে, গোপনে দুই একটা ওয়াইফ রাখতে পারে, কিন্তু বড় স্ত্রীরে ডাইভোর্স করতে পারে না। পলিটিশিয়ানগো ফ্যামিলি ভ্যালুজ ঠিক রাখতে হয়, ফ্যামিলি ভ্যালুজ সম্পর্কে লেকচার দিতে হয়; এমনকি আমেরিকায়ও ক্লিন্টনভাই দুই তিন শো মাইয়ালোকের লগে ঘুমাইলেন সাক করাইলেন, কিন্তু ফ্যামিলি ভ্যালুজ তিনি নষ্ট করতে পারেন না।

জেনারেল বলেন, আমি ফ্যামিলি ভ্যালুজ ঠিক রাখতে চাই, ফ্যামিলি ভ্যালুজ ঠিক না রইলে সমাজে রইলো কী।

অধ্যক্ষ বলেন, তার মানে বড়ভাবীরে রাজি করাইতে হবে। আমার মনে হয় লাইলিভাবীর কথা বড়ভাবী জানে, বুড়াকালে সেও বেশি গোলমালে যাইতে চায় না, তার স্বার্থটা ঠিক থাকলেই হইল। তারে এইটা মানাইতে হইলে দুই চাইর কোটি তারে দিতে হইবো, বারিধারার বাড়িটাও লেইখ্যা দিতে হইবো মনে লইতেছে, আরো কিছু খরচ লাগবো। মাসে দুই এক রাইত তার লগে থাকলেই চলবো, তার বেশি লাগবে না।

জেনারেল বলেন, এইটা কোনো সমস্যা না, এই সব আমি দিবো, আই হ্যাভ ইনাফ মানি, মানি ইজ নো প্রব্লেম।

অধ্যক্ষ বলেন, আর ভাই, আপনের এলডেস্ট সানকেও কন্সিডার করতে হইবে, সে আমাগো বড়ো ক্যাডার; সেও পিস্তল ঠ্যাকাইতে পারে।

জেনারেল বলেন, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ পসিবল, আই অ্যাম মাচ অ্যাফ্রেইড হি উইল ক্রিয়েট ট্রাবলস্, অলদো হি হ্যাঁজ সেভারেল মিস্ট্রেসেস, ইয়ং অ্যান্ড অৌল্ড।

অধ্যক্ষ বলেন, তারে থামাইতে কোটি দুই লাগবো, বেশিও লাগতে পারে।

জেনারেল বলেন, টাকা প্রব্লেম না প্রিন্সিপালভাই, টাকা আই হ্যাভ ইনাফ, আপনি এটা ট্যাকল করে দিবেন।

অধ্যক্ষ বলেন, দ্বিতীয় প্রব্লেম হইলো লাইলিভাবীর ইলেকশনে দারান, নমিনেশন পাওন। কথা হচ্ছে আমাগো দল থিকা কোনো মাইয়ালোক দারাইলে পাশ করতে পারবো না। মহাদেশনেত্রী মাইয়ালোকের মধ্যে পড়েন না, তিনি হইতেছেন মহাদেশনেত্রী, আমাদের মহান ফাদার অফ দি পার্টির মহীয়সী স্ত্রী, তিনি আমাদের পূজনীয়া মাদার অফ দি পার্টি, কুইন ভিক্টরিয়া। তিনি থাকলে আমরা আছি, নাইলে নাই।

জেনারেল বলেন, কিন্তু ভাই, আমি একটা সলিউশন বাইর করছি, আপনি ওইটা মাইন্যা নিলে কোনো প্রব্লেম থাকবো না, অন্যেরা আপনের কথা ফেলতে পারবে না।

অধ্যক্ষ বলেন, আপনের সলুশনটা বলেন ভাই।

জেনারেল বলেন, আমি দুইটা কন্সটিটিউয়েন্সি থিকা দারাইতে চাই; দুইটা কন্সটিটিউয়েন্সিই আমি তিন বছর ধরে ঠিক করে রাখছি, আই স্পেন্ট মিলিয়ন্স, আমি দুইটা থিকাই পাশ করবো। দি ভোটারস অফ বোথ দি কন্সটিটিউয়েন্সিস ওয়ান্ট মি, অ্যাজ দ্যায়ার এমপি বিকজ দে নো আই শ্যাল বি এ মিনিস্টার, দ্যায়ার ইজ নান টু চ্যালেঞ্জ মি।

অধ্যক্ষ বলেন, আপনে দলের লিডার, দুইটা কন্সটিটিউয়েন্সি থিকা নমিনেশন আপনে পাইবেন, আমি আপনের কথা আগেই ভাইব্যা রাখছি। এই বছর আমরা লিডাররা প্রত্যেকে দুই তিনটা কইর‍্যা কন্সটিটিউয়েন্সি থিকাই কন্টেস্ট করবো, মহাদেশনেত্রী করবেন চাইরটা থিকা। তবে ভাই এখন থিকাই একটু দেইখ্যাইনা রাখবেন, যাতে ওইখান থিকা আর কেহ দারাইতে না চায়।

জেনারেল বলেন, ওইখান থিকা যারা ক্যান্ডিডেট হইতে পারে, তাদের আমি লাখ পঞ্চাশেক দিয়ে রেখেছি, কেউ ক্যান্ডিডেট হবে না, দে হ্যাভ গিভেন মি হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারেন্টি, দে আর মাই পেইড পিপল, অলমোস্ট স্লেভস্।

অধ্যক্ষ জিজ্ঞেস করেন, আপনে কি তাগো বিশ্বাস করেন, তাগো কথার কোনো দাম আছে?

জেনারেল বলেন, পলিটিক্সে বিশ্বাস করা বলে কিছু নাই, আছে ট্রিক্স; তার ব্যবস্থা আই হ্যাভ টেকেন, এখন থেকেই তাদের দুইজনরে দশজন কইর‍্যা ক্যাডার পাহারা দিতেছে, নমিনেশন পেপার জমা দেয়া পর্যন্ত পাহারা দিতে থাকবে।

অধ্যক্ষ বলেন, আপনাকে দুইটা কন্সটিটিউয়েন্সি থিকাই পাশ করতে হইবো, একটায়ও ফেল করলে চলবে না।

জেনারেল বলেন, সেই ব্যবস্থা আমি নিয়েছি, পাশ আমি করবোই। আই হ্যাভ মানি অ্যান্ড ক্যাডাস্; আমার বাক্সে ছাড়া অন্য বাক্সে ভোট দিতে নান উইল ড্যায়ার, ভোটারস্ আর নট দি ডিসাইডিং ফ্যাক্টরস্ ইন পলিটিক্স।

অধ্যক্ষ বলেন, মানি আর ক্যাডার থাকলে দুইটায়ই আপনে পাশ করবেন, যদি দুইটায়ই পাশ করতে পারেন, আপনেরে পায় কে? আপনে একটা সিট ছাইরা দিবেন, ওই খালি সিটে লাইলিভাবী দারাইবো; তখন তার নমিনেশন পাওন পানির মতন সোজা হবে। আমি তো আছিই আপনের পক্ষে, চিন্তার কোনো কারণ নাই। লাইলিভাবীও পাশ করবো, তখন

দুইজনেই পার্লামেন্টে বসবেন। ড্যামোক্রেসিতে এক ফ্যামিলি থিকা যতো মেম্বার হয় ততই ভাল।

জেনারেল বলেন, অধ্যক্ষভাই, আপনি কিছু মনে না করলে আপনার ইলেকশন ক্যাম্পেইনের ব্যয়ের ফিফটি পার্সেন্ট আমিই বিয়ার করবো।

অধ্যক্ষ জেনারেলকে জড়িয়ে ধরে বলেন, চলেন ভাই, আর দুই চাইর গেলাশ খাই, মাইয়াগুলিরে একটু কাছে থিকা দেখি। বুড়া হইছি বইল্যা শরীরের কাঁপন যায় নাই।

শক্তির উৎসবাদী গণতান্ত্রিক রাজবংশের মহাদেশনেত্রী, কুইন ভিক্টোরিয়া, বেশ ভেঙে পড়েছেন, সিংহাসনে বসা ছাড়া রাজনীতি তিনি বোঝেন না, তার চেয়ে বেশি বোঝেন থাই আর চিনা বিউটিশিয়ানদের, তবু তার মনে হচ্ছে সিংহাসন সরে যাচ্ছে; বেশ উৎফুল্ল আছেন জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশের মহাজননেত্রী, রাজকন্যা, সুলতানা রাজিয়া গতবারের কোনো ভুলই তিনি আর করতে চান না, এবার সিংহাসনে বসতেই হবে তাকে; তার রাজপুরুষদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন এবারের সম্ভাবনাকে নষ্ট করা চলবে না। এবার যদি ক্ষমতায় যাওয়া না যায়, তাহলে তাদের আর ভবিষ্যৎ নেই। তাই তার রাজপুরুষেরা খুবই ব্যস্ত, দিনরাত তারা করে চলছেন পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা।

৫. ড্যামোক্র্যাসি আর গণতন্ত্রের কলকাঠি

আমরা জনগণরা ড্যামোক্র্যাসি আর গণতন্ত্রের কলকাঠি বুঝতে পারি না, ভোট দিয়েই কাম শেষ করি; তবে শুনতে পাই শহরে নানা রকম পলিটিকেল পণ্ডিত দেখা দিয়েছেন, ওই পণ্ডিতরা অঙ্ক শিখে এসেছেন বিলাত আর আমরিকা থেকে, তারা নাকি পাঁচশোজন আর হাজারজন মানুষের সাথে কথা বলেই অঙ্ক করেই বলে দিতে পারেন এবার ইলেকশনে কোন রাজবংশ ক্ষমতায় আসবেন। আমাদের খবরের কাগজগুলি ওই সব রাজনৈতিক জ্যোতিষীদের হস্তগণনা ছাপতে শুরু করেছে, আর আমরা একেক দিন একেকদল জ্যোতিষীর হস্তগণনার অঙ্ক পড়ে মাথায় গোলমাল বাধিয়ে তুলছি। ইলেকশন আসলে সবাই দোকান খোলে, একটু ব্যবসা করে নিতে চায়; পানবিড়িআলারা ঘুমানোর সময় পায় না, টানবাজার আর কান্দুপট্টির মেয়েগুলোর পিঠ আর মাজা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়; এখন দেখছি নতুন এই ব্যবসাটি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে–দিনরাত ব্যবসা করছে।

নিরপেক্ষ রাজনৈতিক জ্যোতিষীসংঘ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন :

	উচ্চবিত্তের মতে প্রাপ্ত আসন	মধ্যবিত্তের মতে প্রাপ্ত আসন	নিম্নবিত্তের মতে প্রাপ্ত আসন	গড়ে প্রাপ্ত আসন
জনগণমনবংশ	১৪০	১৫০	১৬০	১৫০
শক্তির উৎসবংশ	১০০	৯০	৭০	৮৬.৬
খোজাবংশ	২০	২৫	২০	২১.৬
রাজাকারবংশ	৫	৩	১৫	৭.৬
অন্যান্য বংশ	৫	২	৫	৪

মোট আসন২৭০ ২৭০ ২৭০ ২৭১
দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক শ্রেণীতে অংশ নিয়েছেন ৫০০ ভোটার।

এবার হচ্ছে বাঁচনমরনের নির্বাচন, সারভাইভালের ইলেকশন; কারোই মাথা ঠিক নেই–জিতলে বাঁচুম হারলে মরুম। এই ধরনের হস্তরেখাপাঠ পাওয়া গেলে ভোটারদের মাথা ঠিক থাকে না, যারা ভোট চায় তাদের মগজ ঠিক থাকে না, খুলি ভেঙে মগজ চারদিক দিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়; বিশেষ করে মগজ আর মাথা নষ্ট ভ্রষ্ট দ্রষ্ট প্রষ্ট ঘ্রষ্ট হয়ে যায় তাদের, সিংহাসন যাদের অবশ্যই চাই–সেই শক্তির উৎসবাদী আর জনগণমন রাজবংশের মহাদেশনেত্রী মহাজননেত্রী রাজপুরুষ ক্যাডার, এমনকি চিকামারাদের।

একদিন সকালবেলা আমরা জনগণরা দেখতে পাই দেশখানা পলিটিকেল প্যান্ডিট আর অ্যাস্ট্রোলোজারে উপচে পড়ছে; হার্ভার্ড শিকাগো ইউসিএলএ হনুলুলুর সাথে আরো : অজস্র ধনুলুলু ভনুলুলু চনুলুলুর রাজনৈতিক জ্যোতিষের ভবিষ্যদ্বাণীতে কাগজের পাতা ভরে উঠতে থাকে। তাগো লগে পরতিজোগিতা লাগায় আমাগো রাস্তার গলাকাইট্যা জোড়ালাগাইনা ফালফারা বাকবাকম ম্যাজিশিয়ানটা (সে কয়েক ডিগ্রি এগিয়ে যায়, তার হস্তগণনা পত্রিকায় না দিয়া বাক্সের ভেতরে বাক্স তার মইধ্যে আরো বাক্স তার মইধ্যে আরো বাক্স তার মধ্যে আটকাইয়া রেখে আসে ইংরাজি খবরের কাগজের অফিসের লোহার সিন্দুকে), আমলিগোলার পানিপড়ানি বুড়ীটা, ধলেশ্বরীর ফেরিঘাটের দাঁতের মাজনের ক্যানভাসারটা, এমনকি টানবাজারের তিনচারটা দেহশিল্পীও ভবিষ্যদ্বাণী করে। ওপরের পূর্বাভাসটি অত্যান্ত খুবই আপত্তিকর লাগে শক্তির উৎসবাদীদের কাছে, লাগনেরই কথা, তাঁরা এর তীব্র নিন্দা করেন; পরের দিনই আমরা খবরের কাগজে আরেকখানা বিজ্ঞানসম্মত পূর্বাভাস পাই,

যাতে হস্তরেখা আরো বৈজ্ঞানিকভাবে গণনা করা হয়েছে। এই পূর্বাভাসটির খুবই উচ্চ প্রশংসা করেন উৎসবাদীরা, আর খুবই নিচ্চ নিন্দা করেন জনগণমন গণতন্ত্রবাদীরা।

বিশুদ্ধগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জ্যোতিষীসংঘের অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত (শক্তির উৎসবাদীদের মতে) পূর্বাভাসটি নিম্নরূপ :

উচ্চবিত্তের মতে প্রাপ্ত আসন মধ্যবিত্তের মতে প্রাপ্ত আসন নিম্নবিত্তের মতে প্রাপ্ত আসন গড়ে প্রাপ্ত আসন

জনগণমনবংশ	১৫০	১৬০	১৬৫	১৫৮
শক্তির উৎসবংশ	৯০	৮০	৮৫	৮৫
খোজাবংশ	১৫	২০	১২	১৫.৬
রাজাকারবংশ	১০	৮	৬	৮
অন্যান্য বংশ	৫	২	২	৩
মোট আসন	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০

দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক শ্রেণীতে অংশ নিয়েছেন ৮০০ ভোটার।

এরকম স্তম্ভিত ভবিষ্যদ্বাণীতে, হস্তগণনায়, সংখ্যাতত্ত্বে, ময়না টিয়া শালিক টুনটুনির পোস্টকার্ড পাঠে, ঝাঁটা খড়ম বাটি সিঁড়ি বঠি চালানে আমরা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতে থাকি।

সব ধরনের রাজনৈতিক জ্যোতিষীদের মধ্যে প্রচণ্ডতম সাড়া জাগান এক অভিনব ধারার রাষ্ট্রবিজ্ঞান জ্যোতিষীরা, যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন নন্দনতাত্ত্বিক নির্বাচনবিজ্ঞানী। এই

ধারার রাষ্ট্র ও নির্বাচনবিজ্ঞান নাকি এখন খুবই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে উন্নত সেক্সি গণতন্ত্রগুলোতে; আমরা এখনো তার খবর পাই নি, কয়টা ভালো খবরই আর আমরা পাই একশো দুইশো বছর কাটনের আগে; তাঁদের তত্ত্ব হচ্ছে ভোটাররা আর শুধু ইশতেহার ও গলাবাজি শুনে ভোট দেয় না, ওই সব পচা ইশতেহার পড়া আর গলাবাজি শোনার থেকে তারা এক্সএক্সএক্স দেখতে বেশি পছন্দ করে; তারা ভোট দেয় (অন্তত ৪০%) ক্যান্ডিডেটদের পোশাকের রঙ, চিবুকের ভাঁজ, বক্ষের উচ্চতা, চুলের বিন্যাস, কণ্ঠস্বরের মাদকতা, ঠোঁটের বিস্তার, হাসির ঝিলিক–এককথায় তাদের যৌনাবেদন অনুসারে। যার যৌনাবেদন যতো বেশি তিনি ততো ভোট পান। তাঁরা ডিগ্রি দিয়ে সেক্স অ্যাপিল (এসএ) পরিমাপের পদ্ধতিও বের করেছেন; যাঁদের এসএ ৭৫ ডিগ্রির ওপরে, তাঁরা স্টারমার্কপ্রাপ্ত, তাদের জয় নিশ্চিত, ভোটাররা তাঁদের ভোট দেয়ার জন্যে ভোরের আগেই ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়; যাদের এসএ ৫০ ডিগ্রির নিচে, তারা শুধু ফেল নয় তাঁদের জামানত বাজেয়াপ্তি অবধারিত, আগামী নির্বাচনেও তাদের কোনো সম্ভাবনা নেই। ওই সব দেশে সেক্স অ্যাপিল না থাকলে হ্যামবার্গারের মতো আকর্ষণীয় খাদ্যও বিক্রি হয় না, আর রাজনীতিবিদরা তো পচা বাসি খাদ্য, তাঁদের কে খায়? তারা আরো জানান যে সারা দুনিয়াতেই রাজনীতিবিদদের এসএ কমে যাচ্ছে, জনগণ তাই রাজনীতিতে ভোটে নির্বাচনে আস্থা হারিয়ে ফেলছে; পৃথিবীতে শিগগিরই রাজনীতিক সংকট দেখা দেবে। তাদের কাছ থেকে আমরা আরো জানতে পারি এখন সবচেয়ে কম এসএ আছে আরব আর ইউরোপের রাজা রানী রাজপুত্র রাজকন্যাদের, এবং আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের লৌহমানবদের। তাদের এসএ .০০৫°। নন্দনতাত্ত্বিকদের তত্ত্ব ও বিশ্লেষণপ্রণালি হৈচৈ বাঁধিয়ে দেয় এজন্যে যে আমাদের ইসলামি রাষ্ট্রে, যার ছেঁড়াফাড়া সংবিধানের শুরুতে আল্লাতাল্লার নামে সব কাম করনের কথা বলা হয়েছে, যাকে আমরা ফজরে জোহরে মাগরেবে আসরে আফগানিস্থান সৌদি আরব করে তোলার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছি, সেই পবিত্র ভূমিতে

ক্যান্ডিডেটদের যৌনাবেদন বিচার ধর্মসম্মত কি না। একদল ফতোয়াবাজ ওই বিজ্ঞানীদের পাছায় ৪০টা দোররা লাগানোর ফতোয়া দেয়, আরেকদল তাদের ফাঁসিতে ঝোলানোর সিদ্ধান্ত জানায়। তবে নন্দনতাত্ত্বিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সীমা পেরিয়ে যান না তারা শয়তানের ভাই নন, বুদ্ধিজীবী হলেও তারা বেশ বুদ্ধিমান, তাঁরা বলেন বাঙলাদেশের মতো দেশে, যেখানে যৌনাবেদন সম্পর্কে কথা বলা কপট ট্যাবো (ধর্ম রাখতে হইলে এইটা অত্যান্ত দরকার), সেখানে ওই আবেদন (এসএ) বিচার বা পরিমাপ না করলেও চলে; এখানে বিচারবিশ্লেষণ করা দরকার সৌন্দর্য; আর ধর্মে সৌন্দর্য খুবই প্রশংসিত জিনিশ। তাঁরা অজস্র কেতাব থেকে পাতার পর পাতা হাজির করে দেখান এই মহান ধর্ম সৌন্দর্যের প্রশংসায় মুখর, ভাতের পরই আমাদের ফুল। খাওনের কথা (গোলাপ ফুল? শাপলাফুল? কদুফুল? গন্ধরাজ? রজনীগন্ধা?); এই ধর্ম খ্রিস্টধর্ম নয়, যাতে নোংরা উকুনভরা ছালাপরা সন্তরা সৌন্দর্যের একনম্বর শত্রু। তারা দেখান যারা আচরণে স্বভাবে কথায় (অনিবার্যকারণে শরীরের কথা তারা উল্লেখ করেন না) সুন্দর নন তাঁরা হৃদয়েও সুন্দর নন; আর তারা ক্ষমতায় আরোহণ (আরোহণ শব্দটি লক্ষণীয়) করলে সব কিছুকে অসুন্দর করে তুলবেন। একেই দেশে সুন্দরের অত্যন্ত অভাব, আগামীতে বাকিটুকুও আর থাকবে না।

নন্দনতাত্ত্বিক নির্বাচনবিজ্ঞানীরা তাদের পাহাড়ের সমান তথ্যের, এইভাবে সেইভাবে চিকাৎ করে উপস্থাপিত উপাত্তের, ওপরে নিচে ডানে বায়ে কোণাকোণি কম্পিউটারকৃত স্তম্ভ ও সারির, যে-ব্যাখ্যা দেন, তাতে আমরা জনগণরা ভয় পেয়ে যাই। আমাদের মনে হইতে থাকে তারা আমাদের মনের কথা বলতেছেন।

তাঁদের স্তম্ভ আর সারিগুলো সরলভাবে আমরা নিচে তুলে ধরছি :

	নোংরা	বেশি নোংরা	অতিশয় নোংরা
আমাদের রাজনীতিবিদদের আকৃতি (পেট ইত্যাদি)	৮০.২%	৭০.৪%	৫০.৭%
মুখের গঠন	৮৫.৫%	৭২.৩%	৬৫.৩%
মুখভঙ্গি (বক্তৃতার সময়)	৯০.৫%	৭৬.৮%	৭৭.৫%
হাঁটার ভঙ্গি	৮৯%	৮৭.৮%	৭৮%
থুতু ফেলা (বক্তৃতার সময়)	৯৫%	৮৮.৬%	৭৯.৬%
বক্তৃতা (কমপক্ষে ৩৪০ জনের জনসভায়)	৯৯.৯৯%	৮৯.৯%	৮০.৬%
ভাষা (সব সময়)	৯৮.৮৮%	৯২.৬%	৮৫.৬%

দ্রষ্টব্য : ৪০, ৬৯০জন ভোটারের মত বিশ্লেষিত হয়েছে।

ওপরে সামান্য একটু নমুনা দেয়া হলো মাত্র।

তাঁরা পাঁচ বছর আগের সাথে পাঁচ বছর পরের এই অবস্থার ফালাফালা ছিড়াফাড়া তুলনা করেন, রাজবংশগুলোর মহাদেশনেত্রী মহাজননেত্রী রাজপুরুষ এবং আর যা যা যা আছে, তা তা তা তুলনা করে দেখান এই বছরের ইলেকশন হচ্ছে অসুন্দরের সাথে অসুন্দরের, নোংরার সাথে নোংরার, আবর্জনার সাথে আবর্জনার, কুৎসিতের সাথে কুৎসিতের কম্পিটিশন। তারা দেখান পাঁচ বছর আগে তাঁদের চোখেমুখে সৌন্দর্য ছিলো, ঠোঁটে গ্রীবায় হাসিতে উদ্যত ও উদ্ধত মুষ্টিতে সৌন্দর্য ছিলো; বছরের পর বছর একটা লোমশ দৈত্যের সাথে লড়াই করে তাঁরা সৌন্দর্য অর্জন করেছিলেন; কিন্তু গত পাঁচ বছরে তাঁদের সেই সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে, পচে গেছে। তাঁদের নিজেদের মুখে এসে ভর করেছে দৈত্যের মুখের অসৌন্দর্য, বেহায়া বেহায়া ভাব তাদের মুখ জুড়ে, পচন বেয়ে বেয়ে পড়ছে তাদের অবয়বে। তাদের কারো মুখে নির্মল হাসি নেই, তাদের হাসি এখন উঁচু চোয়ালের বিকৃতি

মাত্র; তাঁদের প্রত্যেকের চিবুক ভেঙে পড়েছে, গাল থেবড়ে পড়েছে, গলকম্বল ঘেঁড়া ছালার মতো ঝুলে পড়েছে, চোখের নিচে বস্তির ঘরের ধুলকালি জমেছে; তাদের হঠাৎ দেখলে সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে যায়, তাদের ছোটা ছোটো দৈত্য মনে হয়। নন্দনতাত্ত্বিক নির্বাচনবিজ্ঞানীরা দেখান মহাদেশনেত্রী মহাজননেত্রী রাজপুরুষরা অব্যবস্থিত (শব্দটির অর্থ বুঝতে আমাদের রাজপুরুষদের পাঁচ দিন সময় লাগে) হয়ে পড়েছেন; পাজেরো থেকে নামতে তাদের জামাকাপড়শাড়িসায়া পাজেরোর দরোজায় আটকে যাচ্ছে, উঠতে গিয়েও আটকে যাচ্ছে, মঞ্চেও আটকে যাচ্ছে। তাদের ভাষাও বদলে গেছে, গলগল করে ঝরছে তাদের মুখ থেকে অপভাষা, বলা যেতে পারে তারা একটি অভিনব রাজনৈতিক অবহট্ঠ রাষ্ট্রভাষা জন্ম দিয়েছেন, যা ৮৫০ সালের পর এই প্রথম ঘটলো; তারা এবার কথা বলার থেকে চিৎকার বেশি করেন, নিজেদের কর্মসূচির থেকে অন্যের নিন্দে বেশি করেন; তাঁদের ভাষায় চলতি বাঙলা অশ্লীল শব্দ ১০%, আঞ্চলিক অশ্লীল শব্দ ২৮%, ইংরেজি অশ্লীল শব্দ ১৭%, আরবিফার্সি গালাগাল ১৫%। তাঁরা দেখান যে আমাদের রাজপুরুষদের বক্তৃতায় কোনো বক্তব্য নেই, সেগুলো নিরর্থক চিৎকার।

নন্দনতাত্ত্বিক নির্বাচনবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেন এবারের নির্বাচন হবে কদর্যের সাথে কদর্যের প্রতিযোগিতা, লোভের সাথে লোভের প্রতিযোগিতা; আর জনগণকে ভোট দিতে হবে ওই কদর্যের বাক্সে ওই লোভের বাক্সে।

আমরা জনগণরা ভয় পেয়ে যাই, ডরে কাঁপতে থাকি।

এদিকে আবার কতকগুলো আজেবাজে সমাজবিরোধী গাঁজাখোর মাদকসেবী বিকারগ্রস্ত বেকার, যারা এমএ এমএসসি এমএজি এমবিবিএস ইঞ্জিনিয়ারিং আর আর হাবিজাবি পাশ

করেও বছরের পর বেকার পড়ে আছে (বেকার থাকবে না ক্যান এইসব না পইড়া সৌদি গিয়া চাকর থাকলেই পারতো, মুসলমান ভাইগো গুতা খাইলেই পারতো, সোয়াব হইতে), তারা একটা কাগজ ছাপিয়ে দিয়েছে। বেকাররা সৌন্দর্যের কী বোঝে, তাই তারা সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামায় নি; তারা পুরোনো কালের টোলের পণ্ডিতদের মতো রাজপুরুষদের নীতি আদর্শ সততা অসততা শিক্ষা অশিক্ষা এই সব অপলিটিকেল ব্যাপার সম্পর্কে জনগণের মত নিয়ে গবেষণা করে ফলাফল আমাগো মতো গরিব জনগণরে জানাই দিয়েছে। আজকাল গবেষণায় বড়োই ছকাছকি, বড়োই স্তম্ভান্তম্ভি; দেখতে পাই আমাগো বেকাররাও হনুলুলু না গিয়াও ওই সবে কম যায় না। তয় এইসব শিক্ষা অশিক্ষা সততা অসততা নিয়ে বাড়াবাড়ি ঠিক হয় নাই, শত হইলেও তারা রাজপুরুষ, তারাই ছিলো তারাই থাকবো; শিক্ষা না থাকলেও তাঁরা শিক্ষিত, মানতে হইবো; সততা না থাকলেও তারা সৎ, এইটা মেনে লইতে হইবো। এমন কোন দেশ আছে, যেখানে পলিটিক্সের জন্যে শিইক্ষ্যা দরকার হয়? পটেটো শব্দের বানান, করতে পারে, এমন কয়টা প্রেছিডেন্ট ভাইছপ্রেডিডেন্ট আছে আমরিকায়? দুনিয়ায় এমন কোন রাষ্ট্র আছে, যেখানে পলিটিক্সের জইন্যে সৎ হইতে হয়? এইগুলি তো পুরানো কালের পণ্ডিতগো কথা। বেকার বাজানরাও অনেকগুলো স্তম্ভ আর সারি ছেপে দিয়েছে; সেইগুলিরে আবার ভাজাভাজা করে ব্যাখ্যাও করেছে। তাদের স্তম্ভ আর সারিতে এই রকম জিনিশ পাওয়া যায় :

আমাদের রাজনীতিবিদগণ	নারীদের মতে	পুরুষদের মতে	ছাত্রদের মতে
অশিক্ষিত	৯০.২%	৮৮.৪%	৯৯.৯%
মিথ্যেবাদী	৯৫.৭%	৮৬.৩%	৯৯.৯%
কপট বা ভণ্ড	৯৭.৫%	৮৬.৮%	৯৯.৫%
ঘুষখোর	৯৭%	৯৬.৬%	৯৯.৬%

অনৈতিক ৯৭.৯৯% ৭৮.৯% ৯৯.৬%
ক্যাডারদের গডফাদার ৭০.৮৮% ৭৩.৬% ৯০.৬%
ধর্মভিনেতা ৯৯.৯% ৯৭.২% ১০০%
দ্রষ্টব্য : ৩৩,৪২৬ জন ভোটারের মত বিশ্লেষিত।

তারা এমন আরো অনেক স্তম্ভ ও সারি করে; এবং করে নিম্নরূপ একটি বিশেষ ছক, যা দেখে আমরা পাগল হয়ে যাই :

প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতা/নেত্রীর যোগ্যতা হ্যাঁ না
অশিক্ষিত হবেন ১০০% ০০%
ফোর ফেল হবেন ৯৫% ৫%
এইট ফেল হবেন ৯২% ৮%
বিএ পাশ হবেন ১০% ৯০%
মাথায় ঘিলু থাকবে ৫% ৯৫%
'গণতন্ত্র' বানান করতে পারবেন ০০% ১০০%
যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন ১০০% ০০%
Xআত্মীয়দের মন্ত্রী শিল্পপতি বানাতে পারবেন ১০০% ০০%
সংসদে আসতে হবে ০০% ১০০%
দ্রষ্টব্য :৩৩, ৪২৬ জন ভোটারের মত বিশ্লেষিত। Xচিহ্নিত সারিটি শুধু প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আমরা তাদের স্তম্ভ ও সারির একটা ছোট্ট টুকরো মাত্র এখানে দিলাম, এতেই বোঝা যায় আমরা কতোখানি পাগল আর কততখানি সুস্থ আছি।

জঙ্গলের গাছপালা শুকনো নদীনালা খাল বিল পাটক্ষেত ভাঙা ব্রিজ আকাশবাতাস ডুমুরফল তেতইল শাদা বাইগন কলমিলতা কচুর লতি শাপলাফুল বিশতলা টাওয়ার সিনেমাহলের কাছে, গরুবলদ নৌকোবৈঠা ধানক্ষেত খালবিল সুপারমার্কেট রুমকুলার বস্তি প্রেসক্লাবের কাছে, ময়মুরুব্বি ক্যাডার ভোটার ডিফল্টার শিল্পপতি স্মাগলার পলিটিশিয়ানদের কাছে মাফ চেয়ে, আর বগা পানি কালা পানি আকাশের মেঘ পুকুরের মরা শোলগজার ইরিধান পাজেরো এনজিও বস্ত্রবালিকা ট্যাক্সফি গাড়ি কাটারাইফেল ককটেল জর্দার কৌটারে সাক্ষী রেখে কিছু কথা বলতে হচ্ছে আমাদের, কিন্তু কারা ওই কথাগুলো বললো, কাদের বললো, তাদের নাম আমরা বলতে পারবো না। আমরা আরো কিছুকাল বেঁচে থেকে বাজারের চায়ের দোকানে বসে ক্যান্ডিডেটগো খরচে চা খেতে চাই, নেতাগো বাক্সে ভোট দিতে চাই, নেতাগো নামে শ্লোগান দিতে চাই, গেইট সাজাতে চাই; এতো তড়াতড়ি ভেস্তে যেতে চাই না, সেইখানে যতোগুলি হুরিই নাচুক আর মিঠাপানির ঝরনাই কলকল করে বহুক আর খাজুরের বাগানে খাজুরই পাকুক। পশ্চিমে আমরা পাঁচবার মাথা ঠুকি, তাতে কোনো কাজ হয় না; আর পশ্চিমারা আমাদের পথ দেখায়, তাতে কাজ হয়–আর কতোকাল যে দেখাইবো; এইখানে আমাদের পশ্চিমাদের দেখানো পথেই চলতে হবে আরো কতোকাল যে চলতে হইবো। এবিসি বিবিসি সিএনএনে মাঝেমাঝেই দেখি খুনি মাফিয়া ধর্ষণকারীর সাক্ষা কার নেয়া হচ্ছে, খুব ভোলামেলা কথাবার্তা, খুনিরা মাফিয়ারা ধর্ষকারীরা মন খুলে একের পর এক সত্য কথা বলছে (আমাগো রাজনীতিবিদেরাও এতোটা মন খুইল্যা কথা বলেন না), কেনো খুন করলো একটার পর একটা ধর্ষণ করলো বলিভিয়া। নিকারাগুয়া থেকে ড্রাগ চালান দিতে গিয়ে কতোজনকে সরিয়ে দিতে হলো, সব বলছে; কিন্তু টিভির

পর্দায় তাদের মুখ দেখানো হচ্ছে না, মুখের ওপরে একটা শাদা বা কালো। চলন্ত ঢাকনা সব সময় ছড়িয়ে রাখা হচ্ছে–এটা সাংবাদিক নৈতিকতা, তারা সত্য বের করবেন, কিন্তু সত্যবাদীদের ধরিয়ে দেবেন না, সত্য বের করা তাদের কাজ, ধরিয়ে দেয়া তাদের কাজ না। এইসব বুদ্ধি পশ্চিমা ইহুদি কাফেরদের মগজেই আসে; আমরা এতে সত্যটা জানতে পারি, সত্যগুলো যারা ঘটায় শুধু তাদের মুখ দেখতে পাই না। মুখ দেখার দরকার নেই; মুখ দেখা আসল কথা না, আসল কথা হচ্ছে সত্য; সত্য দেখা, সত্য জানা।

এই পদ্ধতিতে কিছু সত্য আমরা প্রকাশ করতে চাই।

এক রাজবংশের কখ (এটা হচ্ছে নামের ওপর শাদা ঢাকনা, এর পরেও এমন ঢাকনা আরো ব্যবহার করা হবে) মোল্লা (এই বংশপরিচয়ও ঢাকনা, এর পরেও এমন ঢাকনা আরো ব্যবহার করা হবে), গঘ চাকলাদার, গুচ মিয়া ও আরো কয়েক নেতা তাঁদের প্রধান ক্যাডারদের সাথে বসেছেন, দেশের পাঁচ বিভাগের পাঁচতারা ক্যাডাররা তাতে যোগ দিয়েছে, তারা তাদের কর্মপদ্ধতি বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

কখ মোল্লা বলেন, এইবার কি স্ট্র্যাটেজি নিতে হইবো, তা তোমরা নিচ্চয়ই বুঝতে পারতেছে; উইপন থাকবো, কিন্তু উইপনের ইউজ হইবো না।

এক ক্যাডার জিজ্ঞেস করে, কিন্তু যদি ফেইল্লা দেওনের একশো পার্ঘেন্ট দরকার হইয়া পড়ে, তখন কি করুম, স্যার?

গঘ চাকলাদার বলেন, তখন বুইজ্যাশুইন্যা কারবার করবা; তবে মনে রাখবা এইবার ফেইল্লা দিলে ইমেজ নষ্ট হইয়া যাইবো।

এক ক্যাডার বলে, আমার জামার তলে যখন কাটারাইফেল থাকে, তখন আমার বুইজ্যাশুইন্যা করনের কিছু থাকে না; ওই রাইফেল নিজেই বুইজ্যাশুইন্যা কাম করে।

কখ মোল্লা বলেন, মাথাডাও একটু খাটাইতে হইবো, খালি উইপন দিয়া ত পলিটিক্স হয় না, মাথাডাই হইলো আসল উইপন।

ঙচ মিয়া বলেন, তোমরা হইলা আর্মির মতোন, আর্মি যেমুন ডিসিপ্লিন মাইন্যা চলে তোমরাও তেমুন ডিসিপ্লিন মাইন্যা চলবা; যখন তোমাগো ফেইল্লা দিতে বলা হইবো। তখন ফেইল্লা দিবা, আবার যখন জনগণরে স্যাবা করতে বলা হইবো, জনগণের পায়ে হাত দিয়া তাগো মন জয় করতে বলা হইবো, তখন পায়ে হাত দিয়া মন জয় করবা। এইবার হাতেপায়ে ধরতে হইবো, দেখতে পাইতেছে না আমরা দিনরাইত হাতে পায়ে ধরতেছি।

এক ক্যাডার জানতে চায়, ইনভার্সিটির হলগুলিতেও কি আমরা হাতেপায়ে ধইর‍্যা চলুম, ছাইড়া দিতে বললে ছাইড়া দিমু?

গঘ চাকলাদার শিউরে ওঠেন, থরথর করে কেঁপে চিৎকার করে ওঠেন, না, না,; তা করবা না; ইনভার্সিটি হইলো আসল বাঙলাদ্যাশ, ওইটা দখলে থাকলে বাঙলাদ্যাশও দখলে থাকবো। হলের একটা কোণাও ছাড়বা না।

কখ মোল্লা বলেন, ইনভার্সিটি আর সারাদ্যাশের মধ্যে ফারাক আছে; দ্যাশে গ্যারামে লাশ ফেলনে বিপদ আছে; ইনভার্সিটিতে লাশ ফ্যাল্লে ক্ষতি নাই, ওইটা হইলো আউট অব বাউন্ড, দারোগা পুলিশ জজ ম্যাজিস্ট্রেটের বাইরে, ওইখানে আমাগো ছাত্ররা শহীদ হয় অমর ইয়, মরে না, মামলামকদ্দমা হয় না। ওতে ইলেকশনের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট হয় না, ইলেকশনের নিরপেক্ষতা নষ্ট হয় না।

ঙচ মিয়া বলেন, মালাউনগুলিরে ডরের মইধ্যে রাকতে হইবো, অইগুলিই আমাদের পার্মানেন্ট এনিমি; এমন করব যাতে ভোটের দিনে তারা খুশি হইয়া নিজেগো বাড়িতে বইস্যা থাকে, ভোট দিতে না যায়। জানই ত মালাউনগুলিরে বিশ্বাস নাই। অইগুলি ট্যাকাপয়সা ইন্ডিয়া পাঠাইয়া দ্যায়, দ্যাশটারে ইন্ডিয়া বানাইতে চায়। পাকিস্থান অরাই ভাঙছে, এই দ্যাশটারেও ভাঙতে চায়।

কখ মোল্লা বলেন, তাগো বাড়িতে বসাই রাখনের জইন্যে একটা বাজেট করবা, বিনা পয়সায় বাড়িতে বসাই রাখন যাইব না, যদি কিছু মালপানি হাতে পড়ে তয় খুশি হইয়াই বাড়িতে বইস্যা থাকবো।

এক ক্যাডার বলে, অইগুলি খুব ঠ্যাডা, মালপানি নিতে চায় না।

গঘ চাকলাদার বলেন, দুই একটা মালাউনরে দলে টাইন্যা আনবা, তাগো ন্যাতা বানাইয়া ফেলবা, আমাগো পক্ষে বকতিতা দেওয়াইবা। দ্যাশে নিশ্চই দুই চাইরটা ছাগেশ্বর পাঠেশ্বর কালিপদ খালিপদ পাইবা।

এক ক্যাডার বলে, মালপানি ছাড়াও তাগো বাড়িতে বসাই রাখন যায়; অইগুলিরে মালপানি দেওন ট্যাকাকড়ি গাঙে ফেলন।

ঙচ মিয়া জিজ্ঞেস করেন, সেইটা কিভাবে?

ওই ক্যাডার বলে, পাঁচ বিভাগ থিকা পাঁচ দশটা মাইয়ারে ধইর‍্যা নিয়া রেপ কইর‍্যা ছাইরা দিলেই হয়, তাইলে ডরেও তারা ঘর থিকা বাইর হইবো না।

কখ মোল্লা বলেন, না, না, এখন রেপটেপে যাইবা না, বাবারা; আমাগো দারোগা পুলিশ বাবারাই সেই কাম কইর‍্যা চলছে, তোমাগো করনের কাম নাই।

কখ মোল্লা একটু উত্তেজনা বোধ করেন।

এক ক্যাডার বলে, কিন্তু ছার, ক্যাডাররা সব সময় টেনশনে থাকে, টেনশন রিলিজ করনের লিগা যেমুন মাঝেমইদ্যে কাটারাইফেল খালাশ করতে হয়, তেমুনই মাঝেমইদ্যে রেপ করনের দরকার হয়।

গুচ মিয়া বলেন, ক্যান বাবারা, আইজকাইল হোটেলে পার্কে এতো হাই ক্লাশ কলগার্ল সিনেমার অ্যাকস্ট্রা পাওয়া যায়, ইনভার্সিটি কলেজের এডুকেটেড মাইয়াও পাওয়া যায় শুনি, রেপ করনের কি দরকার।

আরেক ক্যাডার বলে, রেপ ছারা, ছার, টেনশন রিলিজ হয় না, এই বয়সে আপনে তা বোঝাতে পারবেন না।

তারা কয়েক ঘণ্টা ধরে তাদের কর্মপদ্ধতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন, এবং সমগ্র কর্মপ্রণালি গ্রহণ করেন।

আরেক রাজবংশের চছ শিকদার, জঝ আহমদ, ঞট শেখ, ঠড খা ও কয়েক প্রধান নেতা কর্মসূচি গ্রহণের জন্যে বসেন তাদের পাঁচ বিভাগের পাঁচতারা ক্যাডারদের নিয়ে।

চছ শিকদার বলেন, বাবারা তোমরা জানই যে এইবারের ইলেকশন আমাগো মরনবাচনের ইলেকশন, আমরা মইরা আছি এইবার বাঁচতে হইবো, উইন আমাগো করতে হইবোই; এইবার কোনো ভুল করন চলবো না।

এক ক্যাডার বলে, আমাগো যেই কাম দিবেন, আমরা জান দিয়াও তা কইরা দিমু জানের আর কোনো দাম নাই। পাওয়ারে যাইতে চাই, পাওয়ারের বাইরে থাকতে থাকতে ঘুম ভুইল্যা গেছি।

ঠড খাঁ বলেন, প্রথম দরকার হইলো তোমাগো মইধ্যে ঐক্য, ইউনিটি; তোমরা নিজেরা খুনাখুনি করলে আমাগো সব শ্যাষ হইয়া যাইবো। তোমাগো ইউনিটি ছাড়া দলের ভবিষ্যৎ নাই।

প্রধান ক্যাডার বলে, আমরা ইউনিটি ইস্টাবলিশ করছি, আর নিজেগো মইধ্যে ফাইটিং হইবো না। ইলেকশনই এখন আমাগো আসল কাম।

জঝ আহমদ বলেন, পাওয়ারে না থাকলে কিছুই করন যায় না দ্যাখতেই পাইতেছ; অরা রাইফেল দিয়া দ্যাশ দখল কইর‍্যা পাওয়ারে বসলো, ভোটের বাক্স চুরি কইর‍্যা পাওয়ারে রইলো; ন্যাতারা লাল হইয়া গেলো, ক্যাডাররা লাল হইয়া গেলো। অগো ন্যাতাগো ইস্পেইন ফ্রান্স সুইজারল্যান্ডে ওয়াশিংটনে প্যালেস আছে, ক্যাডাররা লম্বা লম্বা নিশান পাজেরো চালায়, বনানীতে দুই বিঘার উপর প্যালেস বানায়, টাওয়ারে টাওয়ারে তিন চাইরটা কইর‍্যা ফ্ল্যাট কিনে দুই তিনটা বউ আর মিস্ট্রেস রাখে, চাইয়া দেখ তোমাগো কি আছে আমাগো কি আছে? কিছু নাই।

এক ক্যাডার বলে, পাওয়ারই আসল কথা; কাটা রাইফেল দেখাইয়া আর কতটা করন যায়, পাওয়ার হইল হাজারটা কাটা রাইফেলের সমান। চাইর দিক থিকা ট্যাকা আসতে থাকে।

আরেক ক্যাডার বলে, যতজনরে ফালাই দিতে কইবেন ফালাই দিমু।

হাহাকার করে ওঠেন গ্রুট শেখ, বলল কি বলো কি, এমন কথা বলার সময় এইটা না; গেরিলা ফ্রিডম ফাঁইটারের স্পিরিট তোমাগো এখনো গ্যালো না; যাইবো কেমনে, তোমরা হইলা ফ্রিডম ফাঁইটার, তবে তোমাগো মনে রাকতে হইবো এইটা নাইন্টিন সেভেনটি ওয়ান না, এইবারের যুদ্ধ অন্যরকম। না মাইর‍্যা যুদ্ধু করতে হইবো, বাঁচাইয়া যুদ্ধু করতে হইবো, হাতেপায়ে ধইর‍্যা যুদ্ধ করতে হইবো। এইটা ভোটের যুদ্ধু।

চছ শিকদার বলেন, এইবারের পলিটিকেল ক্লাইমেটটা দেখতে পাইতেছ, বাতাস আমাগো দিকে। অনেক হাতেপায়ে ধইর‍্যা কাইন্দা কাইট্যা বাতাসরে আমাগো দিকে আনছি, তোমাগো দেকতে হইবো যাতে বাতাস অন্য দিকে না যায়, বাতাসরে গার্ড দিয়া রাখতে হইবো।

ঠড খাঁ বলেন, ইনভার্সিটির হলগুলিরে দখলে রাকতেই হইবো, একটুও ছারন যাইবো না, ইনভার্সিটিই হইলো দ্যাশের পাওয়ার সেন্টার, সারাদ্যাশ এই দিকে তাকাইয়া থাকে, যাগো ইনভার্সিটি তাগোই দ্যাশ।

এক ক্যাডার বলে, অগো আর হলে ওটতে দিমু না, একবার বাইর করছি ত করছিই, ওটতে চাইলে লাছ পরবো।

চছ শিকদার বলেন, শুনতে পাইছি অরা এইবার আমাগো ভোটব্যাংক হিন্দুভাইগো বাড়ি থিকা বাইর হইতে দিবো না, এইবার ট্যাকা পয়সা দিয়া তাগো আটকাইয়া রাখবো, তাতে না পারলে কাটারাইফেলের ভয় দেখাইবো। তোমাগো কাম হইবো তাগো ঠিক মতো পলিং ইস্টিশনে লইয়া যাওন। তাগো বুঝাইতে হইবো তোমরা আছো, হিন্দুভাইগো কোনো ভয় নাই। একটা ভোটও নষ্ট করন যাইবো না; একটা ভোটের দাম কোটি টাকা।

জঝ আহমদ বলেন, সাবধানে কাজ করবা; অগো দল থিকা যেই ক্যাডাররা আসছে তাদের উপর চোখ রাখবা; য্যান্ স্যাবোটেজ না করতে পারে।

কয়েক ঘণ্টা ধরে এরকম আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক আলোচনা হয়; তারা নির্বাচনকে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন।

একটা দেশে কতগুলো গণতান্ত্রিক রাজবংশ আছে, তা দেখেই বোঝা যায় ওই দ্যাশে পলিটিক্স আর ড্যামোক্রেসির কন্ডিশন কতোখানি সুপারফাইন। আমরা মূর্খ মানুষ, ইতর মানুষ, গরিব জনগণ, চড়ালের চাঁড়াল, বেশি কিছু জানি না, তবে এই কথাটা আমাদের মনে হইতেছে।

যেই দ্যাশে যতো বেশি রাজবংশ সেই দ্যাশে ততো বেশি ড্যামোক্রেসি। এই কথাটাও আমাদের মনে হইতেছে। এই কথাটা আগে অন্য কোনো মানুষজনের মনে হয়েছে কি না আমরা জানি না; তবে আমাদের মনে হচ্ছে।

যেই দ্যাশে রাজবংশগুলি যতো বেশি একে অন্যরে পুঙ্গির ভাই হৌরের পো সমন্ধির পুত আর আর প্রিয় আদরের নামে ডাকে, সেই দ্যাশে গণতন্ত্র তত বেশি বিশুদ্ধ ততো বেশি পারফেক্ট।

আমাগো দ্যাশে ড্যামোক্রেসি যেমন বেশি তেমনি পারফেক্ট।

আমাদের দেশে খালি চারখানা রাজবংশ নাই; দেশে আরো অনেক ছেঁড়াফাড়া ভাঙাচোরা চ্যাপ্টা ছ্যাচালাগা কানা আতুর লুলা ধ্বজভঙ্গ রাজবংশ আছে।

দেশ ছোটো হইতে পারে, কিন্তু রাজবংশের অভাব নাই। দ্যাশ গরিব হইতে পারে, কিন্তু ড্যামোক্রেসির ঘাটতি নেই।

সেই সব রাজবংশের কথা বলা হয় নাই।

আমরা গরিব মানুষ, সাধারণ জনগণ, ইতর সাধারণ, দিন আনি দিন খাই, কোনো কোনো দিন আনতে পারি না খাইতেও পাই না, আমাদের গায়েগতরে গোস্ত নাই, মাথায় ঘিলু নাই; কতো রাজবংশের নাম মুখস্থ রাখবো? কত রাজপুরুষের নাম মাথায় রাখুম? রাজপুরুষরা তো চারদিকে পায়খানার পোকার মতো কিলবিল করেন। এমন হইতে পারে তাগো কথা একেবারেই মনেই আসে নাই, আবার এমনও হতে পারে যে তাদের কথা খুবই মনে পড়ছে, মিনিটের জন্যেও ভুলি নাই, কিন্তু বলনের দরকার বোধ করি নাই। বলে কী লাভ, সময় নষ্ট হইতো। আমাগো চোখে ওইগুলি আজকাল পকেটমাইর ছিচকা চোরের সমান হয়ে গেছে, আমরা দেশের মানুষজন ওইগুলিরে আর গণায় ধরি না।

ওইগুলি টিকে আছে মাঝেমইধ্যে ছোটোখাটো চুরিচামারি ছিনতাই করার জইন্যে। দেশে একটু আধটু চুরিচামারি ছিনতাই না থাকলে কোনো মজা থাকে না। ওইগুলি আমাদের মনে মজা দেয়।

অনেকগুলি রাজবংশ আছে, যেগুলির অফিসই নাই, ওই বংশের রাজপুরুষ তার বেডরুমে বসেই স্ত্রী (একবচনবিহুবচন) আর দুই চারজন গোমস্তা নিয়ে বংশ চালান। ব্যবসা মন্দ হয় না।

অনেকগুলি রাজবংশ আছে, যেগুলির অফিসে কবর, আর কবরে মাজার তৈরি হয়েছে। দেশে কবর মাজারের দাম অনেক। কবর আর মাজার দেখলে লোকজন দাঁড়ায়, জিয়ারত করে, দুইচারটা পয়সা দেয়। ওই রাজবংশগুলির রাজপুরুষেরা কবরে মাজারে দাঁড়িয়ে দোয়াদরুদ পড়েন। ব্যবসা মন্দ হয় না।

মহান আল্লাতাল্লার রাজত্ব স্থাপনের জন্যে এখন দ্যাশে তিন চাইর শো রাজবংশ আছে। আল্লাতাল্লা আর তোক পাইল না। তাগো কাম শুক্রুবারে শুক্রুবারে শহরগুলিরে ময়লা করা। তাগো পায়খানা প্যাশাব কুলুপে শহর ভইর‍্যা যায়। মনে হয় আল্লাতাল্লাও তাগো চায় না। আমরা তো চাই-ই না।

এই আলমক্কিমদিনি আলবাগদাদি আলতেহেরানি রাজবংশগুলির ইবনে সৌদ ইবনে ফয়সল ইবনে পুটিমারা ইবনে কুচিয়ামারা বায়েতুল্লা রুহুল্লাদের প্রত্যেকের জীবন জবজবে ইতিহাসে ভরা, তাতে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ, তাতে অনেক চুরিচামারি বাটপারি, বলে শেষ করা যায় না; মানুষরে ঠকাইতে ঠকাইতে তারা আল্লারেও ঠকাইতেছেন বলে মনে হচ্ছে। আমরা মানুষরা ঠকি, তিনিও যে ঠকেন এইটাই আমাদের কেমন কেমন ধান্ধা ধান্ধা লাগে।

ইবনে পুঁটিমারা রাজবংশের কথাই একটু বলি।

এই মহারাজ একদা এক শহরে এক অফিসে এক রকমের পিয়ন আছিলেন। স্বভাবটা তাঁর ভালো ছিলো না–এগো স্বভাব কোনোদিনই ভালো না; সিকি আধুলির ওপর তার চোখ পড়ে থাকতো; একবার পিয়ন সাহেব অফিসের দশ হাজার টাকা (দশ হাজার! এখন মাসে

আয় তাঁর দশ কোটি) মেরে পুঁটিমারা পালিয়ে যান, তারপর তারে গুতিয়ে গুতিয়ে জেলে ঢুকোনো হয়। জেল থেকে বেরোনোর দশ বারো বছর পর তিনি ইবনে পুঁটিমারারূপে দেখা দেন।

সমস্ত প্রশংসা তারই প্রাপ্য।

এই মক্কিমদিনি তেহেরানি বাগদাদি পলিটিশিয়ানদের চলতি নাম পির (আমরা শুনতে পাই এই বিরাট কথাটার আসল অর্থ নাকি বুড়া; তাহলে কেমন হইলো?); তারা ইহকাল পরকাল সবকাল জুড়ে পলিটিক্স করেন, পরকাল দেখিয়ে ইহকালে পাজেরো টাওয়ার নারী আর আর জিনিশ করেন। পুঁটিমারা এখন এক প্রকাণ্ড পির, তার মেষ আছে কয়েক লাখ। মেষ আর কি, আমরাই; মেষ আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য কী। আমাগো কোটি কোটি ভেড়ার দ্যাশে কয়েক লাখ অবশ্য বেশি না, তবে শুনতে বেশি লাগে। মেষেরও বুদ্ধিবিচার আছে, আমাগো নাই; যদি থাকতো তাহলে কি ওই পিয়নের পাল্লায় পড়ি? পাজেরো হাঁকাই তাঁর বাড়ির দিকে? না, তিনি আর পিয়ন নন; তিনি ইবনে পুঁটিমারা, আলমব্ধি পলিটিশিয়ান।

মেষদের নিকট থেকে তিনি লাউডগা কচুর লতি শাপলা মুরগি মোরগ ছাগল গরু বাছুর বলদ দশ বিশ একশো পাঁচশো টাকার নোট গুণে গুণে নিচ্ছিলেন, তাদের পানসে খিচুড়ি খাওয়াচ্ছিলেন; ব্যবসা বেশ জমে উঠছিলো। আমাদের দেশে পাঁচ দশ বছর পর পর (বিশেষ করে যখন কোনো বড়ো ক্যাডার দেশ দখল করে) এমন একটা দেখা দেয়, জমিয়ে ব্যবসা করে, তারপর আরেকটা দেখা দেয়, আগেরটার ব্যবসা কমে, নতুনটার ব্যবসা জমে।

এমন সময় খোজারাজবংশের সম্রাট বাবর দেখা দেন। বড়ো ক্যাডাররা ধর্মের ঝান্ডা উড়াতে পছন্দ করেন, বাবর ধর্মের ঝান্ডায় দেশের সব ছাদ ভরে ফেলেন। বাবর খুঁজে পান পুঁটিমারাকে; এবং তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন একনম্বর রিলিজিয়াস পলিটিশিয়ান হিশেবে। বাবরের এইটা এক বড়ো কীর্তি।

বাবর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হুজুর, আমি আপনার দোয়া চাই। কীভাবে আপনার দোয়া আমি পাইতে পারি? আপনার দোয়া নিয়া আমি আগাইতে চাই।

পুঁটিমারা বলেন, নিয়মিত আমার দরগায় আসিবেন।

বাবর বলেন, আমি আসবো, হেলিকপ্টারে উড়ে আসবো; আমরা সঙ্গে জেনারেলরা সেক্রেটারিরা এডিশনাল সেক্রেটারিরা ব্যাংকের চেয়ারম্যানরা মেয়ররা পলিটিশিয়ানরা স্মাগলাররা আর যা যা আছে তারা পাজেরো নিশান টয়োটা মার্সিডিস চালিয়ে আসবে। আপনি দোয়া করবেন।

পুঁটিমারা বলেন, তাহলে অবশ্যই আমি দোয়া করিব।

বাবর বলেন, আমি এর থেকেও বেশি সেবা করতে চাই, তা কীভাবে করতে পারি? আপনার দোয়া নিয়া আমি মরন পর্যন্ত রুল করতে চাই।

পুঁটিমারা বলেন, আমার পুত্ররা তাহা আপনাকে বলিবে।

পুঁটিমারার চার বিবি আর অজস্র পুত্র; পুত্ররা সবাই বুদ্ধিমান।

একপুত্র বলে, পিতা স্বপ্নে দেখেছেন তিনি এইখানে একটি পবিত্র প্যালেস বানাইতেছেন। এই প্যালেস ইসলামের প্যালেস, এইটা বানাইলে সওয়াবের শেষ থাকবে না।

বাবর বলেন, তা অবশ্যই বানানো হবে, ছয় মাসেই হবে। প্যালেস ছাড়া দেশের উন্নতি নাই, ধর্মের উন্নতি নাই।

আরেক পুত্র বলে, বেহেস্তের আদলে আমরা একটি হাউজিং সোসাইটি করেছি, ওই হাউজিং সোসাইটির নাম জান্নাতুল ফেরদৌস। তার জন্যে ঢাকা শহরে দশ বিঘা জমি লাগবে।

বাবর বলেন, জমি পাবেন, আমরা জান্নাত চাই।

তার পাশেই মেয়র দাঁড়িয়ে ছিলেন; তিনি বলেন, স্যার, একটাকা দাম দিলে আইন রক্ষা পাবে।

বাবর বলেন, ওই টাকাটা অফিসে বাঁধিয়ে রাখবেন।

আরেক পুত্র বলেন, পিতা স্বপ্ন দেখেছেন আল্লার রহমতে দেশে অনেক তেল পাওয়া যাবে, তাই দশটি অয়েল ট্যাংকার কেনার জন্যে লোন চাই। বেহেস্তেও ট্যাংকার লাগবে।

বাবর দুইটা ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দিকে তাকান।

চেয়ারম্যান দুটি বলেন, এই সপ্তায়ই একশো কোটি টাকা দেয়া হবে।

এইভাবে তারা ধর্ম রাজনীতি অর্থনীতির সমন্বয় সাধন করেন। আমাদের ধর্ম কোনো সংকীর্ণ জিনিশ নয়, তা সর্বাঙ্গীন জীবনব্যবস্থা।

কিন্তু বাবরকে খোঁয়াড়ে ঢোকানোর পর ইবনে পুঁটিমারা বলেন, বাবর একটা খবিশ আছিলো, জেনাখোর আছিলো, সে হাবিয়া দোজগে যাইবে।

বাবর খোয়াড় থেকে বেরিয়ে বলে, পুঁটিমারা একটা শয়তান, আস্ত ইলিশ, সে আমার থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়েছিলো, সে ব্ল্যাকমার্কেট স্মাগলিং করতো; মদের ব্যবসা করতো। তারে আমি ছেড়ে দিলাম। এইবার আমি আসল পির ধরলাম, এইবার থেকে আমার পির ইবনে কুচিয়ামারা।

এই ধর্মীয় রাজনীতি দেখতে আমাদের বেশ লাগে।

এক সময় কাচিহাতুড়ির রাজবংশে আমাগো দ্যাশ ভরে গিয়েছিলো; আমরা গরিবরা মনে করেছিলাম আমাদের দিন আসলো। কিন্তু আমাগো দিন আর আসলো না, মনে হয় আমাদের দিন চিরকালের জইন্যে শ্যাষ হলো। কাচি দিয়ে অবশেষে পুচিয়ে পুচিয়ে নিজেদের গলা কাটলাম, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে নিজেদের মাথা আর কপাল ভাঙলাম। অথচ কতো স্বপ্ন ছিলো আমাদের; কত স্বপ্ন দেখিয়েছিলো আমাদের সেই সব রাজবংশ–মার্ক্সীয় রাজবংশ, লেনিনীয় রাজবংশ, মাওরাজবংশ; সেগুলো ভেঙেচুরে হলো

মার্ক্সীয়-আব্দুল রাজবংশ, মার্ক্সীয়-করিম রাজবংশ, মার্ক্সীয়-জব্বর রাজবংশ, লেনিনীয়-মোল্লা রাজবংশ, লেনিনীয়-খা রাজবংশ, লেনিনীয়-শেখ রাজবংশ, মাও-চৌধুরী রাজবংশ, মাও-কাজি রাজবংশ, মাও-সলিমদ্দি রাজবংশ; এইরূপ গণ্ডায় গণ্ডায় কুড়িতে কুড়িতে রাজবংশ। তারা গলা কাটতে কাটতে, ছেলেপেলেদের মরনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে, তারপর ভাঙতে ভাঙতে, তারপর আরো ভাঙতে ভাঙতে, চুরমার হ'তে হ'তে তারপর বড়ো ক্যাডারদের পা ধরতে ধরতে এখন তারা বড়ো ক্যাডারদের নোংরা বুটে পরিণত হয়েছেন। কিছু রাজপুরুষ অবশ্য পেরিয়ে গেছেন সবাইকে; তারা ছেলেপেলেদের শিখিয়েছিলেন সমাধান করো ধনীগুলোকে, একবারে সমাধান করে ফেলল, দেশে বিপ্লব ঘইটা যাইবে, দেশে চাষাগরিবের রাজত্ব আসবে, চাষা রাজা হবে কামলা রাজা হবে। তাদের কথায় ছেলেপেলেগুলো সমাধান হয়ে গেলো, শূন্য হয়ে গেলো লাশ হয়ে গেলো হাড় হয়ে গেলো, হাজার হাজার ছেলেকে আমরা খুঁজে পেলাম না, কিন্তু রাজবংশের বড়ো বড়ো রাজপুরুষেরা ধনী হয়ে গেলেন।

তাগো সব গল্প আর বলতে চাই না, দুই একটা ছোটগল্প এইখানে বলা যায়।

লেনিনীয়-খাঁ রাজবংশের বড়ো কাজ ছিলো মস্কো গিয়ে রোগের ফ্রি ট্রিটমেন্ট করানো। তাঁদের সর্দিকাশি হইলে, ছেলেমেয়েবউদের জ্বরজারি হলে অ্যারোফ্লোট জাহাজে উঠে তারা মস্কো চলে যেতেন, তাগো পয়সা লাগতো না; বিনাপয়সায় চিকিৎসা কইর‍্যা সুস্থ হয়ে ফিরে আসতেন। তারা ভালো ক্লিনিক পাইছিলেন, কিন্তু আমরা গরিবরা তা পাই নাই।

মস্কোর ক্লিনিকে শ্যাষ ট্রিটমেন্ট করতে যান ওই রাজবংশের একনম্বর পুরুষ কমরেড আলি আহাম্মদ।

অ্যারোফ্লোট জাহাজে উঠেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন; ঘুমের ভেতরে স্বপ্ন দেখেন যে এক অলি আউলিয়া তারে বলতেছেন তিরিশ বছর ধইর‍্যা আল্লারে না মাননের জইন্যেই তাঁর এই রোগ হইছে। এই রোগের নাম কাফেরি রোগ। আল্লারে না মানলে রোগ হইবোই। তার কাম হইবো মস্কো নাইম্যাই তোবা করন, আল্লার কাছে কান্দন; তাহলে তিনি মাফ কইরা দিবেন, তিনি বেঁচে যাবেন, ট্রিটমেন্ট লাগবে না, এইভাবেই ভালো হয়ে যাবেন।

ঘুম থেকে জেগে কমরেড আলি আহাম্মদ দোয়াদরুদ পড়তে থাকেন। তিরিশ বচ্ছরেও তিনি এইসব ভোলেন নাই।

মস্কোতে হাসপাতালে নেয়ার পর কমরেড আলি আহাম্মদ প্রথম যে-কথা বলেন, তা হচ্ছে, আমি তোবা করুম, মাফ চামু।

ডাক্তার তাকে কাটাছিড়ার জইন্যে নিতে চায়, কিন্তু তিনি বলেন, আমি তোবা করুম, মাফ চামু।

ডাক্তার কিছু বুঝতে পারে না; তার সঙ্গীরা খুব অবাক হন।

তাঁর এক সঙ্গী বলেন, কমরেড আলি আহাম্মদ ভাই, আপনের এখন অপারেশন দরকার; নাইলে বাচবেন না।

কমরেড আলি আহাম্মদ বলেন, আমি তোবা করুম। আল্লারে না মাইন্যা পাপ করছি, আমি মাফ চামু।

তাঁর সঙ্গী বলেন, কমরেড আলি আহাম্মদ ভাই, ক্লাসস্ট্রাগেল শ্যাষ হয় নাই, আপনাকে বাঁচতে হইবো, কার্ল মার্ক্স বলছেন আল্লা হচ্ছে গরিবগো জইন্যে তৈরি করা আফিম, ধনীরা ওইটা তৈরি কইর‍্যা গরিবগো খাওয়াইতেছে। আমরা গরিবগো একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

কমরেড আলি আহাম্মদ বলেন, আমি তোবা করুম, আল্লার কাছে মাফ চামু। আমারে আর ক্লাসস্ট্রাগল শুনাইও না, আমি তোবা করুম।

তিনি অপারেশন থিয়েটারে যেতে রাজি হন না।

কিন্তু কে তোবা করাইবো? একজন মওলানা দরকার তোবা করানোর জইন্যে। মস্কো শহর মওলানা কই? তবে একেবারে নাই, তা না; শহর ঘেঁটে একজন মওলানা নিয়ে আসা হয় তার জন্যে।

ওই মওলানার কাছে কমরেড আলি আহাম্মদ তোবা করেন। তোবা করনের পর তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে...রাজেউন)।

কমরেড আলি আহাম্মদ যখন অ্যারোফ্লেটে করে ফিরছিলেন তখন আমরা খবর পাই ওই দেশে আর সাম্যবাদ নাই; ওই দেশের রাজারা মাফ চেয়ে সাম্যবাদ ছেড়ে আবার। ধনীবাদ গ্রহণ করেছেন।

কমরেড আলি আহাম্মদের সঙ্গে ওই দ্যাশও তোবা করছে; মার্ক্স লেনিন স্ট্যালিনও তোবা করছে। জয়, ধনীদের জয়; দুনিয়ার ধনী এক হইছে।

শক্তির উৎসবাদীদের যখন আমরা ফালাই দিলাম, তখন আমরা যখন ঘরে ফিরে আসছিলাম, খুব একটা আন্দোলন করছি বলে যখন খুব সুখ পাইতেছিলাম, তখন শুনতে পাইলাম ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ডিফল্টার পাঁচ হাজার কোটি টাকার মালিক আবদুল মালেকের দালানে খুব গোলমাল হইতেছে।

গোলমাল হইতেছে হোক, তাতে আমাগো কি? এতো বড়ো একটা ফালানের ঘটনার পর ছোটোখাটো এক-আধটা গোলমাল তো হবেই।

খুব গোলমাল হইতেছে, বোমা ফাটতেছে, গুলি হইতেছে। ব্যাপারটা কি? আমরা কি একটু খবর লইতে পারি না? খবর লইয়া জানলাম মাও-সলিমদ্দি রাজবংশ অ্যাকশন করছে; ছোটোখাটো একটা বিপ্লব শুরু কইরা দিছে। আমরা খুশি হইলাম, আবদুল মালেকের শিক্ষা দরকার। ব্যাংক থিকা ট্যাকা নিয়া আর ফিরত দেয় নাই, খালি ট্যাকা বানাইতেছে।

পরে শুনলাম সলিমদ্দি আবদুল মালেককে সেলুলারে বলেছেন, অইটা কিছু না, ভয় পাইয়েন না।

মালেক বলেন, আমার ত ভয় লাগতেছে।

সলিমদ্দি বলেন, আপনের আরো বিপদ আছিলো, আরেক গ্রুপ আপনেরে সরাই দিতে চাইছিলো, আমি বাঁচাই দিলাম। ইউ আর নাউ ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেইড; উই আর উইথ ইউ।

মালেক বলেন, আমি আপনের কাছে গ্রেটফুল, আপনে আমারে বাঁচান, আপনের যা লাগবো আমি দিমু।

সলিমদ্দি বলেন, ক্লাসস্ট্রাগেলের জইন্যে উই নিড সাম মানি, আপনের পাঁচ হাজার কোটি আছে বইল্যা শোনতেছি, কোটি দশেক পাঁচটার মইধ্যে পাঠাই দেন। আপনের কোনো ভয় নাই।

মালেক বলেন, আমি নিজেই নিয়া আসতেছি।

সলিমদ্দি বলেন, একটা নতুন পাজেরোও আমাদের দরকার ক্লাসস্ট্রাগেলের জইন্যে, নতুন একটা নিশান পাজেরো নিয়ে আসবেন।

সলিমদ্দি এখন নিশান পাজেরোতে চড়ে ক্লাসস্ট্রাগেল করছেন। ক্লাসস্ট্রাগেল অনেকেই করতেছেন, তাদের উন্নতি হইতেছে।

এইবার সব দলের মুখেই রাহুর গ্রাসের দাগ; মনে হচ্ছে সকলের মুখই রাহু চুষে চুষে কালো করে দিয়েছে।

জনগণমন রাজবংশের মহাজননেত্রী খুবই চেষ্টা করছেন হাসি হাসি থাকতে, কিন্তু আমরা তার হাসির ভেতরে কী যেনো দেখতে পাই।

শক্তির উৎসবাদী রাজবংশের মহাদেশনেত্রী হাসতেই ভুলে গেছেন, তাঁর বিউটিশিয়ানরা দেশে ফিরে গেছে বলে হয়তো, হাসতে গিয়ে তিনি রেগে উঠছেন।

রাজাকার রাজবংশের আলি গোলাম কোনো দিন হাসেন না, হাসলে তার ভেতরের হায়েনাটি বেরিয়ে পড়ে, তাই এইবারও হাসেন না।

খোজাগণতান্ত্রিক রাজবংশের মহাজননেতা খোঁয়াড়ে, তার হাসার কথা না; শুনি তিনি মাঝেমাঝে খোঁয়াড় ভিজিয়ে কাঁদেন, আল্লারে ডাকেন।

আমাদের রাজবংশগুলি সভার পর সভা করছে, বৈঠকের পর বৈঠক করছে, দেশের গরিব মানুষদের ঘুমাতে দিচ্ছে না।

মহাজননেত্রীর সাথে বৈঠকে বসেছেন জনগণমন রাজবংশের প্রধান পুরুষেরা আবদুর রহমান, কলিমউদ্দিন মৃধা, নিজামউদ্দিন আহমদ, রজ্জব আলি, আবদুল হাই, হাজেরা আলি। তাদের মুখে একই সাথে আশা ও উদ্বেগ থমকে আছে; শরীরে ক্লান্তিও প্রচুর, খুবই খাটছেন তাঁরা, দৌড়োদৌড়ি করছেন দেশ জুড়ে, থামার সময় পাচ্ছেন না, ঘুমানোর সময় পাচ্ছেন

না। যেনো তারা সবাই দড়ির ওপর দিয়ে হাটছেন, আগেরবার হাঁটতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, এইবার পার হতেই হবে, পা চেপে হাঁটছেন, নইলে পড়ে যাবেন গভীর অতল গিরিখাতে যেখানে বাঘ হায়েনার পাল অপেক্ষা করে আছে। দাঁতনখ খিঁচিয়ে, তলিয়ে যাবেন ভয়ঙ্কর খরস্রোতা নদীতে যেখানে বিকট হাঁ করে অপেক্ষা করে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে কুমির হাঙ্গর। জনগণ কি তাদের দিকে এইবার একটু মুখ তুলে চাইবে না? জনগণ, প্রিয় জনগণ, কি এতো নিষ্ঠুর হবে? মনে হচ্ছে এইবার জনগণ মুখ তুলে চাইবে, তারা ওইগুলিরে দেখেছে, অনেক বছর ধরে দেখেছে; এইবার কি একবারের জন্যেও দয়া করে তাঁদের দিকে চাইবে না?

জনগণের কী আছে দেখা ছাড়া, তারা তো দেখার জন্যেই জনগণ হয়েছে, পামরজনতা হয়েছে; তাদের তো দেখতেই হবে–একবার এদের, আরেকবার তাদের, আরেকবার ওদের। কিন্তু জনগণ থাকবে জনগণ।

মহাজননেত্রী বলেন, আল্লার রহমতে কি এইবার আমাদের অবস্থা আগের থিকা ভাল না? কি মনে হইতেছে আপনেগো, কতোখানি আগাইলেন?

তিনি সকলের মুখের দিকে তাকান; মুখগুলো দেখে তার ভালোই মনে হয়।

রাজপুরুষ আবদুর রহমান বলেন, আমরা ত যা করনের কিছুই বাকি রাখতেছি না, এখন সব আল্লা আর জনগণের হাতে, আল্লায় যদি মুখ তুইল্যা চায়, জনগণ যদি মুখ তুইল্যা চায় তাইলে আমরা পাওয়ারে আসবো।

মহাজননেত্রী জিজ্ঞেস করেন, যেইগুলির সঙ্গে প্যাক্ট করতেছি সেইগুলি আবার বিট্রে করবো না ত?

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, বিট্রে করনের পসিবিলিটি ত সব সময়ই আছে, আমাগো দ্যাশে বিট্রে করনই অনেকটা পলিটিক্স, তবে এইবার বিট্রে কইর‍্যা তাগো কোনো সুবিধা হইবো না।

মহাজননেত্রী জিজ্ঞেস করেন, মনোয়ার হোসেন মোল্লারে আপনাদের কি মনে হয়, সে কি শক্তির উৎসআলাগো সঙ্গে হাত মিলাইতে পারে?

রজ্জব আলি বলেন, তার কোনো উপায় নাই, তাগো ন্যাতারে যারা চাইর পাঁচ বছর আটকাইয়া রাখছে তাগো লগে মনোয়ার হোসেন মোল্লার যাওনের উপায় নাই, খালি আমরা পাওয়ারে আসলেই ওগো ন্যাতার বাইরে আসনের একটা উপায় হইতে পারে এইটা সে বোঝে।

কলিমউদ্দিন মৃধা বলেন, আমরা পাওয়ারে আসলে মনোয়ার হোসেন মোল্লারে প্রথম দিনেই মিনিস্টার করুম, এইটা ত তারে আপনে নিজেই বইল্যাই দিছেন, শক্তির উৎসআলারা তারে মন্ত্রী করবো না। তারে যারা মন্ত্রী করবো তাগো সঙ্গে সে থাকবোই। আমরা ছাড়া তার মন্ত্রী হওনের উপায় নাই।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, মনোয়ার হোসেন মোল্লা সঙ্গে আমার সব সময়ই কথা হয়, মহাজননেত্রীর সঙ্গেও হয়, তারে আর অবিশ্বাস করতে পারি না। অবশ্য পলিটিক্সে বিশ্বাস বইল্যা কোনো কথা নাই, এইটা বুঝি আমরা জিতলে সে আমাগো সঙ্গেই থাকবো।

মহাজননেত্রী বলেন, এইবার জিততেই হইবো, চাচা।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, এইবার না জিতলে বোঝতে হইবো আল্লাতাল্লা আমাগো ছাইরা দিছে, জনগণ আমাগো ছাইরা দিছে; বঙ্গভবন আমাগো লিগা নাই।

তিনি বড়ো একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, সারা ঘর শীতে জমে উঠতে চায়।

মহাজননেত্রী কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে থেকে বলেন, খোজাবংশের জননেতার স্ত্রী গুলবদন বেগমরে ধইরা রাখতে পারা যাইবো তো?

রাজপুরুষ আবদুল হাইয়ের দায়িত্ব হচ্ছে ওই ডাইনিকে ধরে রাখা; ডাইনিকে ধরে রাখতে রাখতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন আবদুল হাই, মাথা প্রায় খারাপ হওয়ার উপক্রম হয়েছে তার।

আবদুল হাই বলেন, অই মাইয়ালোকটার উপর তার স্বামীই ভরসা করতে পারে না, অন্যের কথা না বলাই ভাল। আমি তারে ধইরা রাখনের চ্যাষ্টা চালাই যাইতেছি। এইটা ত সবাই জানে তাগো জননেতা স্ত্রীরে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে বেগম মর্জিনা আবদুল্লা আর মনোয়াররে। তার স্বামী যেদিকে যাইবো অই মাইয়ালোকটা তার উল্টা দিকে যাইব।

মহাজননেত্রী জানতে চান, রাজাকারবংশের খবর কি?

রজ্জব আলি বলেন, অরা আমাগো লগেই আছে, তবে গোপনে গোপনে অগো দুই একজন উৎসআলাগো লগেও প্যাক্ট করনের চ্যাষ্টা করতেছে। আসলে অগো ওই দিকেই ত টান বেশি, ঠেইক্যা আমাগো লগে আন্দোলন করছে।

মহাজননেত্রী জানতে চান, অরা কি এইবার আগের থিকাও বেশি সিট পাইবো মন হয়?

আবদুর রহমান বলেন, পবিত্র ইসলাম ধর্ম যেমন কইর‍্যা আবার জাইগ্যা ওঠছে, দ্যাশ ভইর‍্যা যত মসজিদ ওঠতেছে, রোজা নামাজ পড়া হইতেছে, তাতে ত মনে হয় অগো অবস্থা আগের থিকা ভালই হইবো। অরা তাই ভাবে।

মহাজননেত্রী বলেন, আমরাও ত ইসলামের কিছু বাকি রাখি নাই, বিসমিল্লা আলহামদুলিল্লা আমরাও ত কম বলতেছি না, আমরাও ত নামাজ রোজা করতেছি, কয়দিন আগে ওমরা কইর‍্যা আসলাম, আবার ওমরা করতে যাবো। মুসলমান ভাইরা কি এইটা খেয়াল করতেছে না?

হাজেরা আলি বলেন, আমাদের অসুবিধা হইছে আমরা মাথায় কাপড় দিলে নামাজ পড়লে হজে গেলে ইন্টেলেকচুয়াল ভাইরা বলে আমরা ফ্যানাটিক হইয়া যাইতেছি, রিএকশনারি হইয়া যাইতেছি, আবার মাথায় কাপড় না দিলে নামাজ না পড়লে হজে না গেলে জনগণ কয় আমরা কাফের। এই দুইটারে মিলাইতে আমাদের জান শ্যাষ হইয়া যাইতেছে।

মহাজননেত্রী বলেন, ইন্টেলেকচুয়ালগো কথা ছাইরা দ্যান, দ্যাশ তাগো চিনে না, তাগো কথা শোনে না, ইন্টেলেকচুয়ালগো কথায় বাক্সে ভোট পড়ে না। তারা যা কয় কউক, তারা আমাগো লগেই থাকবো, তাগো যাওনের জায়গা নাই। শহীদ মিনার ঘুইরা তাগো এইখানে আসতে হবেই।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, শক্তির উৎসআলার যদি আবার আসে, তাইলে দ্যাশে থাকন যাইবো না; পাওয়ারে আইসাই আমাগো জ্যালে ঢুকাইবো, জামিনও পাওন যাইবো না।

এইরূপ আরো আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে।

শক্তির উৎসবাদী রাজবংশ তীব্র চেষ্টা করে চলছে রাজাকার রাজবংশকে সাথে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে খোজারাজবংশের রাজপুরুষদের নিজেদের দলে ভাগিয়ে আনতে। বেশ কয়েকটি এসে গেছে, তাদের ভাগাতে হয় নি, এমনিই আইসা গেছে বলে আমরা শোনতেছি, তবে সেইগুলির পায়ের নিচে কাদা ছাড়া মাটি নেই; উৎসবাদীরা খুবই উদ্বিগ্ন, তাদের পায়ের নিচেও তারা পিছল পিছল বোধ করছে। মহাদেশনেত্রী শুনতে পাচ্ছি ঘুমাতে পারছেন না, তাঁর কাছেও কেউ যেতে পারছে না; তিনি আদেশ দিয়ে দিয়েছেন রাজপুরুষদের যেভাবেই হোক পাওয়ারে যাওয়ার ব্যবস্থা করার। অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু ও অন্যান্য রাজপুরুষেরা খেটে খেটে আর গোপন গোপন আলাপে বসতে বসতে পাগল হয়ে যাইতেছেন। অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বেশ কয়েকবার মহাদেশনেত্রীর সাথে বৈঠকে বসার আবেদন জানিয়েছেন, মহাদেশনেত্রী সময় দিতে পারেন নি; অবেশেষে সাত দিন পর মহাদেশনেত্রী

একদিন বৈঠকে আসার সময় দিতে পারেন। আমরা লোকের মুখে শুনতে পাই সেইখানে নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

মহাদেশনেত্রী বেঠকে বসে চারদিকে তাকান; রাজপুরুষেরা তখন মাথা নিচু করে থাকেন; তাঁর সামনে মাথা উঁচু করে বসা রাজবংশে নেই।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, হে মাননীয়া মহাদেশনেত্রী, আমরা প্রায় সব কিছুই গোছই আনছি, আমরা পাওয়ারে যাবো।

মহাদেশনেত্রী গম্ভীরভাবে বলেন, পাওয়ারে যেতেই হইবে, আর কারও হাতে পাওয়ার দেওয়া যাবে না। অগো হাতে গেলে দ্যাশটারে অরা বেইচ্যা দিবে।

অবজেনারেল কেরামতউদ্দিন উত্তেজিত হয়ে উঠতে চান; তিনি বলেন, অরা অলরেডি কান্ট্রি সেল করার কন্সপিরেসি শুরু করেছে, উই মাস্ট ফয়েল দেয়ার। কন্সপিরেসি, জনগণরে এইটা জানাই দিতে হবে।

সোলায়মান হাওলাদার বলেন, জনগণ এইটা ভালোভাবেই জানে, এইজন্যেই জনগণ অগো এতো বছর চায় নাই, এই বছর অরা জনগণরে ব্লাফ দিতেছে, জনগণরে এইটা বুঝাই দিতে হবে।

মহাদেশনেত্রী জিজ্ঞেস করেন, কততখানি প্রসিড করলেন সেই কথা বলেন। পাওয়ার আমাদের, অরা পাওয়ারে বসবে সেইটা সহজ করবো না।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, অনেকখানি প্রসিড করছি ম্যাডাম, আমাগো কন্ডিশন দিন দিন ভাল হইতেছে, নানা রাজবংশের সঙ্গে প্যাক্ট হইতেছে। পাওয়ারে আমরা যাবই, সব ব্যবস্থা করে আনছি।

মহাদেশনেত্রী বলেন, সব কিছু স্পষ্ট করে বলেন।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, মওলানা রহমত আলি ভিস্তির সঙ্গে ভালোই কথা হইতেছে, অগো আমরা বুঝাইতে পারতেছি যে অরাও ইসলাম চায় আমরাও ইসলাম চাই, অরা আর আমরা একই, ভাইয়ে ভাইয়ে অবনিবনা হইতে পারে, তবে ভাই ভাইর থিকা দূরে যাইতে পারে না, আমাগো এক লগে থাকন দরকার; কাফেরগো লগে তাগো যাওন ঠিক না।

মহাদেশনেত্রী বলেন, তারে আমি নিজেই ফোন করছিলাম, পাই নাই; মনে হয় আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না।

রেগে ওঠেন জেনারেল কেরামত, এইটা বেয়াদবি, এইটা টলারেট করা যায় না, তাকে শিক্ষা দিতে হবে। অগো উঠাইলো কারা, আমরা না থাকলে অরা থাকতো কই? দেশেই থাকতে পারতো না। অরা বেইমানি করতেছে।

রুস্তম আলি পল্ট বলেন, রহমত আলি ভিস্তি আইজকাইল বেয়াদবি করতেছে, তাকে শিখাই দিমু সময় আসুক; এখন সইজ্য করা ছাড়া উপায় নাই। পলিটিক্সে বেইমানি ত নতুন কিছু না, আর অরা ত দ্যাশের সঙ্গেই বেইমানি করেছিল।

ডঃ কদম রসুল বলেন, এইবার সবাই আল্লাতাল্লার নাম বেশি লইছে, এতে অগো মনে হচ্ছে অগোই ভোট দিবো। আমরাও অগো থিকা আল্লার নাম কম লই না, আমিও আমার কন্সটিটিয়েন্সিতে কয়টা ওয়াজ মাহফিল কইরা আসলাম, দুইটা মসজিদ তুইল্যা আসলাম। আল্লারসুল খালি অগো না।

মোহাম্মদ কুদ্দুস চৌধুরী বলেন, পিপল অগো ফ্যানাটিক মনে করে, অগো চেহারা দেখলেই ভয় পায়, আমাদের মনে করে খাঁটি ইসলামি, পিপল ফ্যানাটিক পছন্দ করে না, ধার্মিক পছন্দ করে।

সোলায়মান হাওলাদার বলেন, খোজাবংশের একটা ফ্যাকশন আমাদের সঙ্গে আছে, সব সময়ই কথা হইতেছে, আর গুলবদন বেগম সাহেবার টান আমাদের দিকেই; আমার আগের ফ্রেইন্ডদের সাথেও কথা চলছে, মাও-লেনিনঅলাদের অনেকেই গোপনে আমাদের সঙ্গে থাকবে।

মহাদেশনেত্রী বলেন, আরও ভাল করে কাজ করেন, আমার কি করতে হবে বলেন, ম্যাজরিটি আসন আমাদের পাইতেই হবে, অগো পাওয়ার দেওয়া যায় না; অরা দেশটা বেইচা দিবে।

ব্যারিস্টার কুদরতে খুদা বলেন, ম্যাজরিটি আসন আমরাই পাবো, অরা যতই নাচুক পিপল অগো ভোট দিবে না। পিপল অগো চিনে, পিপল জানে দে আর ইন্ডিয়ান এজেন্ট, পিপল ভেরি মাচ ইন্ডিয়ার অ্যাগেইনস্টে।

তাঁরা অনেক সময় ধরে এইরূপ গণতান্ত্রিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা করেন, এবং নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৬. মহাগোলমাল হট্টগোল

আমরা জনগণরা শুনতে পাচ্ছি মহাগোলমাল হট্টগোল এমনকি মারামারি ছিড়াছিড়ি চলতেছে খোজারাজবংশে–এই বংশটা বুঝি টিকলো না দাঁড়াইতে পারলো না এই বংশটা বুঝি নির্বংশ হইলো; এই বংশে ভাঙনের চড়চড় ধপাশ ধুম ক্যারৎ ঠাশঠাশ নানা শব্দ হচ্ছে, ওই শব্দ চট্টগ্রাম রংপুর দিনাজপুর ঝালকাঠি রাঙ্গুনিয়া পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। শুনতে পাই এই দল ভেঙেচুরে খানখান হয়ে পড়ছে ভেতর থেকে বাইরে; মহাজননেতার মহীয়সী স্ত্রী গুলবদন বেগম, বিশ্বাস করার মতো গুজব ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তাঘাটে, খোঁয়াড়ে গিয়ে মহাজননেতার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিয়েছেন; এইভাবেই তিনি কম যাচ্ছিলেন, এখন যাওয়া বন্ধ; সত্য গুজব শুনছি মহাজননেতাই তাঁকে ধমক দিয়ে নিষেধ করে দিয়েছেন। কারণ নাকি বেগম মর্জিনা আবদুল্লার সাথে গুলবদন বেগম প্রায় চুলোচুলি শুরু করেছিলেন, গালে নখ লেগে অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে বেগম মর্জিনার, যা মহাজননেতার মতো হৃদয়বান মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয় নাই। মহাজননেতা আর তার স্ত্রী অনেক বছর ধরে ফ্যামিলি ভ্যালুজ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে আসছিলেন, যেমন কমবেশি আমরা সবাই টিকিয়ে রাখার সাধ্যসাধনা করে যাচ্ছি, এখন বুঝি আর ওই ফ্যামিলি ভ্যালুজ টিকলো না। কিন্তু পলিটিক্সে এইটা খুবই দরকার। আমরা গোপনে আড়ালে আবডালে যাই করি না কেননা বাইরে আমাদের ফ্যামিলি ভ্যালুজ রক্ষা করা অত্যন্ত দরকার, সমাজসংসার এইটা চায়; ফ্যামিলি হচ্ছে আসল রাষ্ট্র, আর এইটাকে যদি চুনকাম করে না রাখি তাহলে বড়ো রাষ্ট্রকে কীভাবে বছরের পর বছর চুনকাম করবো? আমরা আমাদের গরিব মানুষের মনের কথা যতোটা জানি তাতে মনে হয় আমরা গরিবরা সম্ভবত বেগম মর্জিনা আবদুল্লার আর গুলবদন বেগম কাউকেই পছন্দ করি না; তাদের মধ্যে গোলমাল চুলোচুলি গাল কাটাকাটি হলে চারদিকের দুঃখের মধ্যেও বেশ একটা মজা পাই। ফ্যামিলি ভ্যালুজের চুলোচুলিতে

আমরা মজা পেলেও মহাজননেতা যে মজা পাচ্ছেন না, তা আমরা বুঝতেই পারছি; খোয়াড়ের ভেতরেও তাকে হয়তো কুঁকড়ে থাকতে হচ্ছে। বাইরে তো আর যাই থাক সমাজ সংসার রাষ্ট্র আছে। তাই তিনি অভ্যাসমতো প্রায় একটি সামরিক নির্দেশ জারি করে ফেলেছেন–গুলবদন বেগমকে খোঁয়াড়ে দেখা করতে যেতে নিষেধ করেছেন। তবে ভেতরের ভাঙার থেকেও মারাত্মক হচ্ছে তার রাজবংশ বাইরেও ভেঙে পড়ছে, অনেকেই রাজবংশ ছেড়ে যাওয়ার জন্যে নানা নীতিমালা তৈরি করছেন, অনেকখানি চলে গেছেন অনেকেই; মহাজননেতা আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। তবে তিনি বিশ্বাস করেন মনোয়ার হোসেন মোল্লা আর মর্জিনা আবদুল্লাকে, আমরা জনগণরা মনে করতেছি এই দুইজনকে নানা কারণেই বিশ্বাস করা যায় সব মানুষ সব সময় বেইমানি করতে পারে না; এই দুইজনেরই ভবিষ্যৎ আছে–মনোয়ার হোসেন মোল্লার গাড়িতে পতাকা ওড়ার ইশারা আছে, আর মর্জিনা আবদুল্লার ইশারা অত্যন্ত নিবিড় অন্তরঙ্গ।

তাঁদের ভাঙাচোরা রাজবংশেরও বেঠক বসে, নদীতে পড়লে কি আমরা শ্মশানের পোড়া চলা ধরে ভাসতে চাই না? তাদের বৈঠকে প্রধান হচ্ছেন মনোয়ার হোসেন মোল্লা; এইটা বৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় ও অশ্রদ্ধেয় শাহ আলম চৌধুরীর জন্যে বিশেষ কষ্টের, কিন্তু তিনি এখনও কষ্ট করে এই কষ্ট সহ্য করে চলছেন।

মনোয়ার মোল্লা বলেন, এইবার ইলেকশনে আমাগো একটাই প্রিন্সিপাল, সেইটা হচ্ছে সারভাইভের প্রিন্সিপাল। আমরা সারভাইভ করতে পারি যদি আমাগো মহাজননেতা সারভাইভ করেন, তিনি থাকলেই আমরা আছি। এইটা সব সময় মনে রাখতে হবে, ভোললে চলবো না। এইটা আমাগো বাচনের প্রিন্সিপাল।

মনোয়ার মোল্লাকে বেশ প্রফুল্ল দেখায়; মনে হয় তারা সারভাইভ না করলেও তিনি সারভাইভ করবেন। তিনি খুব ফিট আছেন, এমন ফিট আছেন ইংরেজিতে যাকে আমরা ফিটেস্ট বলি।

শাহ আলম চৌধুরী বলেন, ন্যাতা সারভাইভ করুক এইটা ত আমরা সবাই চাই, তার সারভাইভ করা দরকার, কিন্তু কথা হচ্ছে আমাগো নিজেগোও সারভাইভ করতে হইবো। সেই কথাও ভাবতে হইবো আমাগো।

মর্জিনা আবদুল্লা একটু বিষণ্ন ও রাগান্বিত হয়ে ওঠেন।

মর্জিনা আবদুল্লা বলেন, মহাজননেতা না থাকলে আমরা কে? আমাদের কে ভ্যালু দেয়? তিনি যখন রাজা আছিলেন তখন আমাদের অবস্থা কেমন ছিলো, আর এখন কেমন। তিনি বাচলেই আমরা বাচবো এইটা মনে রাখতে হবে। আমাদের এই ধরনের কথা বলা বেইমানি।

ইমাজউদ্দিন ঝন্টু বলেন, এইটা কোনো তর্কের সাবজেক্ট না, মহাজননেতাকে লইয়া ডিবেট চলে না, তিনি সব ডিবেটের উর্ধে, তবে তারে ছাড়ানের জইন্যে যাদের সঙ্গে প্যাক্ট করবো দেখতে হইবো তারা আমাগো কয়জনরে মন্ত্রী করবো।

মনোয়ার মোল্লা বলেন, সেইটা ডিপেন্ড করে আমরা ইলেকশনে কেমন করি, কয়টা সিট পাই, বারগেইন করার মতো পাওয়ার আমাগো থাকে কিনা? পলিটিক্সে বারগেইন করার জইন্যে স্ট্রেংথ লাগে আমরা জানি।

ব্যারিস্টার শাহেদ মিয়া বেশ দেরি করে এসেছেন, তাঁকে বেশ চঞ্চল দেখাচ্ছে।

শাহেদ মিয়া বলেন, তাইলে কি আমরা জনগণবংশরেই সাপোর্ট করতে যাচ্ছি। এইটা আবার একটু ভাইব্যা দেখা উচিৎ।

মনোয়ার মোল্লা বলেন, লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত এইটা আমরা ভাববো, এইবার তাগোই পসিবিলিটি বেশি পাওয়ারে যাওয়ার, সেইজইন্যে তাগো সঙ্গে আইজও আছি, লাস্ট মোমেন্ট কি হবে তা আল্লায় জানে।

শাহেদ মিয়া বলেন, ম্যাডাম গুলবদন বেগমের পছন্দ অন্য রকম, তিনি শক্তির উ ৎসআলাদেরই প্রেফার করেন।

মর্জিনা আবদুল্লা এইবার পুরোপুরি রেগে ওঠেন, পারলে তিনি ব্যারিস্টারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন, অন্তত সবগুলো নখ তাঁর দুই গালে ঢুকিয়ে দিতেন।

মর্জিনা আবদুল্লা বলেন, তার পছন্দে অপছন্দে কিছু যায় আসে না, শি ইজ নট ইন দি পার্টি, শি ইজ নট আওয়ার ডিসিশন মেকার। তার নামও তোলবেন না, মহাজননেতা বলে দিয়েছেন সে আর নেই, শি ইজ জিরো।

মনোয়ার মোল্লা বলেন, এইবার পঞ্চাশটা সিট যদি পাই তাইলেই আমরা দরাদরি করতে পারবো।

শাহেদ মিয়া জিজ্ঞেস করেন, আমাদের কয়জনরে তারা মিনিস্টার করবো এইটা ক্লিয়ার করে নিতে হবে, আমরা কয়েকজনে মিনিস্টার হতে চাই। আমরা তাদের সাপোর্ট দিবো মিনিস্টার করলে, আদারওয়াইজ নট।

মনোয়ার মোল্লা হেসে বলেন, শাহেদভাই মিনিস্টার ত কম হইলেন না, সব মিনিস্ট্রিতেই আপনে বসছেন, সব মিনিস্ট্রর চেয়ারেই আপনের দাগ লাইগ্যা আছে, ভবিষ্যতেও লাগবো, দেখতে হইবো এইবারও আপনারে মিনিস্টার করন যায় কি না, তবে ইলেকশনে আপনারে পাশ করতে হবে।

শাহেদ মিয়া রেগে উঠতে গিয়ে গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করেন।

মর্জিনা আবদুল্লা বলেন, আমাদের মহাজননেতা ইজ এ ম্যান অফ প্রিন্সিপাল, তিনি তার নীতিতে চিরকাল ঠিক থাকেন, এই জইন্যেই তিনি এখন ওইখানে আছেন, নীতি থিকা মহাজননেতা কখনো সইরা যান না, এইবারও যাইবেন না; তিনি যা বলে দিয়েছেন, তাই আমাদের করতে হবে। আমাদের প্রধান কাজ তারে বাইর করে আনা, তাহলে একটা দুইটা না সব মিনিস্টার আমরাই হবে।

মর্জিনা আবদুল্লার কথায় ও ওষ্ঠে অভিজ্ঞতাজাত নিশ্চয়তা ফুটে ওঠে।

শাহেদ মিয়া উঠে দাঁড়ান, বেরোতে বেরোতে বলেন, আমি যাই, আমার কাম আছে, আপনেরা তারে বাইর করে আনেন, দেখেন পারেন কিনা।

মনোয়ার মোল্লা বলেন, ব্যারিস্টার দল ছাড়নের চেষ্টা করছে মাসখানেক ধইর‍্যাই, আইজ বুঝি ছাইরা গেলো। তাতে আমাগো লস নাই, ব্যারিস্টার এইবার পাশ করতে পারবো না, আমি খবর নিয়া দেখছি।

ইমাজউদ্দিন ঝন্টু বলেন, আরো কয়জন বাইর হওনের জইন্যে পা বাড়াইয়া আছে, তারা আইজকাইল দিনরাইত উৎসআলাগো লগে ওঠে বসে।

শাহ আলম চৌধুরী বলেন, পলিটিশিয়ানগো নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে হয়, নিজের ফিউচার ঠিক মতন দেইখ্যা সেই মতন কাম করতে যে পারে, সেই খাঁটি পলিটিশিয়ান শাহেদ মিয়া খাঁটি পলিটিশিয়ান, তারে দোষ দিতে পারি না।

তিনি কথাটি বলে গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকেন;তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় তিনিও নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন।

আমরা কয়েক দিন ধরে দেশ জুড়ে বাঘের গায়ের গন্ধ পাইতে শুরু করছি।

দিনাজপুর না গাইবান্ধা না কাউখালির না কিশোরগঞ্জের এক চাষাভাই এই গন্ধটা প্রথম পায়। শেষ রাতে উঠে হালটের পাশে পাটক্ষেতে হাগতে বসে সে বাঘের গন্ধ পেয়ে হাগা চেপে দৌড়ে ঘরে ফিরে এসে বউরে ঠেলা দিতে দিতে বলে, অই, ওট ওট, বাগ আইছে, অই, ওট।

চাষাভাই কাঁপতে থাকে আর তার বউ ভয় পেয়ে জেগে উঠে বলে, কি কও, কি আইছে? যা ইচ্ছা আহুক।

চাষাভাই বলে, বাগ আইছে, বাগের গন্ধ পাইলাম, ওট।

তার বউ বলে, কোন জায়গায় বাগ? কোন জায়গায় বাগের গন্ধ পাইলা? বাগ আইব কই থিকা?

চাষাভাই বলে, ক্যান, আমি ত অখনও গন্ধ পাইতাছি, তুই পাছ না?

বউ বলে, বাগের গন্ধ কোনখানে? আমি গরুর চনার গন্ধ পাইতাছি।

চাষাভাই বলে, তুই মাইয়ামানুষ, কোনদিন বাগ দেখছ নাই বাগের গায়ের গন্ধ কেমন তা জানবি কেমনে, চনার গন্ধই ত তুই চিনবি। মাইয়ামাইনষের জন্মই হইছে চনায় প্যাট বোঝাই করনের লিগা।

বউ বলে, আমার নাকে সর্দি হইছে লাগে, হেই লিগা খালি চনা চনা গন্ধ পাইতাছি।

চাষাভাই বলে, তুই চনার গন্ধ পাইতাছছ, আর আমি বাগের গন্ধে মইরা যাইতাছি।

বউ বলে, সগলে যে বলে তোমার মাথায় ছিট আছে সেইটা মিছা না।

বউ আবার ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু ওই চাষাভাই বাঘের গন্ধে আর ঘুমোতে পারে না; সকাল হওয়ার পরও ক্ষেতে যেতে তার ভয় করতে থাকে।

এমন খবর আমরা দেশের নানান জায়গা থিকাই পাইতে শুরু করছি।

আরেক জায়গায় বাচ্চাদের, আহা আমাগো সোনামণিগো, ইস্কুল শুরু হয়েছে, একটি বাচ্চা ওই সময় চিৎকার করে ওঠে, আফা, আমার ডর লাগতেছে, আমার ডর লাগতেছে।

আফা রেগে উঠে বলেন, ক্যান, তর ডর লাগতাছে ক্যান?

বাচ্চাটি বলে, কিয়ের জানি গন্ধ পাইতাছি।

তখন সব বাচ্চাই চিৎকার করে ওঠে, আমাগো ডর লাগতাছে, আমরা গন্ধ পাইতাছি, আমাগো ডর লাগতাছে।

আফা রেগে উঠতে গিয়ে নিজেও গন্ধ পান।

আফা বলেন, সত্যই ত বাগের গন্ধ, মনে হয় বাগ আইছে।

বাচ্চাদের সারা ইস্কুলে চিৎকার কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়, সব দরোজা জানালা বন্ধ করে দেয়া হয়। তাদের চিৎকার শুনে চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে আসে।

লোকজন চিৎকার করে বলে, তোমাগো কি হইছে, তোমরা দরজা জানলা আটকাইয়া চিকইর পারতাছ ক্যান, কি হইছে তোমাগো?

বাচ্চাদের চিৎকার আরো বেড়ে যায়।

দুজন আফা এক সময় জানালা খুলে বলেন, আমরা সব বাগের গন্ধ পাইতাছি, মনে হয় বাগ আইছে।

লোকজন চারদিকে তাকিয়ে কোনো বাঘ দেখতে পায় না, গন্ধও পায় না বাঘের; এমনকি কাছে দূরে একটা খট্টাশও তারা দেখতে পায় না।

তারা চিৎকার করে বলে, তোমরা মনে হয় পাগল হইছো, এইহানে বাগ আইবো কোনহান থিকা, দরজা জানলা খোলো।

সব জায়গায়ই যে বাঘের গন্ধ পেতে শুরু করেছি আমরা, তা নয়; কোনো কোনো জায়গায় শুয়োরের গন্ধও পেতে শুরু করেছি আমরা।

ফুলঝুরিয়ার মানুষ কয়েক দিন ধরে শুয়োরের গন্ধ পাচ্ছিলো; প্রথম তারা অবশ্য বুঝতে পারে নি যে ওই গন্ধটা শুয়োরের গায়ের গন্ধ না বোঝার কারণ তো একটাই, তারা কখনো শুয়োরই দেখে নি; তাই তার গায়ের গন্ধ কেমন তারা জানতো না। তারা জানে শুয়োর হারাম, তাই শুয়োরের নাম উঠলেই আমরা সবাই গন্ধ পাই। কয়েক দিন ধরে গন্ধটা বাড়তে থাকে; এবং একজন প্রথম বলে যে গন্ধটা শুয়োরের গায়ের গন্ধ। তখন ফুলঝুরিয়ার

মানুষ মাঝেমাঝে বমি করতে থাকে, অনেকে খেতে গিয়ে গন্ধে খাওয়া বন্ধ করে, নানা রকম ঔষধ খেতে শুরু করে তারা। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না কোথা থেকে আসতে পারে শুয়োরের গায়ের দুর্গন্ধ, যাতে বমি না করে পারা যায় না।

তারা আশা করছিলো পাবে পবিত্র সুগন্ধ, কিন্তু শুয়োরের গন্ধে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ফুলঝুরিয়ায় রাজাকারবংশের আমির অধ্যাপক আলি গোলাম পদার্পণ করবেন বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে; জনগণ খুবই উদ্দীপ্ত, অনেকে নতুন টুপিও কিনেছে, দিকে দিকে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে তার পবিত্র আগমনের, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগানো হয়েছে, সোয়াবের কথা ভেবে খুশিতে ভরে উঠতে চাচ্ছিলো লোকজন, কিন্তু তারা শুয়োরের গন্ধ পেতে থাকে। ফুলঝুরিয়ার ঘরবাড়ি বমিতে পিছল হয়ে উঠতে থাকে, পচা টক দুর্গন্ধে ভারি হয়ে ওঠে ফুলঝুরিয়ার বাতাস; মরিচ ধান ধনেপাতা লাউয়ের দিকে তাকালেও মনে হয় তারা বমি করছে।

গন্ধ তাড়ানোর জন্যে তারা বাড়িতে বাড়িতে ধূপ জ্বালাতে শুরু করে।

যেদিন অধ্যাপক আলি গোলাম ফুলঝুরিয়ায় উপস্থিত হন, সেদিন গন্ধটা চরম রূপ ধারণ করে। আলি গোলাম ভাষণ দিতে শুরু করলে লোকজন চিৎকার করে আবেদন

জানাতে শুরু করে, তিনি প্রথম শুনতে পান না।

শুনতে পাওয়ার পর তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনেরা চিৎকার করিছেন কেনো, আপনারা কি আবেদন করিতে চান?

লোকজন বলে, হে হুজুর হে আমির, আমরা শুয়ারের গন্ধ পাইতেছি, গন্ধে টিকতে পারতেছি। আপনে আগে দোয়া পইর‍্যা গন্ধ খ্যাদাইয়া আমাগো বাঁচান।

তিনি বলেন, আমি কোনো গন্ধ পাইতেছি না।

তারা বলে, হে আমির, আমরা পাইতাছি।

আলি গোলাম সারা বিকেল আর সন্ধ্যা ভরে সকলকে নিয়ে দোয়াদরুদ পাঠ করেন, অনেক দিন ধরে তিনি নিজে দোয়াদরুদ পড়েন না বলে দেখতে পান অনেক দোয়াই তিনি ভুলে গেছেন, তবু তিনি থামেন না; কিন্তু তাতে গন্ধ কমে না, লোকজন বলতে থাকে, হে আমির, আমরা গন্ধ পাইতাছি, আরও দোয়া পড়েন, গন্ধ বাইর‍্যা যাইতাছে। ক্লান্ত হয়ে আলি গোলাম সভা ছেড়ে দলের অফিসে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন–ঘুমোতে পারেন না, জেগে থাকেন।

পরদিন ভোর হওয়ার আগেই তিনি ফুলঝুরিয়া ছেড়ে যান, ঠিক করেন এখানে আর আসবেন না। আরো তিন চার দিন ধরে ফুলঝুরিয়ার মানুষ শুয়োরের গন্ধ পায়; ধীরে ধীরে গন্ধ কমে আসে। তারা আবার শিশুর মুখে শিশুর গন্ধ ধানক্ষেতে ধানের গন্ধ বাড়া ভাতে ভাতের গন্ধ পেতে শুরু করে।

ফুলঝুরিয়ার মানুষ বুঝতে পারে না ওই ক-দিন তারা কেননা পেয়েছিলো অমন দুর্গন্ধ। ওই গন্ধের কথা ভেবে তারা মাঝেমাঝে শিউরে ওঠে, আল্লার কাছে প্রার্থনা করে যাতে ওই গন্ধ তারা আর না পায়।

কিন্তু গন্ধ আমরা কমবেশি পাচ্ছি।

মহাজননেতার প্রিয়তমা মর্জিনা আবদুল্লার সঙ্গে চুলোচুলি রক্তারক্তি আর আর পারিবারিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করার পর বাসায় ফিরেই গুলবদন বেগম পানীয়র বোতল গেলাশ চারপাঁচখানা সেলুলার নিয়ে শক্ত হয়ে বসেন। তাঁর মুখে আমরা জনগণরা সব সময়ই ছোটোবেলায় নানীর কাছে শোনা ডাইনিটার মুখের আদল দেখতে পাই, কাগজে তার ছবি উঠলে পোলাপানরা ছবি দেখে ভয় পায় বলে আমরা সেই দিনকার কাগজ লুকিয়ে রাখি, তবে আল্লায় যারে যেই মুখ দিছে তা নিয়া কথা বলা ঠিক না, আমরা সেই বিষয়ে কথা বলতে চাই না, তবে এই মুহূর্তে তিনিও তার মুখটা দেখলে ভয় পাইতেন। তিনি সেলুলার টিপতে শুরু করেন; কিন্তু আমাগো দেশ এমন দেশ এখানে কাফেরগো দেশ থেকে যা আসে তাই আটকে যায়, খালি পিপপিপ করতে থাকে; তিনি রেগে গোটা দুই সেলুলার ছুঁড়ে ফেলে দেন, বার তিনেক পানীয়তে চুমুক দেন। আহ্, কি সুখকর! তিনি বোধ হয় আর পলিটিকেল ফ্যামিলি ভ্যালুজ টিকিয়ে রাখতে পারছেন না; ওই বদমাইশটারে দেখাইয়া দিতে হবে। ওইটারে খোয়াড়ে চিরকাল আটকাইয়া রাখতে হইব, ওইখান থিকাই অরে বনানী গোরস্থানে পাঠাতে হবে।

উৎসবাদী রাজবংশের রুস্তম আলি পন্টু সাহেবকে তার খুবই দরকার, তার সঙ্গে আলাপ করেই তিনি এখন ছেঁড়াফাড়া কলজেটিতে শান্তি পেতে পারেন; তবে মনে হইচ্ছে রুস্তম

আলি পন্টু অইত্যান্ত ব্যস্ত আছেন, তাঁর সেলুলার তিনি আটকাইয়া রাখছেন। সেলুলার আটকাইয়া রাখনের মিনিং কী? তিনি নিজে কখন আটকাইয়া রাখেন? নিশ্চয়ই কারো লগে কোনো গোপন প্যাক্ট করতে বসছে রুস্তম আলি। পলিটিশিয়ানগুলি সবই হারামি, খালি হারামি না হারামির বাচ্চা হারামি, কার লগে যে কি কইব তার ঠিক নাই। মনোয়ার মোল্লার সঙ্গে বসলো না তো? এই ভাবনাটা আসতেই একটানে তিনি গেলাশটি শেষ করে দেন; তারপর টিপতেই অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টুকে পাওয়া যায়।

গুলবদন বেগম বলেন, ভাই, আপনেরে পাওনের থিকা আইজকাইল আল্লারে পাওনও সোজা। এক ঘণ্টা ধইর‍্যা ফোন টিপছি, আপনের ফোন বাজে না।

রুস্তম আলি পন্টু বিনয়ের সঙ্গে বলেন, মাফ কইরা দেন ম্যাডাম, আর গালি দিয়েন না, আপনে যে আমারে খোঁজছেন এইটা আমার ভাইগ্য, একটু পর আমিই আপনেরে রিং করতাম, আপনেরে খুবই দরকার। আপনে আমাগো একজন বড় গার্জিয়ান, ওয়েল-উইশার, আপনেরে আমি কখনোই ভুলি না।

গুলবদন বেগম বলেন, ভাই, আইজকাইল আমারে আর কার দরকার, আপনে পলিটিশিয়ান বইল্যা কথাটা ঘুরাই বললেন, আপনেরেই আমার দরকার। এইটা সত্য খালি পলিটিক্স না, আপনের সঙ্গে আলাপ কইর‍্যা আমি আরাম পাই।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, ম্যাডাম, আমি সত্য কথাই বলতেছি, আপনের লগে আমি পলিটিক্স করি না, সকলের সঙ্গে পলিটিক্স করন যায় না। আপন মাইনষের সঙ্গে আবার পলিটিক্স কি।

গুলবদন বেগম বলেন, আমি ফাইনাল ডিসিশন নিয়া নিছি, সেইটা আপনেরে জানানের জইন্যেই ফোন করলাম।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, বলেন ম্যাডাম, কি ডিসিশন নিলেন? আপনের ডিসিশনের ওপর কারো কোনো কথা থাকতে পারে না।

গুলবদন বেগম বলেন, আইজ থিকা আমাগো রাজবংশ দুই ভাগে ভাগ হইয়া গেছে, বাইরে কারে তা জানান হইবে না, খালি আপনে জানলেন।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, এইটা খুবই দরকার আছিল, আপনেগো বংশে যেই গোলমাল তাতে এক সঙ্গে থাকন ইমপসিবল। অনেক ডিজঅনেস্ট লোকে ওই বংশ ভইরা গেছে, অপরচুনিস্ট বিট্রেয়ারে আপনেগো দল গিজগিজ করতেছে।

গুলবদন বেগম বলেন, আমি আপনেগো সাপোর্ট দিব, আমার সঙ্গের কমপক্ষে পঁচিশজন পাশ কইর‍্যা আসবো, খালি আমাগো কয়টা দাবি মিটাতে হবে।

রুস্তম আলি বলেন, আপনের সব দাবিই আমরা মিটাব।

গুলবদন বেগম বলেন, ওইটারে যে খোয়ারে ঢুকাইছেন সেই খোয়ারেই মউত পর্যন্ত রাখতে হবে, বাইর হইতে দিবেন না; অইটা খোয়ারে থাকব নাইলে কবরে থাকব, বাইরে থাকতে দিবেন না।

রুস্তম আলি খুশিতে ভরে উঠে বলেন, আপনে ম্যাডাম একেবারে আমাগো মহাদেশনেত্রীর মনের কথাটা বলছেন, মহাদেশনেত্রী বলেন ওইটারে আর বাইরে আসতে দেয়া হবে না, ওইখানেই ওইটা ধুইক্যা ধুইক্যা মরবো, তারপর গ্রামের বাড়িতে পাঠাই দেয়া হবে। আমাগো মহাদেশনেত্রী বলেন, ওইটা জানয়ার, ওইটারে খাঁচায় রাখনই ভাল।

গুলবদন বেগম বলেন, হ্যাঁ, তাই করবেন।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, অই জানয়ারটার নিচে যে কেমন কইর‍্যা আপনে এত বছর শুইলেন অইটারে আপনার এত সুন্দর দেহখানা দিলেন, তা ভাইব্যা আমি এই বয়সেও মাঝেমাঝে কাইপ্যা উঠি, ম্যাডাম।

গুলবদন বেগম বলেন, মাইয়ামানুষের এই কপাল, জানোয়ারগো নিচেই শুইতে হয়। তবে এই জানোয়ারটাকে শিক্ষা দিতে হইবে।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, ম্যাডাম, দুঃখের ব্যাপার হইল বাংলাদ্যাশটা পাকিস্থান না, পাকিস্থান হইলে আগেই দেখাই দিতাম। জানেন ত ম্যাডাম, পাকিস্থানে জুলফিকার ভুট্টরে জ্যানারেল জিয়াউল হক খালি জেলে আটকাইয়া রাখে নাই; জ্যানারেল জ্যালে তারে প্রত্যেক রাইতে আইচ্ছা ডলন দিত। একে ত খাইতে দিত না, না খাইয়া খাইয়া ভুটু দরিদরি হইয়া যাইতেছিল, আর রাইতে এক ব্রিগেডিয়ার গিয়া ঘণ্টা দুই ধইর‍্যা আইচ্ছা ছ্যাচন দিত। এক রাইতে ছ্যাচনের সময় ব্যাটা মইরা যায়, আর তারে তারাতারি ফাঁসিতে ঝুলাই দিয়া কাগজে খবর ছাপাইয়া দেয় যে জুলফিকার ভুট্টরে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। দ্যাশটা পাকিস্থান হইলে

তা করন যাইত, এই কারণেই ত পাকিস্থানরে আমরা পছন্দ করি, ওইখানে ইচ্ছামত কাম করন যায়, ওইটা কামের দ্যাশ।

গুলবদন বেগম বলেন, আর মনোয়ার মোল্লার সঙ্গে কোনো প্যাক্ট করবেন না। রুস্তম আলি বলেন, ওই বদমাইশটার কথা বলবেন না, ম্যাডাম। ওইটা এক নম্বর অপরচুনিস্ট, মিনিস্টার হওন ছারা আর কিছু বোঝে না। ওইটা সবার লগে লাইন দিতেছে। এইবার ভাবছে ওই ইন্ডিয়াআলারা পাওয়ারে আসবো, সেই জইন্য তাগো লগে দিনরাইত পইর‍্যা আছে, ওই ব্যাটারে দেখাই দিব।

গুলবদন বেগম বলেন, আর আমারে মিনিস্টার করতে হইব।

রুস্তম আলি বলেন, সেই কথা বলতে হবে না ম্যাডাম, আমরা পাওয়ারে গেলে আপনে মিনিস্টার হবেনই, আপনে আমাগো এক নম্বর মিনিস্টার হবেন, আর এমন যদি দেখি আপনারে প্রাইম মিনিস্টার করলে বেশি সুবিধা হয় তাইলে আপনেরে আমরা প্রাইম মিনিস্টার করবো, এইটা আমরা ভাইব্যা রাখছি।

গুলবদন বেগম বলেন, ভাই, আপনের এই সিনসিয়ারিটির জইন্যেই আপনেরে আমি এত লাইক করি, আপনের মতন পলিটিশিয়ান দ্যাশে আর নাই।

তাদের কথা এক সময় শেষ হয়; কিন্তু গুলবদন বেগম সেলুলার টিপতে আর পান করতে থাকেন; এবং এক সময় জড়িয়ে জড়িয়ে বলেন, সালামালাইকুম ভাই, আপনেরে আইজকাইল পাওন যায় না।

ওই দিকে সেলুলার কানে চেপে ধরেছেন জনগণবংশের মোহাম্মদ আবদুল হাই। একবার আবদুল হাইর মনে হয় নিজের নামটা বদলে দিই, রং নাম্বার বলে রেখে দিই; কিন্তু তিনি তা করেন না, বলেন, আপনেরেই পাওন যায় না, ম্যাডাম, পাওনের চ্যাষ্টা ত কম করি না।

গুলবদন বেগম বলেন, মিছা কথা বইল্যন না ভাই, পাওনের চ্যাষ্টা ত করেন। মনোয়ার মোল্লারে, তাইলে আমারে পাইবেন কেমনে? আমি ত আপনের বংশের কাছে ফুরাই গেছি, তবে মনে রাখবেন আমি ফুরাই নাই, আমার সাপোর্ট ছাড়া পাওয়ারে যাইতে পারবেন না।

আবদুল হাই বলেন, কি যে বলেন ম্যাডাম, আপনে হলেন আপনের বংশের লিডার, আপনের কথায় সবাই ওঠে বসে, আপনেরে ছাইর‍্যা কি মনোয়ার মোল্লার পিছে আমি ঘুরতে পারি?

গুলবদন বেগম গেলাশে কয়েকটি চুমুক দেন, তাঁর অন্য কিছুতেও চুমুক দিতে ইচ্ছে করে;–হায়রে দেহ, হায়রে চুমুক, বাতিল হওয়ার পরও ক্ষুধা যায় না।

গুলবদন বেগম বলেন, এইবারে পাওয়ারে আসবেন ভাইব্যা আমাদের ইগনোর করতেছেন ভাই, কিন্তু তা কি পারবেন? ভাবছেন মনোয়ার মোল্লারে লইয়া পাওয়ারে যাইতে পারবেন, আমারে ছারা হবে না।

আবদুল হাই বলেন, এমন কথা বলবেন না ম্যাডাম, আপনে আমাদের এক নম্বর ওয়েল-উইশার আমরাও আপনের ওয়েল-উইশার, আপনেরে ছাড়া আমরা পাওয়ারে যাইতে পারুম

না। এই বছর আমরা সকলের দোয়া চাই, দেশে ড্যামোক্রেসি ফিরাই আনার জইন্যে সকলের দোয়া চাই। আপনে ড্যামোক্রেসিতে বিশ্বাস করেন, আমরাও করি; আমাগো একলগে থাকতে হবে।

গুলবদন বেগম বলেন, কিন্তু ভাই মনে হয় আপনেরা মনোয়ার মোল্লারে নিয়াই পাওয়ারে যাবেন, আমারে ইগনোর করছেন। মনে রাইখেন মনোয়ারের বাপেরও সেই শক্তি নাই, বংশের আমিই আসল লোক।

গুলবদন বেগম গেলাশে আরো কয়েকটি চুমুক দেন; আর কিছুতে তাঁর এখন চুমুক দিতে ইচ্ছে করছে না, একটা খাঁটি খুন করতে ইচ্ছে করছে।

আবদুল হাই বলেন, ম্যাডাম, আপনে একজন খাঁটি পলিটিশিয়ান আর আমরাও পলিটিক্স কইর‍্যা খাই, আপনে জানেন পলিটিশিয়ানরা কাগোই কোনদিন ইগনোর করে না, আমরা ত করিই না।

আরো কয়েকটি চুমুক দেন গুলবদন বেগম। কথা বলতে গিয়ে গুলবদন বেগমের জিভ জড়িয়ে আসতে চায়, জিভটাকে ভেজা চামড়ার স্যান্ডেলের মতো ভারি মনে হয়, তবু তিনি কথা বলার চেষ্টা করেন।

গুলবদন বেগম বলেন, অই বদমাইশ জানোয়ারটা আমারে ছারছে, আপনেরাও আমারে...

তিনি আর কথা বলতে পারেন না; তাঁর বাঁ হাত থেকে গেলাশটিকে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দেন, দেয়ালে গিয়ে গেলাশটি চুরমার হয়ে যায়; আর ডান হাত থেকে সেলুলারটি খসে পড়ে। গুলবদন বেগম প্রথম সোফার ওপর গড়িয়ে পড়েন, সেখান থেকে গড়িয়ে পড়েন মেঝের ওপর। তার মুখ থেকে লালা বেরোতে থাকে; লালার সাথে দুটি শব্দ বেরোতে থাকে– বদমাইশ জানোয়ার বদমাইশ জানোয়ার।

আবদুল হাই ওই দিকে চিৎকার করতে থাকেন 'হ্যালো, হ্যালো'; কোনো সাড়া না পেয়ে সেলুলার বন্ধ করে বলেন, বুড়ী বিচ, কুত্তার সঙ্গে কুত্তী।

দিকে দিকে আমাগো অপসর পাওয়া বুড়াগুলিও খুব জাইগ্যা উঠছে। আমাগো এই সুন্দর দেশে তরতাজা পোলপানগুলি কোনো কাজ পায় না, ইনভারসিটি থেকে বার হইয়া ফ্যা ফ্যা করতে থাকে, কিন্তু বুড়াগুলির কামের কোনো শ্যাষ নাই। ওইগুলি সাতান্ন হওয়ার পরও চাকুরি জড়াইয়া ধইর‍্যা পড়ে থাকে, ওরা না থাকলে সূর্য আন্ধার হইয়া যাবে চান উঠবে না মাইয়ালোকের প্যাটে পোলা আসবে না, তিন চার বচ্ছর কাম বাড়াই নেয়; ড্যাকরা ছেলেগুলিন ব্যাকার হইয়া রাস্তায় রাস্তায় পার্কে পার্কে গাঁজা টানে, ল্যাখাপড়া জানা মাইয়াগুলির আর বিয়া হইতে চায় না। অপসর পাওয়া বুড়াগুলি এখন পলিটিক্সে মেতে উঠছে, কাম ছাড়া তারা থাকতে পারে না; আর বুড়াকালের জইন্যে সবচে ভালো কাম হইছে পলিটিক্স। পলিটিক্সে তাদের দরও খুব বেশি, বিশেষ করে দুই ধরনের বুড়ার : একটা হইল ওই অপসর পাওয়া জ্যানারেল, আরেকটা হইল অপসর পাওয়া সেক্রেটারি, মাছের বাজারে পাঙ্গাশের মতন।

এই পাঙ্গাশগুলি খুব জাইগ্যা উঠছে, আমরা তাগো চর্বি দেখতে পাইতেছি।

এই পাঙ্গাশ মাছগুলির খেলা খুবই মজার।

আমাদের রাজবংশগুলি পাঙ্গাশমাছ খুব পছন্দ করে, তারা পাঙ্গাশমাছ কিননের জইন্যে পাঙ্গাশমাছ ধরনের জইন্যে পাগল হয়ে গেছে। যেমন করেই হোক ড্যামোক্রেসির ইলেকশনের মেজবানিতে চল্লিশায় পাঙ্গাশমাছ তাগো চাই-ই চাই। পাঙ্গাশমাছ না হলে ইলেকশনের চল্লিশা জমবে না, সবাই মনে করবে দাওয়াত দিয়ে ডালভাত খাওয়ানো হচ্ছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজবংশগুলি যেখানে সেখানে জাল ফেলছে পাঙ্গাশমাছ ধরার জন্যে, আর যদি ধরাই না যায় তাহলে কিনতে যাচ্ছে বাজার থেকে আস্ত পাঙ্গাশ। আমাগো দুইখানা বড়ো রাজবংশ বেরিয়ে পড়েছে পাঙ্গাশমাছ ধরতে পাঙ্গাশমাছ কিনতে; আর পাঙ্গাশমাছেরাও খুব চালাক, জালের নিচে পড়তে পড়তে পড়ছে না, কোন জালের নিচে পড়বে তা মেশিন দিয়ে হিশেব করছে, তারা নিজেদের বেচতে বেচতে বেচছে না, কোন বংশের কাছে নিজেকে বেচবে তা পকেট ক্যালকুলেটর দিয়ে দিনরাত হিশেব করছে। আমরা পাঙ্গাশগুলির খুব নামডাক শুনতে পাচ্ছি, খবরের কাগজগুলি বড়ো বড়ো করে খবর ছেপে ছবি ছেপে আমাদের জানাই দিচ্ছে কোন বংশ কয়টা পাঙ্গাশ ধরলো, কয়টা পাঙ্গাশ কোন দলের জালের ভিতর ঢুকলো।

আমাদের জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশ আর শক্তির উৎসবাদী গণতান্ত্রিক রাজবংশ মাঝেমাঝে বৈঠকে বসছে পাঙ্গাশ ধরার কৌশল বের করার জন্যে। জনগণমন গণতান্ত্রিকরা বৈঠকে এমন কৌশল নিচ্ছে :

মহাজননেত্রী বলছেন, এইবার আমাগো দলে দশ পনরটা সেক্রেটারি আর জ্যানারেল থাকতেই হইব, নাইলে দলের মুখ থাকব না।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান বলছেন, এইটা ত আমরা দলের বেসিক প্রিন্সিপাল হিশাবেই গ্রহণ করছি, জ্যানারেল আর সেক্রেটারিরা হইব দলের মাথার মণি।

কলিমউদ্দিন মৃধা বলছেন, তা আমাগো নিতেই হইব, নাইলে দল মুখ দেখাইতে পারব না, তবে একেকটার বাগরাবাই কম না।

মহাজননেত্রী জানতে চান, বাগরাবাই কেমুন?

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, তারা প্রত্যেকেই মিনিস্টার হইতে চায়, আলাপের আগেই বইল্যা ফেলে মিনিস্টার করলে দল থিকা দারাইব।

মহাজননেত্রী বলেন, হ, আমরা তাগো মিনিস্টার ত করুমই; এইবার আমরা পাওয়ারে যেতে চাই, পাওয়ারে যাওয়ার জইন্যে যদি তাগো মিনিস্টার করতেই হয় তাইলে তাগো মিনিস্টার করুম।

মোহাম্মদ আবদুল হাই বলেন, এইজইন্যে আমরা পার্সোন্যাল ইন্টারেস্টও ত্যাগ করতে প্রস্তুত, নিজেরা মিনিস্টার না হয়ে তাগো মিনিস্টার করুম, কিন্তু পাওয়ারে যেতেই হবে, এই ছাড়া উপায় নাই।

শক্তির উৎসবাদী গণতান্ত্রিক রাজবংশ পাঙ্গাশ ধরার জন্যে এমন কৌশল নেয় : মহাদেশনেত্রী বলেন, এইবার দলে কয়জন নতুন জ্যানারেল আসবেন?

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, আশা করতেছি পনর কুড়িজন জ্যানারেল আমাগো সঙ্গে আসবেন।

মহাদেশনেত্রী বলেন, এত কম কেন? দলে আরো জ্যানারেল লাগবে।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, আরও ধরনের চ্যাষ্টা করছি, ম্যাডাম, দ্যাশে জ্যানারেলের অভাব ঘইট্যা গেছে, এত বড় একটা দ্যাশে হাতে গণা কয়টামাত্র জ্যানারেল, দ্যাশে হাজারখানি রিটায়ার্ড জ্যানারেল থাকা দরকার আছিল।

মহাদেশনেত্রী জানতে চান, নাই কেন?

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, আমাগো আমফোর্সে প্রমোশন এত কম যে জ্যানারেল বেশি নাই। তাগো মতন যোগ্য আর স্মার্ট লোক দ্যাশে নাই, তাগো প্রত্যেকের জ্যানারেল হইলে মানায়।

মহাদেশনেত্রী বলেন, এইবার পাওয়ারে গেলে প্রমোশন দিয়া এক হাজার জ্যানারেল বানাইবেন। জ্যানারেল ছাড়া দ্যাশ বিশ্বে মর্যাদা পায় না।

সোলায়মান হাওলাদার বলেন, আমরা সেই স্টেপ নিছিলাম, ম্যাডাম, আর কিছু দিন পাওয়ারে থাকলেই তা হইত, দ্যাশে জ্যানারেলের অভাব হত না।

মহাদেশনেত্রী জানতে চান, কয়জন সেক্রেটারি সাহেব এইবার আমাদের দলে আসতেছেন? সেক্রেটারি সাহেবদের খুব দরকার।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, পনর বিশজন হইব, ম্যাডাম। রিটায়ার্ড সেক্রেটারি ছাড়া দ্যাশ চালান খুব ডিফিকাল্ট, তারা অন্ধিসন্ধি সব জানে।

মহাদেশনেত্রী বলেন, আরো লাগবে, এই কয়জনে হবে না, পঁচিশ তিরিশজন সেক্রেটারি ছাড়া হবে না।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, আমরা সেই চ্যাষ্টা করতেছি, ম্যাডাম। আমলাগুলি সব সময়ই আনফেইথফুল, যেই দিকে সুবিধা ওইগুলি সেই দিকেই দৌরায়, আগে আমাগো দিকে দৌরাইত এখন অন্য দিকে দৌরাইতেছে। এইবার সেক্রেটারিগুলি বড় বদমাইশ, তারা ইন্ডিয়াআলাগো দিকে লাইন দিতেছে।

মহাদেশনেত্রী বলেন, অই লাইন থিকা ধরে নিয়া আসেন, তাদের বলেন তাদের মিনিস্টার করা হবে। জ্যানারেল আর সেক্রেটারি ছাড়া দল দেখতে ভাল লাগে না, দলের মর্যাদা থাকে না।

ওই পাঙ্গাশগুলি তীব্র উত্তেজনায় সময় কাটাচ্ছে; চারদিক থেকে অফারের পর অফার পাচ্ছে, মিনিস্টার করা হবে মিনিস্টার, মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। মিনিস্টার তো করা হবেই, সেটা কোনো ব্যাপার না; ব্যাপার হলো যেই দলে জয়েন করবো যেই জালে ধরা দিবো, তারা পাওয়ার পাবে তোর পাওয়ার না পেলে মিনিস্টার করবো কোন হান থিকা? তাই ধরা দেয়ার আগে চারদিকে তাকাই দেখন দরকার, গরিবগরবা পিপলের মুখের দিকে চেয়ে দেখন দরকার, পারলে তাদের ভিতর থিকা খবরটা বাইর করন দরকার, তারা কোন বংশরে পাওয়ারে পাঠাইব? পিপল কি জনগণআলাদের চায়? এইবার কি জনগণআলাদের অবস্থা বেশ ভালো না? মনে হয় পিপল এইবার তাদের পাওয়ারে পাঠাইয়া পরীক্ষা করে দেখতে চায়। কিন্তু...কিন্তু? যদি না পাঠায়? পিপল কি শক্তির উৎসআলাদের আবার চায়? এই কিছু দিন আগে না তাদের ঠেলে ফেলে দিলো?.চাইর মাসেই কি সেই কথা ভুইল্যা আবার পাওয়ারে পাঠাবে? পাঠাতেও পারে। মূর্খ পিপলের মতিগতি সাইকলজিস্টরাও বুঝতে পারে না। পাঠাতেও পারে? তার মানে কোনো শিউরিটি নাই, সবই আনসারটেন, কেউ জানে না কোনটায় জয়েন করবো, কোনটার জালে ধরা দিবো, কোনটার টোপ গিলবো? অত্যন্ত উত্তেজনায় আছেন পাঙ্গাশগণ। কে বলে দিতে পারে কোন বংশ জিতবে, পাওয়ারে যাবে?, পলিটিকেল প্যান্ডিটগুলো মাথা আরো খারাপ করে দিচ্ছে; একেক দিন একেক রকম বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী করে মাথা বিগড়ে দিচ্ছে। রাস্তার গণকের কাছে যাবো? হাত বাড়িয়ে বলবো, কোন দল জিতবে বলে দিন, আমি মিনিস্টার হইতে চাই? অ্যায়ারকন্ডিশন্ড অ্যাস্ট্রোলোজারের কাছে যাবো? পিরের বাড়ি যাবো? স্ত্রী, প্রাক্তন স্ত্রী, প্রেমিকা, প্রাক্তন প্রেমিকা, উপপত্নী, প্রাক্তন উপপত্নীর বাড়ি যাবো? কাজের মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করবো? বলে দাও কোন বংশ জিতবে? কোন বংশ এইবার পাওয়ারে যাবে? মাথা গরম হয়ে উঠছে পাঙ্গাশগণের।

অবজেনারেল করিম ইউসুফ ফোন করেন অবজেনারেল আল হাক্কানিকে, আই অ্যাম পাসিং এ টেরিবল টাইম, ডিসাইড করতে পারছি না হুইচ পার্টি টু জয়েন। অল দি পার্টিজ আর অফারিং মি ইনক্রেডিবল প্রাইজেস।

আল হাক্কানি বলেন, আমার কন্ডিশনও একই, আই অ্যাম এট এ লস, ইটস মোর ডিফিকাল্ট দ্যান ওয়ার স্ট্র্যাটেজি। ভাই, বলেন তো কারা পাওয়ারে আসবো?

করিম ইউসুফ বলেন, অনলি গড নোজ, মে বি ইভেন হি ডাজ নট নো। আমার একবার মনে হয় শক্তির উৎসবাদীরা উইল স্টেজ এ কামব্যাক, আবার মনে হয় জনগণআলাস উইল গো টু পাওয়ার দিইস টাইম।

আল হাক্কানি জিজ্ঞেস করেন, আপনারে কি অফার করছে?

করিম ইউসুফ বলেন, এনি মিনিস্ট্রি আই ওয়ান্ট অ্যাকসেপ্ট দি পোস্ট অফ দি প্রাইম মিনিস্টার।

আল হাক্কানি বলেন, হোয়াই নট দি পোস্ট অফ দি প্রাইম মিনিস্টার, হা হা হা। আমারেও এই রকমই অফার করছে, বাট ক্যান্ট ডিসাইড হুইচ পার্টি টু জয়েন। নাউ আই অ্যাম প্র্যাকটিচিং আটারিং জয় বাংলা অ্যান্ড বাংলাদেশ জিন্ডাবাড, বাংগালি অ্যান্ড বাংলাডেশি; যেইটা আটার করতে আমার ভাল লাগবে আমি ঠিক করছি সেই পার্টিতেই জয়েন করবো।

তা%রা অনেকক্ষণ ধরে হাসাহাসি উপভোগ করেন।

করিম ইউসুফ বলেন, টু বি এ মিনিস্টার ইজ নট সো ব্যাড, ইটস্ এ হাইলি। ইন্টারেস্টিং পোস্ট আই থিংক, বাট দুই পার্টিতেই অনেকগুলি বুড়া হ্যাগার্ড টুথলেস। ককলেস জেনারেল জয়েন করছে, তাদের রেখে শ্যাষ পর্যন্ত আমাদের মিনিস্ট্রি দিবো তো? আই ক্যান্ট ট্রাস্ট দি পলিটিকেল বাস্টার্ডস, দে আর লায়ার্স, ফাদার্ড বাই ডেভিলস্। একবার জয়েন করার পর তো তাদের পেছনে পেছনে হাঁটতে হবে, তাদের কথায় উঠতে বসতে হবে।

আল হাক্কানি বলেন, যৌল্ড হ্যাঁগার্ডগুলি খালি শোভা, ওইগুলিরে অরা নিচ্ছে, বাট একেবারে পাত্তা দেয় না, তারা পাত্তা দেয় আমাদের মতো ইয়ং এনার্জিটিক জেনারেলদেরই, তারা জানে আমরা হ্যাভ জাস্ট রিটায়ার্ড, উই আর অলমোস্ট ইন। সার্ভিস হুয়িচ ইজ ভেরি ইম্পরটেন্ট, উই আর মাচ মোর অ্যাট্রাকটিভ টু দেম দ্যান দোজ অৌল্ড হ্যাঁগার্ড জেনারেলস। দে আর ডেড বডিজ ইন দি গাইজ অফ রিটায়ার্ড জেনারেলস।

করিম ইউসুফ বলেন, লেটু ওয়েট অ্যান্ড সি ফর এ ফিউ মোর টেরিবল ডেইজ, তারপর একদিন ফুলের তোড়া নিয়ে গিয়ে হাজির হবো। বিয়াও ত এইভাবেই করেছিলাম, ডিফারেন্স হচ্ছে এইবার বিয়া বসতে হবে। হা হা হা। আফটার অল স্লিপিং উইথ এ হোর ইজ মাচ বেটার অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং দ্যান সেলিব্যাসি।

আমাদের অপসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারিগণও ভুগছেন একই ইনসোমনিয়ায়।

তাঁদের ঘুম আসছে না, স্থির করতে পারছেন না, জীবনে এমন জটিল ফাইলের মুখোমুখি কখনো বসেন নি, আগে অন্যের লেখা ফাইলে না দেখে মাল গুণে সই করেছেন, এইবার মনে হচ্ছে সাইন করছেন নিজের ফাইলে; বারবার জায়নামাজে বসে আল্লারে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে, হে সর্বশক্তিমান, হে দয়াময়, হে অতীত ভবিষ্যতের দ্রষ্টা, হে গণতান্ত্রিক ইলেকশন সম্পর্কে সদাসচেতন, আপনার নামেই সবাই ইলেকশন করতেছে, ইউ নো এভরিথিং, আপনার ইঙ্গিতেই সব হয়ে থাকে, স্বৈরাচার বিদায় নিয়া পিপলের ড্যামোক্রেসি দেখা দেয়, আপনে দয়া করে বলে দিন এইবার কোন বংশ পাওয়ারে যাবে, রাজা হবে, পিপল এইবার কোন বংশরে পাওয়ারে বসাইয়া খুশি হয়ে প্রতারিত হবে, আমি কোন বংশের কাছে, মহাদেশনেত্রী না মহাজননেত্রীর কাছে, ফুলের তোড়া নিয়া উপস্থিত হবো?

তাঁরা দুই বংশের টানাটানিতে ছিঁড়েফেড়ে যাচ্ছেন, কথা দিতে গিয়ে কথা দিতে পারছেন না; যদি ভুল হয়ে যায়? পার্টি পাওয়ারে না গেলে তো মন্ত্রী হওয়া হবে না। কিন্তু মন্ত্রী হতে ইচ্ছা করছে, গাড়িতে নিশান উড়াইতে ইচ্ছা করছে। কতো গরু গাধা নিশান উড়হিয়া পচাইয়া ফেললো, নিশানের দিক করে গাড়িতে বসলো, আমি নিশানের গাড়িতে চড়তে চাই, ওইভাবে বসতে চাই। বছরের পর বছর গরু গাধা খচ্চর মূর্খগুলিরে 'স্যার, স্যার' করতে করতে ঘেন্না ধরে গেছে, এইবার মূর্খগুলির মতো 'স্যার' হ'তে ইচ্ছে করছে।

প্রাক্তন সেক্রেটারি আবদুল মোরশেদ সেলুলার করেছেন প্রাক্তন সেক্রেটারি আইউব আলিকে, ভাই, আপনে কোন দলে যোগ দিতেছেন? ডিসিশন নিতে পারছেন? আমি ত পাগল হয়ে যাচ্ছি, পাসিং এ টেরিবল টাইম।

আইউব আলি বলেন, ধরাধরির মধ্যে আছি। সকালে এই দল ধরছে বিকালে ওই দল ধরছে, আমিও সকালে এই দল ধরছি বিকালে ওই দল ধরছি। বুঝতে পারছি না কারা পাওয়ারে যাবে।

আবদুল মোরশেদ বলেন, আপনে তো ধার্মিক মানুষ, রোজা নামাজ করেন, হজও করছেন চাইর পাঁচবার, শক্ত একটি পিরও আছে, ইসলামটা ভালো করে জানেন, পাকিস্থানেরও আপনে অ্যাডমায়রার, আপনে তো উৎসবাদীদের সঙ্গেই যাবেন মনে হয়। আপনের জন্যে ডিসিশন নেয়া সহজ।

আইউব আলি বলেন, আরে ভাই ধর্ম আছে ধর্মের জায়গায়, পলিটিক্স আছে পলিটিক্সের জায়গায়। ধর্ম না, আসল কথা হচ্ছে হুয়িচ পার্টি উইল গো টু পাওয়ার, ধর্ম ত আমি জায়নামাজেই করতে পারি, বাট আই ক্যান্ট বি এ মিনিস্টার আনলেস আই জয়েন দি পার্টি হুয়িচ উইল গো টু পাওয়ার। ধর্মের মিনিস্টার করার পাওয়ার থাকলে মসজিদের মোল্লাগুলিই মিনিস্টার হইত।

আবদুল মোরশেদ বলেন, ওরা সব সেক্রেটারি আর জেনারেলদের মিনিস্টার করার প্রমিজ করছে, কিন্তু এতোজনকে ওরা মিনিস্টার করবে হাউ?

আইউব আলি বলেন, সেটাই তো চিন্তার কথা, পলিটিশিয়ানগুলি বর্ন লায়ার, পিপলকে মিথ্যা বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন আমরাও অদের ট্র্যাপে পড়ছি কি না বুঝতে পারছি না। বাট আই মাস্ট জয়েন এ পার্টি, খোদা চাইলে মিনিস্টার হইতেও পারি।

আবদুল মোরশেদ বলেন, আমিও তাই ভাবছি। মিনিস্টার হলে টাকাগুলি উঠে আসবে, এমপি হ'লেও উঠবে, টাকা মার খাবে না। এনজিওগুলির চাকর খাটার থেকে এটা খারাপ না।

আইউব আলি বলেন, উই আর আর্নিং এ লট অ্যাজ অ্যাডভাইজারজ টু দি এনজিওস, দে আর আওয়ার গোল্ড মাইনস, ওটা থাকবে, এমপি বা মিনিস্টার হলে ওটা আরো জমবে।

আবদুল মোরশেদ জানতে চান, আপনের কি মনে হয়? কোন পার্টি পাওয়ারে যাবে ব'লে আপনের মনে হয়? আপনে পিপলের মতিগতি কিছুটা বুঝতে পারছেন?

আইউব আলি বলেন, এইবার জনগণআলাজ হ্যাঁজ এ চান্স, দি গার্ল ইজ এ গুড ইন্টেলিজেন্ট কমিটেড পলিটিশিয়ান, শি ব্রট অ্যাবাউট দি ডাউনফল অফ দি উ ৎসআলাজ, পিপল আর ভেরি মাচ সিম্পেথিটিক, শি হ্যাঁজ এ চান্স।

পাওয়ার তারা উইল টিচ দি ব্যুরোক্র্যাটস্ এ গুড সিভিয়ার লেসন; এটা ছোটবড় সব ব্যুরোক্র্যাটই বোঝে, তার ফলও ফলবে ইলেকশনে।

আইউব আলি বলেন, আই হোপ সো।

আমরা জনগণরা দূর থিকা খালি শুনছি, দূর থিকা খালি দেখছি। ভিতরে আমরা জনগণরা আবার কোন দিন ঢুকলাম যে কাছে থিকা শুনবো কাছে থিকা দেখবো? আমরা ব্যালট

বাক্সের ছিদ্রিটারেই শুধু কাছে থিকা দেখি। ওই ছিদ্রির ভিতর দিয়া আমাগো কপালরে আমরা নিচে ফেলাই দেই।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু খুবই উত্তেজিত আর উদ্বিগ্ন, দেখা যাচ্ছে পার্টির ফান্ডে চান্দা পড়ছে না; ব্যাংক ডিফল্টারগুলি চান্দা দেয়া কমাই দিছে, বন্ধ করে দিছে অনেকে। চার পাঁচ বছর ধরে না চাইতেই দিয়ে আসছিলো, এখন বারবার চাওয়ার পর যা দেয় তাতে পোলাপানদের ক্যাডারদের চাও হবে না। ক্যাডাররা কয়েক বছর ধইর‍্যাই বেশ বানাইছে, মিছিলে যাওয়ার সময় তারা ছাত্রগো মতন ময়লা কাপড় পরেই যায়, রাতের বেলা পাজেরো হাঁকায়, তিন পিস স্যুট পরে, মিস্ট্রেসগো বাড়ি যায়, টাওয়ারে। টাওয়ারে ফ্ল্যাট কিনছে, বনানী উত্তরায় জায়গা নিয়ে রেখেছে, তবু ত তাদের দিতে হবে। নইলে ভাইগ্যা যেতে পারে, জনগণআলারা ত ধরার জইন্যে খাড়া হয়েই আছে। নমিনেশন দেওনের সময় ফান্ডে ট্যাকা আসবে, কিন্তু ওই ট্যাকা ত কিছুই না; ডিফল্টারগুলি ট্যাকা না দিলে চলবো কেমনে? কয় বছরে তারা হাজার কোটি বানাইল, আর এখন ভাইগ্যা পড়তে চায়? ওইগুলিরে জ্যালে ঢুকানই দরকার আছিল। তিনি কয়েকজন নেতা নিয়ে বসেন, মহাদেশনেত্রীরে এই কথা জানান যাইবো না, তাহলে তিনি ঘুমোতে পারবেন না।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, আপনাদের জানান দরকার যে ডিফল্টাররা চান্দা দিতেছে না, ফান্ড খালি হইয়া যাচ্ছে।

জেনারেল কেরামত বলেন, বাস্টার্ডরা চা নিচ্ছে, মে বি দে থিংক দি জনগনালাজ উইল গো টু পাওয়ার। তারা অখন অইদিকে লাইন দিছে, কোটি কোটি টাকায় অগো ভইরা দিছে।

সোলায়মান হাওলাদার বলেন, এই রাঙ্কেল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টগুলি বাস্টার্ডের বাস্টার্ড, বাতাস ঘুরতে দেখলেই তারা ঘোরে, কয়েকটা ক্যাডার পাঠান দরকার।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, দরকার হইলে ক্যাডার পাঠাইতে হবে, চান্দা না দিয়া দ্যাশে থাকতে পারবো না।

জেনারেল কেরামত বলেন, দুই চাইরটারে ফোন করে এখনই ধমক দ্যান।

রুস্তম আলি পন্টু অনেকক্ষণ ধরে সেলুলার টেপেন, কাজ হয় না; শেষে এক ডিফল্টারকে পেয়ে যান।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, আছছেলামালাইকুম খাজা সাহেব, ভাল আছেন ত? আশা করছিলাম এইর মইধ্যে একদিন আসবেন, নাইলে কাউরে পাঠাইবেন।

খাজা সাহেব বলেন, আমি খুব সরি, দ্যাশে ছিলাম না, সিংগাপুর ব্যাংকক ওসাকায় একটু কাম ছিল। আপনে ভাল আছেন ত? আপনের কথা আমি ভুলি নাই, আই গট সাম প্রেজেন্টস্ ফর ইউ ফ্রম ওসাকা, ইউ উইল লাইক ইট।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, প্রেজেন্টা পাইলে অইত্যান্ত খুশি হবো, তবে আরেকটা কথা আছিল।

খাজা সাহেব বলেন, বুঝতে পারছি, কিন্তু দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছে, বিজনেস একেবারে নাই, সোনার চালানগুলি বন্ধ রইছে। আপনেরা থাকলে অসুবিধা হইত না, বড় ডিফিকাল্টিতে আছি।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, লাইফে ডিফিকাল্টি মাঝেমইধ্যে আসেই, চিরকাল থাকে না, আমরাও এখন ডিফিকাল্টিতে আছি, দুই তিন মাসের ব্যাপার, ওই জিনিশটা আইজই পাঠাইবেন, ফান্ডে ট্যাকা নাই।

খাজা সাহেব বলেন, আইজই আধা লাখ পাঠাই দিব।

রুস্তম আলি পন্টু হাহাকার করে ওঠেন, বলেন কি খাজা সাহেব, আপনের থিকা পুরা এককোটি পাওনের আশা কইর‍্যা আছি, আধা লাখে টয়লেটও হবে না। পুরাটাই দিবেন।

খাজা সাহেব বলেন, এইটা পারুম না, ভাই, মাফ করবেন। বড় ডিফিকাল্ট সময় যাইতেছে, ব্যবসা নাই চালান আসে না।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, সব চান্দা কি অই জনগনআলাগোই দিয়া দিছেন, মনে রাইখেন পাওয়ারে আমরাই যাবো।

আমরা তাদের পলিটিকেল ইন্টিমেট আলাপ আর শুনতে চাই না; তারা পলিটিশিয়ান বলে কি তাদের প্রাইভেসি নাই?

জনগণমনাদের এইবার বোধ হয় ভালো সময় যাচ্ছে। ডিফল্টার শুকুর মজিদের সঙ্গে সোনারগাঁয়ে সন্ধ্যার একটি ঘণ্টা মাত্র উপভোগ করতে এসেছেন জনগণমন নেতা কলিমউদ্দিন মৃধা।

তিনি একটু গোপনেই এসেছেন, যাতে জনগণ তাকে দেখে না ফেলে।

শুকুর মজিদ বলেন, এইমাত্র আপনে দিনাজপুর থেকে ফিরলেন, আমার জইন্যে যে একটা ঘণ্টা দিতে পারলেন আই অ্যাম ভেরি গ্রেটফুল।

কলিমউদ্দিন মৃধা বলেন, আমরা পিপলের পলিটিশিয়ান, আমাগো ডাক দিলে আমরা ফিরাইতে পারি না, আপনের সঙ্গে আমার আগেই বসা দরকার ছিল।

শুকুর মজিদ বলেন, সেইটা আমরা ভাইগ্যে হয় নাই, এই ইভনিংটা আমার জইন্যে আনফরগেটবল হয়ে থাকবে, আপনে ত বড় মিনিস্ট্রি পাবেন।

কলিমউদ্দিন মৃধা বলেন, জনগণ যদি দয়া করে, যদি পাওয়ারে যাইতে পারি, মিনিস্ট্রি ত একটা পাবই, এখন আপনেরা দোয়া করবেন।

শুকুর মজিদ বলেন, আমাদের লাইনের মিনিস্ট্রি পাইলে ভাল হয়, আমরা দুই চাইরবার দেখা করতে যেতে পারবো। গত বচ্ছরগুলি খুবই খারাপ গেছে, তবে ছাড়ি নাই, আশায় আশায় আছিলাম আপনেরা পাওয়ারে আসবেন। আমি ত মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙ্গালি, মনে মনে সব সোম সোনার বাংলা গাই।

কলিমউদ্দিন মৃধা বলেন, বাঙ্গালি হইতেই হইব, দ্যাশরে ভালবাসতেই হইব, অরা, ত আইজও পাকিস্থান চায়, অদের মুক্তিযুদ্ধের চ্যাতনা নাই।

শুক্কুর মজিদ বলেন, একটা কথা বলতে চাই, আমি সামান্য কিছু কন্ট্রিবিউট করতে চাই, দয়া কইর‍্যা নিবেন।

কলিমউদ্দিন মৃধা বলেন, জনগণের কন্ট্রিবিউশনের উপরই ত আমাদের চলতে হয়, আমরা ত বিশ বচ্ছর ধরে খাই নাই। অরা খাইছে, অগো অভাব নাই, আরো খাইতে চায়। একটু বেশি কইরাই দিয়েন, পাওয়ারে আসলে আদায় কইর‍্যা দিব।

শুকুর মজিদ বলেন, পার্টি আর আপনের জইন্যে এককোটি ধইর‍্যা রাখছি, আমি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ, সমাজতন্ত্রেও আগে বিশ্বাস করতাম, আল্লার রহমতে ট্যাকার আমার অভাব নাই, আপনেরা আসলে আরো হইব। আমরা এদেরও পলিটিকেল ইন্টিমেট আলাপ আর শুনতে চাই না; কারো প্রাইভেসিতে উঁকি দেওন ঠিক না।

৭. নমিনেশন পেপার জমা

নমিনেশন পেপার জমা দেওনের সময় আইসে গেছে, আর আমরা দেখতে পাচ্ছি তাগো মধ্যে, মায়ের পেটে থিকা যারা পলিটিশিয়ান হইয়া খালাস হইছিলেন, আর তাদের মধ্যে, যারা মায়ের পেট থিকা পলিটিশিয়ান হইয়া খালাস হন নাই, বলন যায় যারা বাপের প্যাট থিকা পলিটিশিয়ান হইছেন–ফাইলে সই করতে লেফরাইট করতে করতে পলিটিশিয়ান হইছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে, শহরের ফুলের দোকানে ফুলের টান পইড়া যাচ্ছে। তোড়া বানাতে বানাতে ফুলের দোকানের পোলাপানগুলির হাত বেদনায় টনটন করছে আঙুল পচে যাচ্ছে। একেক জ্যানারেল একেক কর্নেল ম্যাজর ব্রিগেডিয়ার একেক সেক্রেটারি বড়ো বড়ো ফুলের তোড়া নিয়া মহাজননেত্রী আর মহাদেশনেত্রীর কাছে হাজির হয়ে তাঁদের নীতিতে অবিচল আস্থা আনতেছেন। আরো মজার কাণ্ড হচ্ছে অনেক পুরানা মিনিস্টারমন্ত্রী, যারা রাজবংশ বদলাইয়া বদলাইয়া বড়ো হইছেন, তাঁরা আগের বংশ ছাইড়া মুখে বিরাট হাসি ঝুলাইয়া নতুন বংশে যোগ দিতেছেন। আমরা এইতে মনে কিছু করি না, বরং খুশি হই যে এইরা হইছে আসল পলিটিশিয়ান, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জ্ঞানবুদ্ধি খালি বাড়তেছেই, তারা আগের বংশে গিয়া ভুল করছিলেন, প্রাণ ভরে জনগণের স্যাবা করতে পারেন নি, এইবার সেই ভুল বুঝতে পারছেন, তাই নতুন বংশে যোগ দিতেছেন। এইটা হইল খাঁটি পলিটিক্স। তাদের বড়ো বড়ো ছবি ছাপা হচ্ছে দেখে আমরা মূর্খ জনগণরা খুশিতে ভরে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে দ্যাশে মাস ভইর‍্যা ঈদ চলতাছে, আমাদের সুখের সীমা নাই।

অপসর নেয়া সেই আইনপতি বদিউজ্জামাল পাইকারকে আমরা রাজাকার বইল্যাই জানি, ওই যে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্থানিগো গোলাম আছিলেন; তারপর তিনি। শক্তির

উৎসবাদীতে যোগ দিছিলেন, মিনিস্টার হইছিলেন, তারপর তিনি খোজারাজবংশে গিয়া আরো বড়ো মন্ত্রী হইছিলেন, আমরা তাজ্জব হইয়া দেখতে পাইলাম বদিউজ্জামাল পাইকার বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ উড়াইয়া ফুলের তোড়া বাড়াইয়া একেবারে স্বাধীনতার দলে জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশে গিয়া যোগ দিলেন। কাগজে সেই ছবি দেইখা আমদের চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইতে চায়।

আমরা ভাবছিলাম জনগণের মহাজননেত্রী এইটারে নিবেন না।

কিন্তু মহাদেশনেত্রী হাসিতে বাংলাদেশ ভরাইয়া ফুলের তোড়া লইতে লইতে আমগো প্রাণের কথা বললেন।

তিনি বললেন, বদিউজ্জামাল পাইকার একজন মহান পলিটিশিয়ান, দ্যাশের স্যাবা করাই তার জীবনের ব্রত, আমাদের বংশ তাকে পাইয়া ধন্য হলো। এইবার আমাদের বিজয় নিশ্চিত, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের জয় কেউ ঠ্যাকাইতে পারবে না। দ্যাশে ড্যামোক্রেসি আসতে দেরি নাই।

আমাদের প্রাণের কথা শুনে আমরা সুখী হইলাম।

দুই চাইরটা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী মুখ খুলতে গিয়া মহাজননেত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া মুখ বন্ধ করে মুগ্ধ হয়ে রইলেন।

বদিউজ্জামাল পাইকার বললেন, যেই বংশ ফ্রিডম ফাইটিং করছে, দ্যাশে লিবারেশন আনছে, সেই বংশে আসতে পাইরা আমি খোদার কাছে শুকরিয়া জানাইতেছি। আমি মহাদেশনেত্রীর নীতিতে চিরকালই আস্থা পোষণ করি, তিনিই দ্যাশের সব, তার পিছনে দারাইতে পাইরা আমার জীবন ধন্য হইল।

আমরা বোঝতে পারি পলিটিক্স হইছে জীবন্ত ব্যাপার, তার বদল ঘটে; মানুষ আগে যা বোঝতে পারে নাই আজ তা বোঝাতে পারব না, সেইটা কোনো কথা না। পলিটিক্সে বারবার বোঝতে হয়, কবরে যাওনের আগেও বোঝতে হয়।

জ্যানারেল টিপ সুলতান খুব আপন লোক আছিলেন জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশের। ওই বংশ থিকা অনেক কিছু পাইছেন; এইবার তিনি রাজনীতি করবেন বইল্যা শোনতে পেলাম। আমরা ধইরাই নিছিলাম তিনি জনগণমনে যোগ দিবেন, মুক্তিযুদ্ধকে আগাই দিবেন। আমরা শোনতে পাই মুক্তিযুদ্ধ আইজও শ্যাষ হয় নাই, যুদ্ধ চলতেছে।

আমরা যা দ্যাখলাম তাতে খুশি হওন ছাড়া উপায় নাই।

তিনি ঢাকা ক্লাবের ফুলের দোকান থিকা দুই শো কেজি একখানা তোড়া নিয়া গিয়া শক্তির উৎসবাদী বংশের মহাদেশনেত্রীর নিকট হাজির হলেন। মহাদেশনেত্রী অতো ভারি তোড়া আগলাইতে পারছিলেন না বলে জনতিনেক রাজপুরুষ ফুলের তোড়া কান্ধে করে দাঁড়াইলেন। ফুলের জীবন ধন্য হইল।

তিনি মহাদেশনেত্রীর পায়ে হাত দিয়া সালাম করিলেন। এইটা পলিটিক্স।

মহাদেশনেত্রী বললেন, জ্যানারেল টিপ সুলতান দ্যাশের গৌরব, তিনি আমদের বংশেরও গৌরব, আমাদের ভিক্টরি কেউ আটকাইতে পারবে না। আমরা পাওয়ারে যাবই। পিপল আমাগো ভোট দেয়ার জইন্য ওয়েট করছে।

টিপ সুলতান বললেন, মহাদেশনেত্রীর পায়ে হাত দিয়া আমি আমার কান্ট্রির পায়ে হাত দিলাম, পিপলের পায়ে হাত দিলাম, আই অলোয়েজ সার্ভড় মাই কান্ট্রি, ফ্রম নাউ অন আই শ্যাল সার্ভ মাই মহাদেশনেত্রী অ্যান্ড মাই কান্ট্রি টুগেদার উই আর সার্টেন টু গো টু পাওয়ার, বাংলাদেশে উৎসবাদী বংশ ছাড়া পাওয়ারে যাওয়ার কারো রাইট নাই। মহাদেশনেত্রী জিন্দাবাদ।

আমরাও দূর থিকা জিন্দাবাদ দিতে থাকছি।

এইভাবে বর্ন পলিটিশিয়ানরা পিতার পেট থিকা খালাস হওয়া পলিটিশিয়ানরা পাঙ্গাশরা দ্যাশরে পলিটিক্সে মাতিয়ে তুলছেন, আমাদের ভাবনাচিন্তা একেবারে লোপ পেতে বসছে, আমরা যা ভাবি–মূর্খ আমরা, ভাবতে পারি না, গরিবের আবার ভাবনা কী–পলিটিশিয়ানরা তার উল্টো ভাবেন উল্টা করেন। এইখানে রাজা আর প্রজার চিন্তার ফারাক, রাজার চিন্তা আর কর্ম হচ্ছে রাজকীয়, প্রজার চিন্তা আর কাম হইছে প্রজাকীয়, দুইটা বিপরীত হইবই।

বাজারে খুব গুজব উঠছিলো যে অপসর পাওয়া বিখ্যাত সেক্রেটারি আলাউদ্দিন মিয়া শক্তির উৎসবাদী বংশে গিয়া যোগ দিবেন; ওই বংশ তার জইন্যে অনেক করছে, দুই তিনবার অ্যাক্সটেনশন দিয়া তারে বুড়া কইর‍্যা ফেলছে, কিন্তু তিনি বুড়া হন নাই, একেবারে

তরতাজা আছেন, তিনিও তাগো জইন্যে অনেক করছেন, কিন্তু ঘুম থিকা উঠে কাগজে দ্যাখলাম তিনি জনগণমন গণতান্ত্রিক বংশে যোগ দিয়া বড় বক্তৃতা দিয়ে বসছেন।

তিনি বলছেন, উৎসআলার দ্যাশরে করাপশনে ভরে দিছে। অ্যাট দ্যাট টাইম আমি আটটা মিনিস্ট্রির সেক্রেটারি ছিলাম, দেখছি ওই দলের মিনিস্টার এমপিরা পুকুর থিকা কলসি ভরে পানি তোলার মতো ব্যাংক থিকা টাকা তুলে নিছে। দে আর এ প্যাক অফ করাপ্ট পিপল, দে আর রবার্স, যারা দেশরে ডুবিয়ে দিছে। দেশরে উদ্ধার করার জইন্যে মহাজননেত্রীর প্রিন্সিপালই আসল, তাই আমি এই বংশে জয়েন করে ধন্য হলাম। আমি, ফ্রিডম ফাঁইটার ছিলাম, মরা পর্যন্ত ফ্রিডম ফাঁইটার থাকব।

শুনে আমরা হাতে হাতে তালে তালে তালি দিতেছি।

মহাজননেত্রী বললেন, যেই বংশে আলাউদ্দিন মিয়া সাহেবের মত দশটা মিনিস্ট্রির সেক্রেটারি যোগ দিলেন, সেই বংশ জনগণের নিজের বংশ, এই বংশ পিপলের কথা চিন্তা করা ছারা আর কিছু চিন্তা করে না, পিপল এইবার আমাদের বংশরে পাওয়ারে। পাঠাইবই, ইনশাল্লা। তারা পাওয়ার কাইরা নিছিল, জনগণ তা এইবার নিয়া আসবে, আমরা দ্যাশে পিপলেল ড্যামোক্রেসি প্রতিষ্ঠা করব।

পাল্টা দিকে উল্টা কারবার করে বসছেন ছয় মিনিস্ট্রির অপসরআলা সেক্রেটারি মোহাম্মদ আজম সৈয়দ। তারে আমরা ভাবছিলাম জনগণমন বংশের লোক, সেই শুরুর সময় এক লাফে তিনি টংয়ের পর টংয়ে উঠছিলেন, গতবারও তারে দেখছি জনগণের রাজবংশে ফ্রিডম ফাইটিং আর আল্লতাল্লা নিয়ে লাফের পর লাফ দিতে, এইবার দেখি তিনি জয়েন

করছেন শক্তির উৎসবাদী রাজবংশে, বড় বড় কথা বলছেন মহাদেশনেত্রী আর তার মহান স্বামী সম্পর্কে। তাঁর ফুলের তোড়াটার ওজন পাঁচ শো কেজি, পিপলেরও সাধ্য নাই ওই তোড়া তুইল্যা বুকের কাছে ধরে।

পলিটিক্স ব্যাপারটাই পলিটিকেল, জনগণের জনকেরও সাধ্য নাই বোঝে।

মহাদেশনেত্রী ওই তোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশে বলছেন, মোহাম্মদ আজম সৈয়দ প্রমাণ করেছেন আমাদের বংশই আসল বংশ, পিপল আমাদের বংশরেই পাওয়ারে দেখতে চায়, তিনি অদের বংশ ত্যাগ করে আসছেন, কারণ পিপল ওই বংশরে চায় না, ওই বংশরা দ্যাশটারে সেল করে দিবে, দ্যাশের ফ্রিডম থাকবে না, দ্যাশটারে ভুটান কইর‍্যা তুলবে।

মোহাম্মদ আজম সৈয়দ বলেন, এই দ্যাশের অল টাইমের পলিটিশিয়ানদের মধ্যে মহাদেশনেত্রী একজন গ্রেট পলিটিশিয়ান, শি ইজ দি ওয়াইফ অফ দি গ্রেটেস্ট পলিটিশিয়ান এভার বর্ন ইন আওয়ার কান্ট্রি, তার পেছনে দারাতে পেরে আমি ধন্য হলাম, জনগনআলাজ আর বিট্রেয়ার্স, দে আর কাফে, পিপল তাদের ভোট দিবে না, তারা পাওয়ারে যেতে পারবে না। দে উইল ডেস্ট্রয় দি কান্ট্রি ইফ দে ক্যান গো টু পাওয়ার।

নমিনেশন পেপার জমা দেয়ার ধুম পড়ে গেছে দেশে।

দলে দলে সারা দ্যাশ থিকা পলিটিশিয়ানরা আইসা নমিনেশন পেপার জমা দিতেছে; বেশি নমিনেশন পেপার জমা পড়তেছে দুই বংশের বাক্সে, তারা একেকদিন একটা আরেকটাকে ছাড়াই যাইতেছে। হাজার হাজার পলিটিশিয়ান, হাজার হাজার নমিনেশন পেপার, হাজার

হাজার ফুলের তোড়া, লাখ লাখ সাপোর্টার। দ্যাশে ড্যামোক্রেসির পৌষমাসের মেলা বসে গেছে। আমাদের দেশ হইল পৃথিবীর সবচেয় ঘন গণতন্ত্র ডেন্সেস্ট ড্যামোক্রেসি।

জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশের মহাজননেত্রী আর রাজপুরুষেরা বেশ খুশি; কিন্তু বেশি খুশি হতে পারছেন না।

শক্তির উৎসবাদী রাজবংশের মহাদেশনেত্রী ও রাজপুরুষেরা বেশ বিচলিত; কিন্তু বিচলিত খুশির মইধ্যে আছেন।

রাজাকার রাজবংশ বিসমিল্লা বলে আল্লার নামে সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

খোজাগণতান্ত্রিক রাজবংশ চুরমার, মাজা ভাঙা কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আর আর রাজবংশ পলিটিশিয়ান খুঁজে পাচ্ছে না।

মহাজননেত্রী রাজপুরুষদের নিয়ে বসেছেন; তাঁরা নমিনেশন পেপার জমা পড়নের তাৎপর্য আর সম্ভাব্য রেজাল্ট সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

মহাজননেত্রী বলেন, আমাগো বংশের বাক্সেই এইবার সবচাইতে বেশি পেপার পড়ছে, কেভিডেটরাও ভাল, এইবার জনগণ যদি মুখ তুইল্যা চায়।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান বলেন, অন্য বংশ থিকা ভাইগ্যাও আমাগো দলেই ক্যান্ডিডেট বেশি আসছে, এইটাও সুলক্ষণ, পলিটিক্সের টেন্ডেন্সিটা বুঝা যাইতেছে, এখন আল্লা আর জনগণ মুখ তুইল্যা চাইলেয় হয়।

কলিমউদ্দিন মৃধা বলেন, তয় তিন চাইরটা জ্যানারেল আর সেক্রেটারি বিট্রে করছে, এতবার প্রমিজ করল আমাগো কাছে যে আমাগো দলে জয়েন করবো, ক্যান্ডিডেট হইব, কিন্তু বিট্রে করলো।

মহাজননেত্রী বলেন, অইগুলি সবই কি উৎসআলাগো নমিনেশন পাইব? অগো বংশ ত আগে থিকাই জ্যানারেল আর সেক্রেটারিতে ভইরা আছে। অইগুলির উপর চোখ রাখতে হইব, দরকারে আসবে।

মোহাম্মদ রজ্জব আলি বলেন, অইটা হইল মেলিটারি আর আমলাগো দল, অই রকম ক্যান্ডিডেট তারা ছারব না, যত পাইব ততই লইব। সবগুলিরেই ননিনেশন দিব, জনগণরে অরা এইসব দেখাইয়া বুঝাইতে চায় যে উত্তর পারা অগো লগে আছে, আসল জায়গায় অগো পাওয়ার আছে।

মহাজননেত্রী একটু বিচলিত হন; একটু পর তিনি বলেন, চোখ রাখতে হবে জ্যানারেলগো মইধ্যে কে কে বাদ পড়লো, পছন্দ হইলে আমরা তাগো ধইর‍্যা আনুম। উত্তর পারা আমাগোও এইটা এইবার আমরাও দেখায়ে দিব। দুই একজনের কথা আমি ভাইব্যা রাখছি।

মোহাম্মদ আবদুল হাই বলেন, কারে কারে ধইরা আনতে হবে বইলেন, আমরা ধইর‍্যা আনুম। অগো নমিনেশনের দিন অগো অফিসের কাছে লোক দারা করে রাখুম, তারা ধইরা নিয়া আসবো।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, জংধরা কাচিহাতুড়িআলারা যে ধরাধরি করতেছে, এইবার তাগো কি করব?

মহাজননেত্রী বলেন, অই বেইমানগুলিরে এইবার দরজায়ও আসতে দিব না। গেলবার অইগুলিরে দিয়া ঠকছি, মোনাফেকের মতন গোপনে গোপনে আমাগো বিরুদ্ধে কেন্ডিডেট দিছে, উৎসআলাগো সঙ্গে প্যাক্ট করছে, আর কয়টা মোনাফেক বেইমান পাশ কইর‍্যা অগো লগে গিয়া যোগ দিছে। অইগুলির মুখে ঝারু মারি।

মোহাম্মদ আবদুল হাই বলেন, সারা দুইন্যা ভইর‍্যা অইগুলি বেইমানি করতেছে আর ডোবতেছে, দ্যাশের মানুষ অগো চায় না।

মোহাম্মদ রজ্জব আলি বলেন, নমিনেশন পেপার ত জমা পরলো, এইবার ওমরাটা কইর‍্যা আসন দরকার। আল্লার ঘরে গিয়া নামাজ পইরা কান্দনকাটন দরকার, রহমানুর রহিম এইবার যদি মুখ তুইল্যা চায়।

মহাজননেত্রী বলেন, পরশু দিনই ওমরা করতে চলেন, দিনটা ভাল আছে, ওমরাটা সাইর‍্যা এসে নমিনেশন দিব। আল্লারে ডাইক্যা আসলে তিনি মুখ তুইল্যা চাইবেন, জনগণও এইটা ভাল চোখ দেখব, তারাও মুখ তুইল্যা চাইব।

তাঁরা ঠিক করে ফেলেন পরশু দিনই ওমরা করতে যাবেন, চল্লিশজনের একটা বড়ো দল যাবেন, আল্লার আর জনগণের চোখে এইটা না পইড়্যা পারে না। এসে তাঁরা ক্যান্ডিডেটদের ইন্টারভিউ নেবেন, বাছাই করে নেবেন ঘেঁকে হেঁকে, দেখে দেখে, অনেককে এরই মাঝে দেখে রেখেছেন, বেস্ট ক্যান্ডিডেট নেবেন, যাদের নাম আছে ডাক আছে পপুলারিটি আছে ট্যাকা (এইটা এক নম্বর) আছে (আর হাতে ভাল ক্যাডার আছে, এইটা দরকার, নিউট্রাল পিসফুল ইলেকশনেও এইটা ছাড়া চলে না–এইটা চুপে চুপে আলাপ করা হয়)।

শক্তির উৎসবাদী গণতান্ত্রিক রাজবংশের বাক্সেও নমিনেশন পাওয়ার দরখাস্ত বোঝাই হয়ে উঠেছে, তবু তাদের চিন্তা যাচ্ছে না, শুধু চিন্তা করতে হচ্ছে; বৈঠকে বসে তাঁরা নানারূপ পলিটিকেল চিন্তাভাবনা করছেন।

মহাদেশনেত্রী বলেন, আপনাদের কি মনে হয়? ঠিক ক্যান্ডিডেটরা নমিনেশনের জইন্য দরখাস্ত করছে ত?

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, ভাল দরখাস্ত পরছে, সবই পাওয়ারফুল পপুলার মানিড। ক্যান্ডিডেট, কারে রাইখ্যা কারে নমিনেশন দিব, তা ঠিক করাই ডিফিকাল্ট হইব। ভাল ক্যান্ডিডেট দিতে হইব।

অবজেনারেল কেরামতউদ্দিন বলেন, উই মাস্ট নমিনেট দি বেস্ট ক্যান্ডিডেটস্ হু হ্যাভ মানি, পাওয়ার, অ্যান্ড পপুলারিটি। ইলেকশনে উইন করতেই হবে।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, মহাদেশনেত্রী চাইরটা আসনেই দারাইবেন, অই সিটগুলি আমাগো সিউর সিট, পরেও আমাগো হইব, মহাদেশনেত্রীর ইমেজটাও ঠিক থাকবো; আর বংশের লিডাররা যারা চাইবেন তারা দুইটা কইর‍্যা আসনে দারাইবেন।

কেরামতউদ্দিন বলেন, দিস ইজ দি বেস্ট প্রিন্সিপাল ইন নমিনেটিং আওয়ার ক্যান্ডিডেট্র, আমাদের লিডারদের পপুলারিটি পিপলকে শো করা দরকার। ফরেন অ্যাজেন্টরাও বোঝতে পারবে আমাদের দল কত স্ট্রং।

মহাদেশনেত্রী বলেন, আপনারা বেস্ট প্রিন্সিপালই নিবেন, পাওয়ারে আমাদের যাইতেই হবে, অরা দ্যাশটারে সেল করবে, তা হইতে দিব না।

মোহাম্মদ কুদ্দুস চৌধুরী বলেন, পিপল অদের চায় না, দে আর ইন অ্যান ইলিউশন, পিপল লাভ আস, পিপল আমাদের ভোট দিবে।

মোহাম্মদ সোলায়মান হাওলাদার বলেন, ওমরা করার সময় এসে গেছে। আমাদের মাননীয় মহাদেশনেত্রীর পক্ষে কখন সময় হবে? ওমরার উপর ইলেকশন অনেকখানি ডিপেন্ড করে।

মহাদেশনেত্রী বলেন, ওমরা ত করতেই হবে। মহামান্য কিংয়ের সঙ্গেও মিট করার দরকার। সময়টা আপনেরা ঠিক করেন।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, জনগনআলারা কবে ওমরা করতে যাইতেছে, সেইটা দেখন দরকার। অগো পরে গেলেই পলিটিকেলি বেটার, আর অরা যতজন যাবে আমরা তার চাইতে বেশি যাব।

ব্যারিস্টার কুদরতে খুদা বলেন, ওমরায় যাওয়ার আগে পার্টি অফিসে একটা বড় মিলাদ মহফিল হওয়া নেসেসারি, পেপারগুলিতে তার ছবিও ছাপান দরকার। মিলাদের খুবই ইমপ্যাক্ট পিপলের উপর।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, খুব ভাল কথা, পরশুই অফিসে মিলাদ হবে। আল্লা রসুলের নাম নেয়া সব সময়ই ভাল, অন্যরাও ভাল চোখে দেখে।

ডঃ কদম রসুল বলেন, আমার মনে একটা চিন্তা আসছে, সেইটা করন যায় কি না একটু ভাইব্যা দেখনের জইন্যে রিকুয়েস্ট করতেছি। আমার মনে হয় এইতে আমাগো আরো ভাল হইব।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, ভাই, চিন্তাটা বইল্যা ফ্যালেন।

ডঃ কদম রসুল বলেন, অগো বান মারন যায় কি না একটু ভাইব্যা দেখন দরকার। একটা দোয়া আছে সেইটা দিয়া অগো আর পিপলের মইধ্যে চিরকালের জইন্যে শত্রুতা সৃষ্টি করনের তদবিরটা আমরা কইর‍্যা দেকতে পারি, আমি দোয়াটা আর ডিজাইনটা বই থিকা ফটোকপি কইর‍্যা রাখছি।

কথাটি শুনে সবাই বিব্রত হয়, মহাদেশনেত্রী তাঁর নখ দেখতে থাকেন।

রুস্তম আলি পন্টু বলেন, ইলেকশনে উইন করার জইন্যে সব কিছুই আমাগো করন দরকার, সব রকমের বানই আমাগো মারন দরকার; তবে কথাটা হইল এইটা বড় কঠিন কাজ। এইটা করনের লিগা বারো কোটি মাইনষের কেইশ ছিইর‍্যা আনতে হইব আর জনগনআলাগো মরা আর

সব লিডারের কেইশ ছিইর‍্যা আনতে হইব। এইটা করতে গেলে কয়েক বছর লাগবো।

কেরামতউদ্দিন বলেন, উই ক্যান ডু দ্যাট আফটার উই গো টু পাওয়ার। উই ক্যান ইস্টাবলিশ এ ন্যাশনাল হ্যাঁয়ার ব্যাংক, অ্যান্ড কালেক্ট পিপলস্ হ্যাঁয়ার। ইট উইল বি অ্যান অ্যাচিভমেন্ট।

তাঁরা আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ পলিটিকেল আলোচনা ও ডিসিশন গ্রহণ করেন।

মহাজননেত্রী চল্লিশজনের একটি দল নিয়ে ওমরা করতে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় আমরা দেখতে পাই তার চেহারাই বদলে গেছে, বাঙালি বলে চিনুন যাচ্ছে না; আমরা ভয় পাইতে থাকি যখন তিনি ফিরবেন তখন তাঁকে আমরা একেবারেই চিনতে পারবো কি না। তিনি হয়তো খাঁটি মরুভূমি খাঁটি মুসলমান হয়ে ফিরবেন। জনগণ পছন্দ করবে। আমরা পিপলরা চিরকালই বিদেশি দেখলেই পাগল হই, মরুভূমি দেখলে মুগ্ধ হই।

ওমরাটা থাকায় খুব সুবিধা হইছে পলিটিশিয়ানগো, তাগো আর আরবি বছরের বারো নম্বর মাস আলহিজার জইন্যে বসে থাকতে হয় না। বসে থাকতে হইলে। ড্যামোক্রেসির পলিটিক্সে প্রাণ আসতো না, চামও থাকতো না। শুনতে পাই সত্য মিথ্যা আমরা গরিবরা জানি না, আমাগো অত ট্যাকা নাই যে হজও করবো আবার সোনাও। কিইন্যা নিয়া আসবো, আমরা শোনতে পাই পলিটিকেল ওমরার নিয়মকানুনও পলিটিকেলি আলাদা।

মহাজননেত্রী যেদিন ওমরা করনের জইন্যে গেলেন সেই দিন আমাগো সুফিয়া রিয়াদ থিকা ফিইর‍্যা আসলো। সে জীবিত আসে নাই, সুফিয়া ফিরে আসতে পারে নাই, সুফিয়ার লাশ ফিরে আসছে।

সুফিয়া ওমরা বা হজ করতে সেইখানে যায় নাই, সুফিয়া সেইখানে গেছিল চাকরানি হইয়া, বান্দি খাটতে। ফিরে আসলো লাশ হইয়া।

অমন মাইয়া লাশ হইব না ত কি হইব, অর জন্মই হইছিল লাশ হওনের জইন্যে। অর ভাইগ্য ভাল পবিত্র দ্যাশে গিয়া লাশ হইছে, ভেস্তে যাইব।

মাইয়ামানুষ কি আর মানুষ, যেই ভাইগ্য নিয়া আসছিল তা মানলে সুফিয়া দ্যাশেই থাকতে পারত, বাইচ্যাও থাকতে পারতো হয়তো।

তয় মাইয়ামানুষের বাচন মরনের মইধ্যে তফাৎ কি।

সুফিয়ার বাবা আমাগো মতই গরিব ছিলো, তবু অই মেয়েটাকে লেখাপড়া শিখাইতে সে চ্যাষ্টা করছিলো। আরেকটা খারাপ জিনিশ হইল মাইয়াটা সুন্দরও ছিলো, লোকটা মাইয়ার জইন্যে জান দিত। এইটে ওঠনের পর মাইয়াটা দেখতে এত সোন্দর হয় যে গ্রামের ড্যাকরাগুলি ইস্কুলে যাওয়া আসার পথে অর হাত ধইরা টানাটানি করত। কয়টারে ও চড়চাপড়ও দিছে। কিন্তু বাপটা কিছু না রেখে মইরা যায়। ড্যাকরাগো টানাটানি সইজ্য করতে না পেরে সুফিয়া ঢাকা চইল্যা আসে। সুফিয়া বুঝতে পারে তার লেখাপড়া আর হইব না, তার রুজি করতে হবে। নিজে খাইতে হবে, মারে আর দুইটা ভাইবোনরে খাওয়াইতে হবে।

ঢাকায় সুফিয়া গার্মেন্টসে একটা কাজ নেয়; কিন্তু সেইখানে অর যা বেতন তার চেয়ে প্রেমিক অনেক বেশি দেখা দেয়। সুফিয়া দেখতে পায় রাস্তাঘাট কল কারখানা মেশিন চেয়ার টেবিল সবই প্রেমিক, প্রেমে চাইরপাশ ভাইস্যা যাচ্ছে। সুফিয়া প্রেমিকদের প্রেমনিবেদন, টানাটানি, চিঠিপত্র, টিপন, জড়াই ধরন, বেড়ানের দাওৎ আর আর জিনিশে পাগল হয়ে উঠতে থাকে।

সুফিয়া ঠিক করে এইখানে আর থাকন যায় না। অর দেহটা কুকুর শিয়ালগো চোখে পড়ছে, তারা না খাইয়া ছাড়বো না।

সুফিয়া একদিন একটা বিজ্ঞাপনে দেখতে পায় যে রিয়াদে কিছু গৃহপরিচারিকা লাগবে, যারা গৃহপরিচারিকার কাজ করতে চায় তারা আবেদন করতে পারে। তরুণী হইলে ভাল হয়, সুন্দরী হইলে আরো ভাল হয়। অত্যন্ত ধনী পরিবার, বেতন মাসে দশ হাজার টাকা,

যাওনের, আর তিন বছর পর পর দেশে আসার ফিরে যাওয়ার খরচ ওই পরিবার বহন করবে। অপূর্ব সুযোগ!

সুফিয়া সাথে সাথে আবেদনপত্র লিখে ওই ম্যানপাওয়ার এজেন্সিতে হাজির হয়। তার ইচ্ছে করছিলো এখনই রিয়াদে চলে যেতে, যাতে ওই গার্মেন্টসে আর যেতে না হয়। এজেন্সির এমডি সাহেব সুফিয়াকে দেখার সাথে সাথে তাকে নির্বাচন করেন, সুফিয়া তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে। সুফিয়ার ভালোও লাগে, কিন্তু একটা ভয় সে নিজের ভেতরে টের পায়। এমডি সাহেব ঠিক করে ফেলেন, আরবরা এমন মালই চায়, বুক উচা, পাছা বড়, শরীর ঢলঢলে, তার উপর মুখটাও সোন্দর। এমডি সাহেব তিন দিন পর তার সাথে সুফিয়াকে দেখা করতে বলেন। সুফিয়া যখন বেরিয়ে আসছিলো এমডি সাহেব তার বুকে ও পাছায় হাত দিয়ে আদর করেন। সুফিয়া ভয় পায়, কেঁপে ওঠে।

তিন দিন পর সে কি যাবে এমডি সাহেবের কাছে? সুফিয়া ঠিক করতে পারে না; একবার মনে হয় যাবে না, আরেকবার মনে হয় যাবে, মাসে দশ হাজার টাকা তাকে রুজি করতে হবে, নিজে বাঁচতে হবে, মা ভাইবোনদের বাঁচাতে হবে। বুকে পাছায় এক আধটু হাত তো পড়বেই যেখানেই থাকি, এটা মেনে নিতে হবে। বুক আর পাছার এমন কি দাম।

তিন দিন পর সুফিয়া উপস্থিত হয় এমডি সাহেবের কাছে। এমডি সাহেব তাকে জানান তার মেইড সার্ভেন্টের চাকুরি হয়ে গেছে, সে খুব উপযুক্ত; পনেরো দিনের মধ্যে তাকে রিয়াদের উদ্দেশে বিমানে উঠতে হবে। এমডি সাহেব তাকে কাগজপত্র দেন, বাড়িতে সকলের সাথে দেখা করে আসতে বলেন। এমডি সাহেব তার বুক আর পাছায় একটু

বেশি করে আদর করেন, কিন্তু চাকুরির আনন্দে সুফিয়ার তা খারাপ লাগে না, একটু ভালোই লাগে।

বিশ দিনের মধ্যে সুফিয়া রিয়াদে বান্দি খাটার জন্যে ঢাকা ছেড়ে যায়। নিজেকে তার আকাশের পাখি মনে হয়।

সে মনে মনে দেখতে পায় তার রিয়াদের মনিবের স্ত্রী কন্যারা তার জন্যে বিমানবন্দরে এসেছে; তারা দেখতে কি সুন্দর, সে তাদের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করবে, তাকে দেখে তাদের পছন্দ হবে। প্রাণ দিয়ে সে সেবা করবে সকলের, দশ হাজার টাকা, মাসে দশ হাজার টাকা, দেশে সে কোনো দিন পাবে না। দেশে সে টাকা পাঠাবে, মা ভাইবোন ভালো থাকবে, এবং সে টাকা জমাবে।

বিমানবন্দরে সুফিয়া দেখতে পায় দুটি বিকট ইয়ামেনি চাকর তাকে নিতে এসেছে। বিকট, অত্যন্ত বিকট। তাদের হাতে ইংরেজিতে তার নাম লেখা একটি কার্ড। চাকর দুটিকে দেখেই সে ভয় পায়, সে কেঁপে ওঠে, চারদিকে সে মরুভূমি দেখতে পায়। তখন মধ্যরাত, রাত তাকে ঢেকে ফেলে। সে তাদের সাথে গাড়িতে উঠে বসে। অনেক রাতে সে মনিবের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে। বাড়ির সামনে কোনো আলো নেই, সামনে সে ভীষণ একটা দালানের ভুত দাঁড়ানো দেখতে পায়।

বাড়িতে তখন মনিবেরা নেই, তারা হজে গেছে।

অন্ধকার, অল্প আলো, অন্ধকার, বিকট কক্ষের পর কক্ষ পেরিয়ে একটি আরব বুড়ী সুফিয়াকে তার ভেজা স্যাৎসেতে রঙচটা কক্ষে নিয়ে আসে। সুফিয়া বারবার শিউরে উঠতে থাকে। সুফিয়া কিছুটা ইংরেজি জানে, বুড়ী জানে না; তাই তাদের কোনো কথা হয় না। বুড়ী তাকে কয়েকটি খেজুর আর বিস্কুট খেতে দেয়, চাও দেয়। সুফিয়া কিছুই খেতে পারে না; তার বমি পেতে থাকে। তার মনে হয় সারাটা বাড়ি, বিকট অন্ধকার, আর বিশাল মরুভূমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সুফিয়া একবার তীব্র চিৎকার করে ওঠে, তার চিৎকার বিকট প্রতিধ্বনি হয়ে তার কানে ফিরে ফিরে আসতে থাকে। সুফিয়া বিছানায় বসে পড়ে, সে দুর্গন্ধ পায়, শোয়ার তার ইচ্ছে হয় না, ভোরে তার ঘুমঘুম চোখে আলো এসে ঢোকে।

তার ঘর, বিছানা, আর বালিশ দেখে সুফিয়া লাফিয়ে বিছানা থেকে নামে। বিছানার চাদরটা ঘিনঘিনে নোংরা, বালিশটা চিটচিটে; দূরে খেজুর আর বিস্কুটের থালায় কয়েকটি তেলাপোকা জটলা করছে। তেলাপোকা সে এভাবেই ভয় পায়, সে চিৎকার করে ওঠে। ভোরের আলো অন্ধকার হয়ে ঢুকছে ঘরটিতে, ওই ভোরের আলোর অন্ধকারে সুফিয়া ঘরের এক কোণে একটি বাথরুমের দরোজা দেখতে পেয়ে দরোজা খোলে। বাথরুমটার অর্ধেক ভরে নোংরা, ট্যাপ খুলে দেখে তিরতির করে পানি পড়ছে, আর জংধরা শাওয়ারটি দিয়ে কোনো পানি বেরোচ্ছে না। একটা ময়লা সাবান পড়ে আছে সিংকে, ওই সাবান আর তিরতির পানিতে সে মুখ ধুতে শরীর ধুতে চেষ্টা করে। সে আল্লা আল্লা করতে থাকে, কিন্তু সে শুনতে পায় তার বুক ধকর ধকর করছে।

তখন বুড়ী এসে তার বাথরুমের দরোজায় ঢু দিতে থাকে।

বুড়ী সুফিয়াকে তার পিছে পিছে যেতে ইঙ্গিত করে, সুফিয়া ভয়ে ভয়ে তার পেছনে হাঁটে। বুড়ী তাকে রান্নাঘরে নিয়ে যায়, ঘরটি দেখায়, এবং তার হাতে ভুল ইংরেজিতে লেখা কাজের একটি তালিকা তুলে দেয়। সুফিয়ার বেশ কাজ। সে রাধুনীকে সাহায্য করবে, বাড়িঘর পরিষ্কার করবে, শিশুদের দেখাশোনা করবে। বুড়ী তাকে ব্রেকফাস্ট বানানোর ইঙ্গিত করে, সুফিয়া ব্রেকফাস্ট তৈরি করে। সকালের খাওয়ার পর সুফিয়া হাঁড়িকড়াই পরিষ্কার করে, রান্নাঘর ঝাঁট দেয়, আরো কয়েকটি ঘর পরিষ্কার করে।

ওই বাড়িতে সে একাই বান্দী নয়, আরো তিনজন আছে। দক্ষিণ ভারতের একটি প্রৌঢ়া রাধুনী আছে, শ্রীলংকার একটি যৌবনবতী বান্দী আছে, ফিলিপাইনের একটি রোগা ফ্যাকাশে মেয়ে আছে। বুড়ী রাধুনীটা সব সময়ই বিরক্ত, সে কারো সাথে কথা বলে না, মাঝেমাঝে একা একা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে আর পাঁচ মাস, ফিলিপাইনের রোগা মেয়েটে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, চোখ দুটি তার উন্মাদের চোখের মতো, সে মাঝেমাঝে এমনভাবে তাকায় যেনো সে খুব দূরে কিছু দেখছে পাচ্ছে। সুখী মনে হয় শ্রীলংকার যৌবনবতীকে, তার বিশেষ কোনো কাজ করতে হয় না, সে বেশি সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করতেই ব্যস্ত থাকে। সে ঢলঢল করে, পিঠ বাহু বুক থেকে কাঁপন ছড়ায়।

শ্রীলংকার যৌবনবতী সুফিয়ার কাছে এসে মাঝেমাঝেই বলে, মালিক আসছেন না, আমার ভালো লাগছে না।

সুফিয়া বুঝতে পারে না মালিক না এলে তার ভালো লাগবে না কেনো।

মেয়েটি বলে, মালিক আমাকে বহুত ভালোবাসেন, আমি মালিকের জান।

শুনে কেমন যেন লাগে সুফিয়ার।

মেয়েটি সুফিয়ার দিকে মাঝেমাঝে ঈর্ষার চোখে তাকায়।

মেয়েটি বলে, মক্কা থেকে ফিরে মালিক আমাকে সোনার হার কিনে দেবেন।

মালিক এতো ভালো? ভাবতে গিয়ে ভয় পায় সুফিয়া।

শ্রীলংকার যৌবনবতী সুন্দরী বাঁদিটি এক সময় সুফিয়াকে তার সামনে মডেলের মতো দাঁড়াতে বলে। মডেল? সুফিয়া প্রথম রাজি হয় না, কিন্তু তাকে দাঁড়াতেই হয়। মেয়েটি সুফিয়ার ঠোঁটে একটি আঙুল বুলিয়ে বলে, তোমার ঠোঁট পাতলা, মালিক পাতলা ঠোঁট পছন্দ করে না, তবে তার দুই ছেলে এমন ঠোঁট পছন্দ করে। সুফিয়া ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে বসে পড়তে চায়, পারে না; মেয়েটি তার বুকে ও পাছায় হাত দিয়ে দেখে বলে, মালিক তোমার বুক আর পাছা পছন্দ করবে। বড়ো বুক পাছা মালিকের পছন্দ। মেয়েটির চোখে সে ঈর্ষা দেখতে পায়। কিন্তু বড়ো বুক পাছা মালিকের পছন্দ–এর অর্থ কী, এর অর্থ কী, সুফিয়া বুঝতে পারে না; সে দৌড়ে তার ঘরে গিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ে।

তিনচার দিন পর মালিকের পরিবার ফিরে আসে।

মালিকের বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মতো, দেখতে সে কদর্য, দেখেই ঘেন্না লাগে। এখানে আসার পর সুন্দর কিছু দেখতে পায় নি সুফিয়া, যা দেখে তাই কদর্য। মালিকের চার বউ।

তাদের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। মালিকের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। সুফিয়া বুঝতে পারে তারা হঠাৎ ধনী হয়েছে, কিন্তু নিচু জাতের লোক, এমন লোকেরা আমাদের দেশে বস্তিতে থাকে। সবাই দেখতে কদর্য, চিৎকার ছাড়া কথা বলে না, তাদের খুব অদ্র অসভ্য মনে হয় সুফিয়ার। কোরান পড়া ছাড়া তারা আর লেখাপড়া জানে না। তাদের টাকা আছে, কেমন টাকা আছে সুফিয়া বুঝতে পারে না, সুফিয়া দেখতে পায় তারা কোনো কাজ করে না। কাজ না করে টাকা আসে কোথা থেকে?

মালিক বিকেলেই সুফিয়াকে তার ঘরে ডাকে। সুফিয়া কাঁপতে কাঁপতে মালিকের সামনে উপস্থিত হয়। সুফিয়া দেখে মালিক ও তার দুই বউ বসে আছে। সে সালাম করতে যায়, মালিক তাকে ধরে শুয়োরের মতো দুটি ময়লা হাত দিয়ে তার ঠোঁট, বুক, পাছা টেপে। তার চামড়া ছিঁড়ে যেতে চায়। সুফিয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে, পারে না; সে চিৎকার করে কাঁদে, কিন্তু মালিকের বউ দুটিও তাতে বিচলিত হয় না।

মালিক বলে, তোমার দেহ আইচ্ছা কড়া, তুমি আইচ্ছা মাল, বাংলাদ্যাশেও এই রকম মাল আছে?

মালিকের ফাটা বাঁকা ঘিনঘিনে ঠোঁট নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। বউরা সুফিয়ার দিকে তাকায়, সুফিয়া পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে।

মালিক বলে, আইজ রাইতে তুমি আমার লগে শুইবা, আমার সাদ মিটলে সপ্তায় পাঁচ দিন আমার লগে আর দুই দিন আমার দুই পোলার লগে শুইবা। তুমি আইচ্ছা মাল, আমার সাদ মিটতে কয়েক মাস লাগবে।

মাথা ঘুরে সুফিয়া মাটিতে পড়ে যায়।

মালিক তার দুই ছেলেকে ডাকে। দুটি কুৎসিত ছেলে, পনেরো ষোলে বছরের মতো বয়স, মালিকের ডাকে উপস্থিত হয়।

মালিক বলে, মাইয়াটারে তগো লিগাই আনাইছিলাম, কিন্তু দেইখ্যা আমার পছন্দ হইয়া গেছে, মাইয়াটারে লইয়া আমিই শুমো, আমার সাদ মিটলে তরা পাবি, আইজ থিকা শ্রীলংকার মাইয়াটারে লইয়া তরা থাক। ওহাব তিন দিন নিবি, হাশেম তিন দিন নিবি, একদিন আমার লিগা রাকবি।

ওই রাতেই মালিক ধর্ষণ করে সুফিয়াকে। সুফিয়া ছিঁড়েফেড়ে যায়, রক্তে ভেসে যায়, ভেঙেচুরে যায়। ওটা ধর্ষণের প্রথম রাত, তারপর মালিক নিয়মিত ধর্ষণ করতে থাকে। সুফিয়াকে, সুফিয়া হতে থাকে ধর্ষিত, ধর্ষিত, ধর্ষিত, ধর্ষিত।

ওই অন্ধকারে ধর্ষিত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না সুফিয়ার। সুফিয়া পালানোর চেষ্টা করে, দেখে পালানোর কোনো উপায় নেই। কেউ তাকে সাহায্য করার জন্যে নেই, সবাই তাকে পাহারা দিচ্ছে আটকে রাখার জন্যে। শ্রীলংকার যৌবনবতী তার বিরুদ্ধে চলে গেছে, মেয়েটির মনে হচ্ছে তার কাছে থেকে মালিককে কেড়ে নিয়েছে সুফিয়া। মালিক তাকে সোনার হার দেবে বলেছিলো, ওই হার সে পায় নি। মেয়েটির মনে হয় মালিক সুফিয়াকে সেই হার দিয়েছে। বাড়ির পাহারাদারগুলো পাষণ্ড, তাদের পেরিয়ে বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। বাড়িটা একটা নোংরা দুর্গ। মালিকের চার বিবি সব সময় ব্যস্ত ঝগড়াঝাটিতে,

তাদেরই কোনো সুখ নেই, সুফিয়ার কথা তারা ভাবতেও পারে না। সুফিয়া আটকে পড়ে মরুভূমির নোংরা অন্ধকার দুর্গে, যেখানে ধর্ষণই সত্য, আর কিছু সত্য নয়।

সে একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে বের হয়েছিলো, অল্প পরেই তাকে ধরে আনা হয়। পালিয়ে বেশি দূর কোনো মেয়ের পক্ষে যাওয়ার কোনো উপায় নেই সেখানে। ধরে এনে তাকে এমনভাবে মারা হয় যে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

একবার সে বাড়ির ছাদে উঠে ডাকাডাকি করেছিলো, কেউ তার ডাক শোনে নি। ছাদ থেকে চাবুক মেরে মেরে তাকে নামিয়ে আনা হয়। চাবুকে চাবুকে অজ্ঞান হয়ে যায় সুফিয়া, সাত দিনে জ্ঞান ফেরে নি।

কয়েক মাসের মধ্যেই সুফিয়ার একবার গর্ভপাত ঘটানো হয়। ভালোভাবে হয় না, তার ভেতর থেকে রক্ত তিরতির করে বেরোতেই থাকে। ঠিক হ'তে অনেক সময় লেগে যায়।

সুফিয়া শুকিয়ে যেতে থাকে, ফ্যাকাশে হয়ে যেতে থাকে, পাগল হয়ে যেতে থাকে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে থাকে।

কয়েক মাসের মধ্যে তার আরেকবার গর্ভপাত ঘটানো হয়। এইবার রক্ত আর থামতে চায় না, সুফিয়ার সালোয়ার সব সময় ভেজা থাকে।

পাগল হয়ে ওঠে সুফিয়া।

মালিক, আর তার দুই ছেলে নিয়মিত ধর্ষণ করে চলে সুফিয়াকে। সুফিয়া আর চিৎকারও করে না, শুকনো মরা পাগলির মতো পড়ে থাকে; তারা রাতের পর রাত। দিনের পর দিন ছিঁড়েফেড়ে ফেলতে থাকে সুফিয়াকে।

মাসে দশ হাজার রুজি করার জন্যে রিয়াদের উদ্দেশে যাত্রার কয়েক মাসের মধ্যেই সুফিয়া গলায় ফাঁসি দিয়ে মারা যায়।

মহাজননেত্রী যখন তার বিশাল পুণ্যবান দলবল নিয়ে ওমরা করার জন্যে বিমানে উঠছিলেন, তখন সুফিয়ার লাশ এসে বিমানবন্দরে নামে।

আমাগো সুফিয়া আমাগো মইধ্যে ফিইর‍্যা আসে।

কয়েক দিনের মধ্যেই মহাজননেত্রী পুণ্য অর্জন করে, মুখ আর পোশাক অদ্ভুত বদল করে, মাথায় আবায়া না কী সব বেঁধে, হাতে তসবি নিয়ে ড্যামোক্রেসির ইলেকশনের দ্যাশে ফিরে আসেন। তাঁর ছবি দেইখ্যা আমরা তাঁরে চিনতে পারি না, মনে হয় আমরা কী যেন দেখতেছি, কিন্তু আমরা খুশি হই যে তিনি এইবার ইলেকশনের এ টু জেড দেইখ্যা ছাড়বেন, আল্লা আর মানুষ তার দিকে মুখ তুইল্যা না চাইয়াই পারে না। মনে হয় আমাগো দ্যাশে এই ধর্ম আসলো, এর আগে খাঁটিভাবে আসে নাই, আটশো বছরে যা হয় নাই তিনি কয় দিনেই তা কইর‍্যা আসলেন।

সুফিয়ার কথা তিনি জানেন না, এইটা ভালো।

মহাজননেত্রী ফিরে আসলেন, আমরা তার নবরূপ দেখে আজ্জব তাজ্জব হচ্ছি, আর অমনি, দু-দিন পরেই, চললেন মহাদেশনেত্রী পঞ্চাশজন পুণ্যবান নিয়ে ওমরা করতে। ক্যাম্পেইন শুরু হইল। তিনি সঙ্গে বেশি লোক লইছেন, তাঁর ধর্মে ভক্তি আরো বেশি, তার পুণ্য আরো বেশি হইব, পলিটিক্সটাও বেশি হইব, ড্যামোক্রেসি আরো খুশি হইব, আমাদের এই মনে হইতে থাকে, আমরাও খুশি, খুশির ওপর খুশি। তিনি তার পোশাক বদল করে নিছেন, সোন্দর পলিটিকোরিলিজিয়াস রিলিজিওপলিটিকেল পোশাক। তার স্টাইল আছে, আমরা গরিবরা সব সময়ই দেখে মুগ্ধ হই, স্টাইল করে তিনি মাথাটারে সাজিয়েছেন, ধর্মও থাকলো স্টাইলও হইল। এইটা আমরা গরিবরা খুব পছন্দ করি।

মহাদেশনেত্রী যেই দিন গিয়া সেইখানে পৌঁছলেন সেই দিন সেইখানে একটা ঘটনা ঘটতেছিলো। ঘটনাটা তিনি জানতে পারেন নাই; তুচ্ছ ঘটনা।

সেই দিন সেইখানে চৌদ্দ বছরের একটি মেয়েকে পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছিলো।

মেয়েটির নাম সারা। সারার অপরাধ সে জিনা করেছে, হুদুদ করছে, আল্লার বিরুদ্ধে পাপ করেছে; তাই তাকে পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। যেই পুরুষরা এই কাজ করেছে, তারা ধরা পড়ে নাই।

সারা ধরা পড়েছে, প্যাটটা তার, ওই পেটে কে বা কারা কি ঢুকাইছে, তাগো সেইখানে কোন দাগ লাগে নাই, মজা কইর‍্যা তারা কাইট্যা পড়ছে, সারার মতন চিৎ আর অজ্ঞান হইয়া পইড়া থাকে নাই, মাসে মাসে তাগো সেই জায়গা ফুইল্যা ওঠে নাই। তাই তারা ধরা পড়ে নাই।

তার যখন প্যাট হয় তখনও সে তেরো বছরের আছিল, সাড়ে নয় মাসে তার চৌদ্দ বছর হয়েছে। এই মাসগুলি সে ধার কইরা বাইচ্যা আছিল।

যেই রাতে সেই ঘটনা ঘটে সেইটা ছিলো বৃহস্পতিবারের রাইত। বৃহস্পতিবার ওই দেশে ফুর্তির দিন, উইক এন্ড, দ্যাশে মজা করন যায় না, তাই ওই দিন তারা দলে দলে আমিরাতে যায় মজা করতে, শুক্রবারের ঝামেলায় পড়তে চায় না। মজা করে ফিরে। আসে শনিবার বিকেলে। সারার বাপ মা সেদিন আমিরাত চলে গিয়েছিলো; বাড়িতে সেই রাতে ছিলো মাত্র সারা, অনেক দূরের ঘরে বান্দীরা, আর ছিলো তার সতেরো বছরের ভাই করিম। ওই রাতে তার ভাই করিম পার্টি দেয়, প্রত্যেক বৃহস্পতিতেই সে পার্টি দেয়; ফুর্তির পার্টিতে আসে তার বয়সের ইয়ার দোস্তরা। সন্ধা থেকে নিচের তলায় শুরু হয় তাদের উদ্দাম পার্টি, মদ, মারিইউয়ানা, সাথে উদ্দাম পশ্চিমা সঙ্গীত; বারোটার দিকে তা উদ্দামতম হয়ে ওঠে, পশ্চিমা সঙ্গীতের তাণ্ডবে বাড়ির চারপাশ গমগম করতে থাকে। সারা নিজের ঘরে ঘুমোতে পারে না। সে বুঝতে পারে ভাই ও তার বন্ধুরা মদ খাচ্ছে, গাঁজা টানছে, আর নাচছে।

সঙ্গীতের সুরের তাণ্ডবে টিকতে না পেরে সারা পার্টির ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়, সে তাদের শব্দ কমানোর জন্যে চিৎকার করতে থাকে। নাচের ঘরটি আধো অন্ধকার, রঙিন আলোতে ভরপুর। সারার পরা তখন রাতের স্বচ্ছ পোশাক, ভেতরে না ঢুকে সে। দরোজায় মাথা ঢুকিয়েই ডাকাডাকি করে। কেউ তার ডাক শোনে না, তাই সে ভাইকে খোঁজার জন্যে ভেতরে ঢোকে। ভাইকে সে পায় না, ভাই হয়তো কোনো বাথরুমে বমি করছিলো। ভাইয়ের মাতাল বন্ধুরা তাকে দেখেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার পোশাক ছিঁড়েফেড়ে তারা

তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে, একের পর এক সারাকে ধর্ষণ করতে থাকে। তার শরীর নানা জায়গায় ক্ষতবিক্ষত হয়; সারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

ভোরবেলা ভাইয়ের ধর্ষণকারী বন্ধুরা তাকে চিনতে পেরে সবাই পালিয়ে যায়।

বাড়ির ড্রাইভার ও বান্দীরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার ঘটনাটি জানায় পুলিশকে, এবং ধর্মরক্ষাকারী মুতাওয়ারা সংবাদ পেয়ে ধর্ম রক্ষা করার জন্যে ছুটে আসে। মুতাওয়ারা ওই দেশের ধর্মীয় গেস্টাপো, তাদের ডরে রাজা রাজপুত্রকন্যারাও কাঁপে, শান্তিতে একটু আধটু টানতে পারে না। সারা তার ভাইয়ের বন্ধুদের কারো নাম জানে না, সে কখনো তাদের সামনে যায় নি, তাদের দেখে নি। তাই সে কারো নাম বলতে পারে না। সারার ভাইয়ের কাছে থেকে পুলিশ তার বন্ধুদের নাম বের করে, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে, তারা এর মাঝে সুন্দর কাহিনী তৈরি করে ফেলেছে। বন্ধুরা পুলিশকে বলে, ওই সন্ধ্যায় কেউ মদ খায় নি, গাঁজা টানে নি, তার শুধু উচ্চ সঙ্গীত বাজিয়ে আনন্দ করেছে। তারা বলে, মেয়েটি স্বচ্ছ রাতের পোশাক পরে এসে তাদের সাথে ঢলাঢলি করতে শুরু করে, বারবার জেনা করার জন্যে জোর করতে থাকে। তারা প্রথম রাজি হয় নি, তখন মেয়েটি তাদের চুমো খেতে থাকে, তার শরীরের পোশাক খুলে নানা কিছু দেখাতে থাকে, তখন তারা আর নিজেদের দমন করতে পারে না। মেয়েটি সকলের সাথে জেনা করতে চায়, তাই তারা সবাই জেনা করতে বাধ্য হয়। তাদের কোনো দোষ নাই, তারা ফিত্নার পাল্লায় পড়েছিলো।

সারার বাপ আর মা আমিরাত থেকে ফিরে আসে। সারার মা মেয়ের যন্ত্রণা বুঝতে পারে, বিশ্বাস করে মেয়ের কথায়, কিন্তু তার করার কিছু নেই, সে তার মেয়ের মতোই শক্তিহীন।

তার বাপ অত্যন্ত ক্ষেপে ওঠে, সে জানিয়ে দেয় জেনা করার জন্যে সারাকে শাস্তি পেতেই হবে। সে আল্লার বিরুদ্ধে হুদুদ করেছে, তারে বাঁচতে দেয়ন যায় না। তার শাস্তি হচ্ছে পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ড। সারার ভাই নিজে বাঁচার জন্যে চুপ করে থাকে।

তাদের বাড়ি সব সময় ঘিরে থাকে মুতাওয়ারা। তারা অত্যন্ত শক্তিমান, ডালকুত্তার মতো তারা হানা দেয়। তারা সারার বাবার প্রশংসা করে, কেননা সে মেয়েকে শাস্তি দিয়ে ইসলাম রক্ষা করতে যাচ্ছে।

কয়েক দিনের মধ্যে দেখা যায় সারা গর্ভবতী, তাই তাকে অবিলম্বে পাথর ছুঁড়ে মারা যায় না, প্যাটেরটা বাঁচিয়ে রাখা দরকার, ওইটা যদি পুরুষ হয়, তাহলে ত সে মহান আরব হইতে পারে, একদিন দুনিয়া জয় করনের জইন্যে ঘোড়ায় চইড়া বাইর হইতে পারে। প্যাটেরটা তাকে আরো সাড়ে নয় মাস বাঁচিয়ে রাখে, প্যাটের জিনিশের দাম আছে, খালি প্যাটটা যার তার দাম নাই। প্যাট ত কতই আছে, দুই চাইরটা না থাকলেও চলে; তবে প্যাটের ভিতরে যা দিয়া ঢুকায় তার দামের শ্যাষ নাই। একটি মেয়ে জন্ম নেয়, আগে হইলে তারে পুঁইতে ফেলন হইত, এখন হইব না; তবে সারা জীবন ধইরা তারে বাঁচাইয়া রাইখ্যা পোতন যাইব। প্যাটলিগুলিরে জীবন ভইর‍্যাই পোতন যায়। ওই মাইয়াটা যদি পঞ্চাশ ষাইট বচ্ছর সারার প্যাটে থাকতো তাইলে ভালো হইত; কিন্তু সাড়ে নয় মাসে বাইর হইয়া সারাকে পাথর ছুঁড়ে মারার পবিত্র দিন ঠিক করে দেয়।

শহরের পরহেজগার সবাই খবর পেয়ে গেছে এক জেনাকারিণীকে পাথর ছুঁড়ে মারা হবে। তারা আগে থেকেই পাথর মারার সোয়বের জইন্যে অপেক্ষা করছিলো, প্যাটের জিনিশটা তাদের দেরি করিয়ে দেয়, তাতে তাদের জোশও বাড়ে; আর ওই দিন সকাল থেকেই অজু

নামাজ করে তারা পবিত্র মৃত্যুদণ্ডের স্থানে ভিড় জমাতে থাকে। পবিত্র উন্মাদনায় তারা সবাই অধীর, তারা এক পাপিষ্ঠার মৃত্যু দেখে, তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে পুণ্য অর্জন করতে চায়। পুণ্যার্থী জনতা যখন তীব্র রৌদ্রে আর টিকতে পারছিলো না, ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলো, তখন পুলিশের গাড়ি এসে থামে। তারা শান্তি পায়, তারা সমস্ত প্রশংসাপ্রাপককে বারবার প্রশংসা করতে থাকে।

গাড়ি থেকে ভঙ্গুর কোমল চোখের জলের মতো সারাকে টেনে নামানো হয়।

সারা রূপসী হয়ে উঠেছে; মৃত্যুর কথা জেনেও কেমনে সে এমন সুন্দর হলো? প্যাটিলিগুলির স্বাভাবই এমন, কবরের কথা ভাবতে ভাবতেও তারা সুন্দর হয়ে ওঠে। জনতা তার নামে উচ্চস্বরে নিন্দা জানাতে থাকে, প্রশংসাপ্রাপকের প্রশংসা করতে থাকে, অল্পক্ষণের জইন্যে তার মুখ দেখে তারা নিশ্চিত হয় যে এমন রূপ যে মাইয়ার সে পাপ না কইর‍্যা থাকতে পারে না, সে ফিনা, সব নিয়মরে উল্টাইয়া সে দিবেই। তারে শাস্তি না দিলে ইসলাম টিকবো না।

সারার হাতপা শেকল দিয়ে বাঁধা, তার মাথা ঝুলে আছে নিচের দিকে। একজন মুতাওয়া সমস্ত প্রশংসাপ্রাপকের দীর্ঘ প্রশংসা করে সারার অপরাধের বিবরণ পড়তে থাকে, যাতে জনগণ ঠিক মতো শুনতে পায় সেজন্য সে উচ্চকণ্ঠে অসতী সারার জেনার বিবরণ পড়ে।

হুদুদের শাস্তি থেকে প্যাটলিগো বাঁচন নাই।

সারার মুখের ভেতরে ঠেসে একটা নোংরা চটের টুকরো ঢোকানো হয়, যাতে সে গোঙাতেও না পারে, তার মাথা একটা কালো আবরণ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় চুলে। শয়তার থাকে, ওই চুলের ভেতর দিয়ে মাইয়ালোকের মাথার ভিতর ঢোকে লাখ লাখ ইবলিশ, তাই চুল খোলা রাখা পাপ। তাকে হাটু গেড়ে বসানো হয়, সারা বাধা দেয় না। জল্লাদ তার পিঠে একটি একটি করে পঞ্চাশ ঘা প্রচণ্ড চাবুক মারে। সারা লুটিয়ে পড়তে পড়তে পড়ে না। আহা, পেট থেকে বেরোনোর সময়ই যদি তাকে বালুতে পুঁতে ফেলা হতো!

পাথর বোঝাই একটি ট্রাক এসে সেখানে থামে। ট্রাক থেকে পাথর নামিয়ে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা হয়। ধন্য পাথরের টুকরো। যে-লোকটি সারার অপরাধের বিবরণ পড়েছিলো, সে জনতাকে পাথর ছোঁড়া শুরু করতে বলে।

জনতা সমস্ত প্রশংসাপ্রাপকের প্রশংসা করতে করতে পাথরের স্তূপের দিকে তীব্র বেগে ছুটে যায়।

এই পুণ্যের জন্যে তারা এতো মাস ধরে আর এতক্ষণ রোদের ভেতরে অধীর হয়ে। অপেক্ষা করছিলো, তারা পাথরের পর পাথর নিয়ে সারার দিকে ছুঁড়তে শুরু করে। সমস্ত প্রশংসা প্রশংসাপ্রাপকের। চার দিকে থেকে পাথর এসে লাগতে থাকে সারার মুখে মাথায় শরীরে, পাথরের ঘায়ে সারা এদিক সেদিক দুলতে থাকে, শেষে বালুর ওপর লুটিয়ে পড়ে।

সারাকে একটানা পাথর মারা হয় না। এইটা ত আর মইধ্যযুগ না, আইয়ামে জাহেলিয়া না, এইটা হইল আধুনিক যুগ (তয় মনে হয় ওইখান থিকা আইয়ামে জাহেলিয়া দূর হয় নাই, আরো জমা হইতেছে), মরুভূমিতেও একটু মানবতা আছে, তাই মাঝেমাঝে পাথর

ছোঁড়া বন্ধ করা হয়, আমরিকার কায়দায় একজন ডাক্তার পরীক্ষা করে সে বেঁচে আছে কি না। সারা পাঁচ মিনিটে মরে গেলেই ভালো হইত, কিন্তু মাইয়ামানুষ সহজে মরতে চায় না; প্যাটলিরা পাথরের থেকেও শক্ত, পাথরের থেকেও প্রাণহীন, তাগো জন্মের সময় প্রাণই দেয়া হয় নাই, জানই দেয়া হয় নাই, তাই মরবো কেমনে? তাগো মারনের জইন্যে পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে পুরুষপোলাগো জান বাইর হইয়া যাইতেছে।

প্রথমবার ডাক্তার দেখে সারা মরে নাই। জনতা প্রশংসাপ্রাপককের প্রশংসা করে আবার পাথর ছুঁড়তে শুরু করে।

দয়াশীলেরা আবার পাথর ছোঁড়া বন্ধ করে, ডাক্তার সারার নাড়ি পরীক্ষা করে দেখে। না, সারা মরে নাই, পুইত্যা না ফেললে বোধ হয় মরবো না। খালাশের সময়ই বালিতে পুইত্যা ফেলা দরকার আছিল এইটারে।

আবার শুরু হয় পাথর ছোঁড়া, সমস্ত প্রশংসা প্রাপ্য প্রশংসাপ্রাপকের।

তবু সারা মরে না। কিন্তু এতো বিকট পাথরের মুখোমুখি কতক্ষণ টিকবে এই ভঙ্গুর তুচ্ছ পাপিষ্ঠ নিষ্পাপ সুন্দর? এই ফিত্নাটা কতক্ষণ লড়াই করবে পুণ্যবান হিংস্র পাথরের সঙ্গে?

মরতে তাকে হবেই, পাথর তাকে ক্ষমা করবে না, হুদুদের কোনো মাফ নাই। পাথরের থেকে সে বেশি শক্তিমান নয়। পাথরের ক্রোধে সে নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন হবে, সমস্ত প্রশংসা প্রাপ্য প্রশংসাপ্রাপকের।

ঘণ্টা দুয়েক পর ডাক্তার জানায় সারা মারা গেছে। সফল ধার্মিক পুণ্যশীলেরা পাথর ছোঁড়া বন্ধ করে।

সমস্ত প্রশংসা প্রাপ্য প্রশংসাপ্রাপকের।

পাপিষ্ঠাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে, ধর্ম রক্ষা পেয়েছে। রুব আল-খালির সমস্ত বালু পবিত্র হয়েছে।

মহাদেশনেত্রী ওমরা করতে গেছেন, সারার সংবাদ তিনি পান নি।

৮. মহাদেশনেত্রী যখন ফিরে আসেন

মহাদেশনেত্রী যখন ফিরে আসেন তার অপরূপ রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হই। মাথা ঘিরে কী চমৎকার আবায়া পরেছেন, কোনো শয়তান ঢুকতে পারবে না চুলে, কাঁধের নিচ দিকে কী যেনো ঝুলিয়ে দিয়েছেন, আমরা গরিব জনগণ, ধর্ম হজ ওমরা জানি না, আল্লা আমাগো মাফ করবেন, এইসব পোশাক আশাক জানবো কেমনে? আমরা মুগ্ধ হই, শিউরে উঠি, ধর্মে ভাসতে আর ডুবতে থাকি, এবং বিপদে পড়ে যাই–কে বেশি ধার্মিক, মহাজননেত্রী না মহাদেশনেত্রী, কারে ভোট দিলে আল্লা খুশি হইব ড্যামোক্রেসি রক্ষা পাইব এইটা ঠিক করতে পারি না। মহাবিপদের মইধ্যে পইড়্যা যাই আমরা, বিপদে পড়নই ত আমাগো কাম, আমরা গরিব জনগণ; আমাগো মনে হইতে থাকে আমাগো কঠিন পরীক্ষা করনের জইন্যেই আল্লাতাল্লা দুইজনরে পাঠাইছেন, আমাগো বাইর করতে হইব কার ধর্ম বেশি, আর ভোট দিতে হইব সেইভাবে। আমাগো খালি পরীক্ষা দিতে হইব, হাশরের মাঠ পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে হইব–আমরা গরিব জনগণ।

শুরু হইছে রাজপুরুষগো ইন্টারভিউ, আর নমিনেশন দেওন।

দ্যাশ ভইর‍্যা আমরা পাগল হইয়া উঠছি এইটা দেখার জইন্যে যে জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশ কারে কারে নমিনেশন দেয়, আর শক্তির উৎসবাদী রাজবংশ নমিনেশন দেয় কারে কারে। রাজপুরুষেরা যখন নমিনেশন পাওয়ার জইন্যে দরখাস্ত করছিলেন, তখন আমরা গরিব পিপল হয়ে উঠেছিলাম পাগল পাগল, আর এখন নমিনেশন দেওনের আর পাওনের সময় আমরা হয়ে উঠি আস্ত পাগল। জনগণরে, আমাগো মতন গরিবগো, পাগল না করতে পারলে পলিটিক্স কিসের, ড্যামোক্রেসি হইছে আমাগো পাগল করনের মিঠা

অমুদ, এমনভাবে খাওয়াইতে হয় যাতে আমরা পাগল হইয়া যাই, জিতলাম না ঠকলাম বুঝতে না পারি।

আমরা ত ভিতরের সব দেখি না, ছিটাফোঁটা শুনতে পাই, আর একেকজনের নমিনেশন পাওন দেখে ভাবতে থাকি কি হইছে ভিতরে। আমরা যেমন শুনছি তেমন বলতেছি; নিজের চোখে ত দেখি নাই, পরের মুখে শুনছি, দুই একটা ঘোড়ার মুখ থিকাও টুকরাটাকরি শুনছি।

জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশের ক্যান্ডিডেটদের ইন্টারভিউ চলতেছে। ইন্টারভিউ নিতেছেন প্রধান রাজপুরুষেরা; মহাজননেত্রী আছেন মাঝখানে, তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে, রিলিজিয়ন আর পলিটিক্সের মিলন ঘটলে যেমন দেখায়, তেমন দেখাইতেছে, তারে ঘিরে আছেন আবদুর রহমান, কলিমউদ্দিন মৃধা, নিজামউদ্দিন আহমদ, রজ্জব আলি, আবদুল হাই সাহেব।

মহাজননেত্রী তসবি পড়তে পড়তে বলেন, বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম, আল্লার কাছে মুনাজাত করি তিনি আমাদের দিকে মুখ তুইল্যা চান।

তারা সবাই মনে মনে মুনাজাত করে ওঠানো দুই হাত ভরে ভোট সংগ্রহ করে চোখ বন্ধ করেন, পবিত্রভাবে দুই হাত নিজেদের মুখে বুলান, মাথায় বুলান,বুকে বুলান। দুই একজনে বুকে ফুঁ দেন।

মহাজননেত্রী বলেন, ক্যান্ডিডেটগো ডাকনের আগে নীতিমালাটা আরেকবার ঠিক কইর‍্যা লই, তাইলে কাজ সহজে হবে। এইবার ক্ষমতায় আমাদের যাইতে হবেই, ঠিক ক্যান্ডিডেট দিতে হবে।

আবদুর রহমান বলেন, প্রথম নীতি হচ্ছে মহাজননেত্রী তিনটা কি চাইরটা। কসৃটিটিউয়েন্সি থিকা কন্টেস্ট করবেন, অই সিটগুলি আমাগো থাকবো, আমরা প্রধান ন্যাতারা সবাই নমিনেশন পাইবো, আমরা কয়জন দুইটা আসন থিকা ইলেকশন করবো।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, দুই চাইরটা সিটে এখন নমিনেশন দেয়া হইবো না, অইগুলি মহাজননেত্রী পরে নিজে বুঝে ঠিক করবেন, শ্যাষ মোমেন্টে অন্য বংশ থিকা কোনো সবচাইতে বেটার ক্যান্ডিডেট যদি আইস্যা পড়ে, তখন অইগুলিতে তাগো দার করান যাইব।

মহাজননেত্রী বলেন, আমিও এই নীতিটা ভাবতেছিলাম, আমার মনে হয় শক্তির উ ৎসআলাগো বংশ থিকা দুই একটা জ্যানারেল, দুই চাইরটা ভাল রাজাকার ভাইগ্যা। আসতে পারে, তখন তাগো নিতে পারবো।

রজ্জব আলি বলেন, আমি একটা জ্যানারেল আর দুই তিনটা ভাল রাজাকারের কথা ভাবতেছিলাম, অগো নিলে ভাল হইত।

মহাজননেত্রী বলেন, তাগো নাম কন, দেখি পছন্দ হয় কি না।

রজ্জব আলি নামগুলি বলেন।

মহাজননেত্রী বলেন, এই নামগুলি আমিও ভাবতেছিলাম, তাগো নিলে শিউর জিতবো, চিন্তা করতে হইব না।

আবদুল হাই বলেন, তয় এইগুলি খুব ডিজঅনেস্ট, পাশ কইর‍্যা সুবিধা পাইলে উৎসআলাগো লগে যোগ দিতে পারে, এইটা ভাইব্যা দেখেন।

আবদুর রহমান বলেন, ইনিরা ত নমিনেশন পাওয়ার লিগা দরখাস্তই করে নাই, আর ওই জ্যানারেল সাহেব উৎসআলাগো নমিনেশনের লিগা দরখাস্ত করছে, সেইখানে নমিনেশন পাওনের লিগা লাইগ্যা রইছে। আমাগো লগে কুঅপারেশন করে নাই, অনেক ডাকছি এই দিকে আসে নাই।

রজ্জব আলি বলেন, কুদরত আলি চৌধুরী রাজাকার আছিল, খোজাবংশে আছিল, উৎসআলাগো লগেও আছিল; তবে তিনি প্রবীণ অ্যাক্সপেরিয়েন্ড পলিটিশিয়ান, দ্যাশে অত্যান্ত শ্রদ্ধেয় মানুষ, সে এইবার কোনো দল থিকা নমিনেশন চায় নাই, তারে নিলে। আমাগো সুবিধা হইব।

মহাজননেত্রী বলেন, তার সঙ্গে আমার চাচা-ভাস্তির সম্পর্ক, এখনই তারে আমি টেলিফোন কইর‍্যা আমাগো দল থিকা দারাইতে রিকুয়েস্ট করি। আমার রিকুয়েস্ট চাচা ফেলতে পারবো না।

আবদুল হাই বলেন, তারে যেইখান থিকা দারাইতে দিবেন সেইখানে কফিলউদ্দিন মিয়া আমাগো অত্যান্ত ভাল ক্যান্ডিডেট, সে সব সময় আমাগো দল করে, দলরে সে অইখানে টিকাই রাখছে, কুদরত আলি চৌধুরী সাহেবকে সেইখান থিকা নমিনেশন দিলে কফিলউদ্দিন বিগড়াইয়া যাইতে পারে।

মহাজননেত্রী বলেন, দলের জইন্যে এইটুকু স্যাক্রিফাইস ত করতেই হবে, পাওয়ারে যাওয়ার জইন্য সব রকমের স্যাক্রিফাইসের জইন্যে রেডি থাকতে হবে। কফিলউদ্দিন মিয়ারে আমি বুঝ মানাই দিব, পাওয়ারে আসলে তারে বড় কিছু দিলেই হইবো।

আবদুর রহমান বলেন, টেলিফোন কইর‍্যা দেখি চৌধুরী সাবরে পাওয়া যায় কি না। পাইলে এখনই কথাটা ফাইনাল হইতে পারে।

সেলুলার টিপে টিপে সেলুলারটা তিনি মহাজননেত্রীকে দেন।

মহাজননেত্রী বলেন, আস্সালামাইকুম চাচা, আমারে চিনতে পারছেন? আপনের শরীরটা ভাল ত?

কুদরত আলি চৌধুরী বলেন, তোমার গলা চিনতে পারুম না অতটা বুড়া আইজও হয় নাই, আই অ্যাম নট সো অৌল্ড অ্যাজ আদার্স থিংক, তোমার পার্টি ত এইবার পাওয়ারে যাইব, তুমি প্রাইম মিনিস্টার হইবা, এইটা আমি তোমারে বইল্যা রাখলাম। আই কংগ্রেচুলেট ইউ।

মহাজননেত্রী বলেন, সেইটা আপনের দোয়া, চাচা। পাওয়ারে আমরা না গেলে দ্যাশটা আর ঠিক থাকবো না, তবে আপনেরে ছারা আমি পাওয়ারে কীভাবে যাই, আপনেরে লইয়াই পাওয়ারে যাইতে চাই, চাচা।

কুদরত আলি চৌধুরী বলেন, আমি ত এইবার পলিটিক্স থিকা দূরে আছি, আই এনজয় এনাফ পাওয়ার ইন মাই লাইফ, এখন মরনের আগে একটু রেস্ট লইতে চাই, পাওয়ার আর ভাল লাগে না।

মহাজননেত্রী বলেন, আপনে রেস্ট নিলে দ্যাশ চলবো কি কইর‍্যা, চাচা? আপনারে এইবার আমার দল থিকা ইলেকশন করতে হইব, আপনেরে ছারা আমাগো চলবো না। এইবার আমরা আপনেরে লইয়াই পাওয়ারে যাইতে চাই, আপনে না করলে হইব না।

কুদরত আলি চৌধুরী বলেন, আমি ত নমিনেশন পাওনের দরখাস্ত করি নাই, সময় ত শ্যাষ হইয়া গেছে।

মহাজননেত্রী বলেন, চাচা, আপনে রাজি হন, এখনই আমি আপনের কাছে ফর্ম পাঠাই দিতেছি, আপনের আসতে হইব না, খালি সই কইর‍্যা দিবেন, বাকিটা আমরাই করবো। খালি আপনের সাইনটা চাই, চাচা।

কুদরত আলি চৌধুরী বলেন, ঠিক আছে, তুমি যখন বলতেছ তখন আর না করি কেমনে। ফর্মটা পাঠাই দেও, আমি দারামু।

আস্‌সালামাইকুম বলে সেলুলার রেখে মহাজননেত্রী বলেন, আমরা একজন শিউর ক্যান্ডিডেট পাইলাম, পাওয়ারে যাইতে হইবই।

কুদরত আলি চৌধুরীর জন্যে একটি ফর্ম পাঠিয়ে দেয়া হয়, একটা সিট শিউর।

ক্যান্ডিডেটদের ইন্টারভিউ শুরু হয় এর পর। অই ইন্টারভিউ বোর্ডে যেই সব কথাবার্তা হয় সেই সব কথাবার্তা টপ সিক্রেট, বাইরে বলন যায় না। আমরা দূর থিকা যা শুনছি, জনগণ আমরা, আমাগো শুনায় ভুল হইতে পারে, বলনেও ভুল হইতে পারে, তার দুই একটা কথা বলন যায়। তবে এইটা খুব গোপন কথা, মনে করতে হইব। আমরা কিছু শুনি নাই আমরা কিছু বলি নাই, সব কিছু ভিতরে চাইপ্যা রাখছি।

ক্যান্ডিডেট আবদুল কাদের মিয়া নমিনেশন পাওয়ার জইন্যে ইন্টারভিউ দিতেছেন।

মহাজননেত্রী জিজ্ঞেস করেন, আপনের কল্‌টিটিউয়েন্সি থিকা আরও চাইরজন দারানের জইন্যে দরখাস্ত করছে, আপনে কি তাগো থিকা বেশি ভোট পাইবেন?

আবদুল কাদের মিয়া বলেন, আল্লার রহমতে নিশ্চয়ই আমি তাগো থিকা বেশি ভোট পামু, অই সিটে আমিই জিতুম, আমি পর পর তিনবার এমপি হইছি অই সিটে, আমার থিকা পপুলার পাওয়ারফুল আর কেহ নাই অইখানে। আমি মহাজননেত্রীকে আমার একমাত্র নেত্রী বলে অনেক দিন থিকাই মাইন্যা নিছি। মহাজননেত্রীই খালি দ্যাশরে ঠিক মতন চালাইতে পারেন।

আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করেন, আইচ্ছা ভাই, আপনে খোজাবংশ থিকা এমপি হইছেন, উৎসআলাগো এমপি হইছেন, এইবার এইবংশে আসতে চাইতেছেন কেন? আপনে কি মনে করেন এইবার আমরা পাওয়ারে যামু?

আবদুল কাদের মিয়া বলেন, আমি জনগণমনবংশে আসতে চাই, কারণ এইটাই আসল বংশ, এই বংশ ফ্রিডম ফাইটিং করছে দ্যাশে স্বাধীন আনছে, এই বংশ না থাকলে বাংলাদ্যাশ আইজও পাকিস্থান থাকত, আমরা পাকিস্থানি থাকতাম, এই বংশ আমাগো বাঙ্গালি বানাইছে, আমরা বাঙ্গালি আমরা পাকিস্থানি না, পাঞ্জানিগো পায়ের তলে বাঙ্গালি থাকতে পারে না, আর মহাজননেত্রী দুনিয়ার এক নম্বর নেত্রী, তার পায়ে মাথা রাইখ্যা আমি বাকি জীবন পলিটিক্স করতে চাই, পিপলের স্যাবা করতে চাই। মাইনষেরই ভুল হয় আমারও ভূল হইছিল, সেই জইন্যে আগে আসতে পারি নাই, তয় এখন মহাজননেত্রীর পায়ে মাথা রাখতে চাই। এইবার আমরা পাওয়ারে যামুই, উৎস আলাগো কোনো চান্স নাই, আমি অই বংশরে ছাইরা দিছি, অই বংশ ড্যামোক্রেসিতে বিশ্বাস করে না, তারা ডিক্টেটরশিপে বিশ্বাস করে।

নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, কাদের মিয়ারে প্রশ্ন করনের দরকার পড়ে না; তার লগে আমাগো আগে থিকাই কথা হইয়া আছে। তিনি দশ পোনরো বছর ধইর‍্যা অইখানের সবচাইতে পাওয়ারফুল সবচাইতে পপুলার পলিটিশিয়ান, এইটা সারাদ্যাশের মানুষ জানে। তারে হারাইয়া উৎসআলারা হায় হায় করতেছে। এইবার তিনি আমাগো বংশে আসছেন এইটা আমাগো ভাইগ্য। তারে অরা মন্ত্রী করে নাই, করছে যার কোনো পপুলারিটি নাই, সেই মাতাল মমতাজ আলিরে; তিনি এইটা সইয্য করতে পারেন নাই, কোনো জেনুয়িন পলিটিশিয়ানই এইটা সইয্য করতে পারে না।

রজ্জব আলি বলেন, কাদের ভাইয়ের সব কথাই ত আমরা জানি, তার লগে সব কথাই আমাগো হইয়া আছে, আগে থিকাই ঠিক হইয়া আছে কাদের ভাই আমাগো ক্যান্ডিডেট হইবেন। তিনি উৎসআলাগো বংশে ভাঙ্গন ধরাই দিছেন, তার দিকে আর উৎসআলাগো ফিউচার নাই।

মহাজননেত্রী বলেন, কাদের ভাই, আপনের এলাকার সিচুয়েশন কেমন, একটুখানি বলেন ত।

কাদের মিয়া বলেন, আমার আর আমার পাশের তিনটা সিটে উৎসআলাগো এইবার রিটার্ন করার কোনো পসিবিলিটি নাই, কারণ আমরা যারা পাশ করতাম তারা মহাজননেত্রীর জনগণমনবংশে যোগ দিছি! আমাগো অইখানে পাশ করার লিগা তিনটা জিনিশ খুবই দরকার।

মহাজননেত্রী জিজ্ঞেস করেন, জিনিশগুলি কি?

কাদের মিয়া বলেন, প্রথম যেই জিনিশটা দরকার, সেইটা হইল ট্যাকা, ট্যাকা ছারা পলিটিক্স করন যায় না, ট্যাকা থাকলে ভোটার আছে ভোট আছে, তারপর দরকার হইল ক্যাডার, ট্যাকা থাকলে ক্যাডার পাওন যায় আর ক্যাডার থাকলে ভোট পাওন যায়, ক্যাডার ছারা ড্যামোক্রেসি চলে না পলিটিক্স চলে না, সব শ্যাষে দরকার হইল, পপুলারিটি, এইটাও থাকন দরকার। খোদার রহমতে এই তিনটা জিনিশই আমার আছে।

আবদুল হাই বলেন, কাদের ভাই সেইটা আমরা জানি। আপনেরে নমিনেশন আগে থিকাই আমরা দিয়া রাখছি। পার্টিরে আপনে যেই চান্দা দিছেন, তাতেই বুঝা যায় আপনে শিউর পাশ করবেন। তয় আরো কিছু চান্দা দরকার।

আবদুল কাদের মিয়া বলেন, না, বেশি আর কি দিছি, মাত্র পাঁচ কোটি, আরও পাঁচ কোটি টাকা আমি নিয়া আইছি পার্টির লিগা, আইজ বিকালেই জায়গা মতন নিয়া আসবো। পলিটিক্সে আসনের আগেই আমি বুঝছি ট্যাকা ছারা পলিটিক্স করন যায় না, অইটা দরকার আগে, তাইলেই পিপলের ন্যাতা হওন যায়।

এইরকম ইন্টারভিউ কয়েক দিন ধইর‍্যা চলতেছে। ওই দিকে শক্তির উৎসবাদী রাজবংশের নমিনেশন দেওনও শুরু হয়ে গেছে। আমরা বদ্ধ পাগল হয়ে উঠতেছি, নমিনেশনের চ্যাহারা দেইখ্যা বুঝতেছি এইবার রিয়েল পলিটিক্স হইতেছে, কে যে কোন জায়গায় নমিনেশন পাইব আল্লাও জানেন না। গুনা কইর‍্যা ফেললাম মনে হয়, তিনি নিশ্চয়ই জানেন, কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারতেছি না।

ইন্টারভিউর তিন না চাইর দিনের দিন সেলুলারে একটা চাঞ্চল্যকর খবর আসে মহাজননেত্রীর কাছে, তিনি আনন্দে কাঁপতে থাকেন।

মহাজননেত্রী সেলুলার আবায়ার নিচে কানের কাছে নিয়ে হাতে তসবি টিপতে টিপতে বলেন, হেলো।

ওই দিকের কণ্ঠ বলে, মহাজননেত্রী, বড় খবর আছে, উৎসআলাগো অফিসের গেইটের কাছে থিকা বলতেছি, উৎসআলারা জ্যানারেল কামরুদ্দিন সাবরে নমিনেশন দেয় নাই, আমরা তারে রাস্তায় ধরছি, তারে আমরা লইয়া আসতেছি।

মহাজননেত্রী বলেন, তারাতারা লইয়া আসো, এইটাই আশা কইর‍্যা আছিলাম, সে শিউর পাশ করবো, তারাতারি লইয়া আসো।

তারা সময় নষ্ট না করে জেনারেল কামরুদ্দিনকে নিয়ে ইন্টারভিউ বোর্ডে উপস্থিত হয়, রাস্তায় ফুলের তোড়া আর মালা কিনতে যা দেরি হয়। মহাজননেত্রী ও রাজপুরুষেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

মহাজননেত্রী বলেন, আপনে আমাগো এইখানে আগেই দরখাস্ত করলে আপনাকে এই কষ্টটা করতে হইত না। আমরা আপনের কথা অনেক দিন ধইরাই বলাবলি করতেছিলাম, এই জইন্যে প্রত্যেক দিন লোকও পাঠাই দিছি খবর নিতে আপনের কি হইল। আপনেরে আমাগো দল থিকা নমিনেশন দিলাম, আপনে শিউর পাশ করবেন, এইবার আমরা পাওয়ারে যাব, আমরা পাওয়ারে গেলে আপনে মিনিস্টার হবেন।

জেনারেল কামরুদ্দিন স্যালুট দিয়ে বলেন, আই অ্যাম রিয়েলি গ্রেইটফুল টু ইউ, আওয়ার মহাজননেত্রী, আই শ্যাল রিমেইন অবিডিয়েন্ট টু ইউ টিল মাই ডেথ। ইউ আর এ গ্রেট লিডার, এইবার আমরা পাওয়ারে যাবই। আই অ্যাম সরি ফর মাইসেল্ফ দ্যাট। আই অ্যাপ্লাইড ফর দেয়ার নমিনেশন, দে আর দি এনিমিজ অব দি কান্ট্রি, আমি এখন বুঝতে

পারছি ইউ আর দি হার্ট অব দি কান্ট্রি, ইউ আর দি প্রিন্সেস হু উইল বি দি কুইন, আই শ্যাল সার্ভ ইউ অ্যাজ ইউর সার্ভেন্ট। আমি আপনার দোয়া চাই।

জেনারেল কামরুদ্দিন বাড়ি থিকা বাইর হইছিলেন মহাদেশনেত্রীর ওপর গভীর বিশ্বাস পোষণ করে, তাঁরে টিল ডেথ সার্ভ করার জইন্য, আর বাড়ির দিকে রওনা হলেন মহাজননেত্রীর ওপর গভীর আস্থা পোষণ করে, তারে টিল ডেথ সার্ভ করার পরতিগ্যা কইর‍্যা।

পলিটিক্সে ফাইনাল কথা বলে কিছু নাই, সকাল বিকাল পলিটিক্সে এক জিনিশ না। পলিটিক্স ডাইনামিক ব্যাপার, একখানে দাঁড়াই থাকে না।

এখন ইন্টারভিউ দিচ্ছেন আহমদ আলি পটন; তিনি দ্যাশের এক জেলার মহানেতা, টাকা আর ক্যাডারের অভাব নাই।

আবদুর রহমান বলেন, পটন ভাই, আমরা খবর নিছি যে ওইখানে আপনেই পাশ করবেন, তয় ট্যাকাপয়সা ক্যাডার কেমুন আছে আপনের? [আহমদ আলি পটন বলেন, ট্যাকাপয়সা ক্যাডার ছাড়া পলিটিক্স হয় না, এই দুইটা আমার আছে, পপুলারিটিও আছে। ভোটার ভাইরা আমার নাম ছাড়া অন্যের নাম লয় না, লওনের সাহস নাই।

কলিমউদ্দিন মৃধা জিজ্ঞেস করেন, ভাই, তাইলে এইবার আপনে ক্যাডার ইউজ করবেন নি?

আহমদ আলি পটন বলেন, ক্যাডারের ইউজ নানা সময় নানা রকমের হয় আমরা পলিটিশিয়ানরা জানি। ক্যাডার থাকতে হয়, সময় বুইঝ্যা ইউজ করতে হয়, যখন যেই রকম দরকার হয়। এইবার হইল নিরপেক্ষ অবাধ ড্যামোক্রেটিক ইলেকশন, এইবার ক্যাডাররা কাটা রাইফেল নিয়া দৌড়াদৌড়ি করব না, ঠাস ঠাস কইর‍্যা লোক ফ্যালবো না, এইবার তারা ড্যামোক্রেটিক প্রসেসে কাজ করবো। সবার স্যাবা করবো, পিস কোরের মতো স্যাবা করবো, কিন্তু ক্যাডার থাকতে হইব, কখন কি হয় বলন ত যায় না।

রজ্জব আলি জিজ্ঞেস করেন, ইলেকশনে খরচ কেমুন করতে পারবেন, পার্টিরে কেমন চান্দা দিতে পারবেন ভাই, পাটি টাকার অভাবে কষ্টে আছে।

আহমদ আলি পটন বলেন, ইলেকশনের খরচের জইন্যে পাঁচ সাত কোটি ধইরা রাখছি, লাগলে আরও খরচ করুম, আর পার্টিরে পাঁচ সাত কোটি চান্দা দিমু বইল্যাঠিক কইর‍্যা রাখছি।

আবদুর রহমান বলেন, ভাই আপনের কথা শুইন্যা খুশি হইলাম, নমিনেশন আপনে পাইবেন। পার্টির ফান্ডের অবস্থা অইত্যান্ত খারাপ, আরও কিছু বাড়াই দিয়েন ভাই।

আহমদ আলি পটন বলেন, চাচা, আপনে যখন বলতেছেন তখন ত দিতেই হইব, তয় হাত পাও ধইর‍্যা রিকুয়েস্ট করতেছি আমারে নমিনেশন দিয়েন। পাশ ত আমি করবই, আমারে কেউ হারাইতে পারবো না।

মহাজননেত্রী বলেন, তা আমরা জানি ভাই, আপনে গিয়া ক্যাম্পেনের কাজ শুরু করেন, এইবার আমাদের পাওয়ারে যাইতে হবে।

এই রকমভাবে অত্যান্ত গোপনীয়তার সঙ্গে জনগণমন বংশের ইন্টারভিউ চলতে থাকে, আমরা গরিব জনগণরা শহরের অক্লান্ত কাকের মতো ছিটাফোঁটা খবর পাইয়া মেতে ওটতে থাকি।

ওই দিকে বসছে শক্তির উৎসবাদী রাজবংশের ইন্টারভিউর বোর্ড; সেইখানেও একই রকম ড্যামোক্রেটিক প্রসেসে নমিনেশন দেওয়া হইতেছে। সেইখানেও গমগমের শ্যাষ নাই, সেইখানেও সব কিছু কাঁপতেছে, পাওয়ার, পাওয়ার, পাওয়ার শব্দ হইতেছে, আগামী কাইলই পাওয়ারে যাইতে পারলে ভালো হইত, কিন্তু যাওন যাচ্ছে না, ইলেকশন কইর‍্যা যাইতে হবে।

আমরা গরিব জনগণরা কি কইরা জানবো সেইখানে কি হইতেছে? তবে আমরা কান খাড়া করে থাকি বলে দূরের শব্দও অল্পস্বল্প শোনতে পাই। সেই শোনা কথাই বলতেছি, দেখা কথা বলতেছি না। দেখনের ভাইগ্য কি আমাগো আছে? আমাগো কথায় একটু নিমক লাগাই লইতে হবে।

ইন্টারভিউ নিচ্ছেন মহাদেশনেত্রী, অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু, অবজেনারেল কেরামতউদ্দিন, সোলায়মান হাওলাদার, মোহাম্মদ কুদ্দুস চৌধুরী, ব্যারিস্টার কুদরতে খুদা, ডঃ কদম রসুল প্রমুখ রাজপুরুষেরা।

মহাদেশনেত্রী স্থির স্মিত বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ সুদূর মহারানীর মতো বসে আছেন। তিনি চোখে কী যেনো দেখতে পাচ্ছেন, আবার পাচ্ছেন না, আবার দেখতে পাচ্ছেন, আবার পাচ্ছেন না; একবার কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। এই রকম সময় মানুষের এই রকমই হয়। চারপাশকে এক সময় তাঁর ধ্বসস্তূপ মলপের মতো মনে হয়, ঘুমিয়ে পড়তে তাঁর সাধ হয়; জেগে থাকতে তিনি ক্লান্তি বোধ করেন।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, আমাগো নমিনেশন দিতে হইব ২৭০জন ক্যান্ডিডেটরে, তার মইধ্যে ২০০জনের নাম আমরা বইস্যা আগেই ঠিক কইর‍্যা রাখছি, মহাদেশনেত্রীর হাতে ১৫টা সিট রাইখ্যা দিছি, আমাগো আসলে পাঁচপান্নটা সিটের জইন্যে ক্যান্ডিডেট নমিনেশন দিতে হইব। আমাগো কম্পিটেন্ট ক্যান্ডিডেটের অভাব নাই, সংসদে ১০০০ সদস্য থাকলে ভাল হইত।

জেনারেল কেরামতউদ্দিন বলেন, ইটস রিয়েলি এ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক, দ্যায়ার আর সো মেনি ব্রাইট ক্যান্ডিডেটস, আমাদের ক্যান্ডিডেট অ্যাবাউট পাঁচ হাজার, তার মইধ্য থেকে ফিফটি ফাইভ ক্যান্ডিডেটকে নমিনেশন দেয়া রিয়েলি ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট আই অ্যাম শিউর উই ক্যান ডু দ্যাট, মহাদেশনেত্রী উইল শো আস দি রাইট ওয়ে টু ডু দিস অ্যাজ শি হ্যাঁজ অলোয়েজ শৌন।

মহাদেশনেত্রী মিগ্ধভাবে হাসেন; রাজপুরুষেরা কেউ তা দেখতে পান না, তাঁর হাসি দেখার অধিকার তাদের নেই বইলাই শুনছি। দুনিয়ায় কত সৌন্দর্যই এইভাবে নষ্ট হইয়া যায়, আবর্জনার উপর শেফালি ঝইরা পড়ে, মলের টুকরার উপর আইস পড়ে চান্দের আলো, সুন্দরীরা ঘুমায় কোটিপতি কুষ্ঠরোগীর বিছনায়।

ডঃ কদম রসুল বলেন, এই ডিফিকাল্ট কাজ করনের জইন্যে আমরা আমাগো প্রিন্সিপালগুলি কাজে লাগাইব, তখন ইট উইল বি ইজি টু নমিনেট দি রাইট ক্যান্ডিডেটস্। এইর আগেও আমাগো ক্যান্ডিডেটের অভাব হয় নাই, ফিউচারেও অভাব হইব না, আমরা পাওয়ারে যাওনের পাটি।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, ডাক্তার রসুল ভাই প্রিন্সিপালগুলির কথা মনে করাই দিয়া কাজ সহজ কইর‍্যা দিলেন। আমরা ক্যান্ডিডেটগো রিয়েল পাওয়ারগুলি দেখবো, টাকা আছে কি না, চান্দা কত দিবো, ক্যাডারের জোর কেমুন, আর দেখুম তার হিস্টরি, পাকিস্থানের জইন্য দরদ আছে কি না, ইসলামে বিশ্বাস কতখানি, ইন্ডিয়ার শত্রু কি না, আমাগো দলে কত বচ্ছর আছে, আগে কোন কোন দল করতে। এই পয়েন্টগুলা দেখলে ডিফিকাল্টি হইব না।

মহাদেশনেত্রী বলেন, পলিটিক্সে ডিফিকাল্টি বলে কোনো কথা নাই।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, মহাদেশনেত্রীর কাছে আমি আমার নত কইর‍্যা কৃতজ্ঞতা জানাই তিনি আমাদের পলিটিক্সের একটা মূল প্রিন্সিপাল মনে করাই দিছেন বইল্যা, তিনি মনে করাই না দিলে আমরা বিষয়টারে ডিফিকাল্ট ভাইব্যা ডরাইতাম, এখন ডরানের কিছু দেখতেছি না।

সোলায়মান হাওলাদার বলেন, আমাদের রাজবংশের যিনি ফাউডার, তারে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি, তিনিই আমাদের এই মূল প্রিন্সিপালটি দিয়া গেছেন, তার

সামনে ডিফিকাল্ট বইল্যা কিছু ছিল না, পাঁচ দশ মাইল হাটন তার কাছে ডিফিকাল্ট ছিল না, যেইখানে আমরা আধমাইল হাটলেই প্যাটের ভারে বইস্যা পরি সেইখানে তিনি এক ঘন্টায় দশ মাইল হাঁটতেন, হেলিকাপ্টারে চরতে আমরা ডরাই তিনি ডরাইতেন না। মাটি কাটতে গাছ কাটতে আমরা ডরাই তিনি ডরাইতেন না, ডর বইল্যা তার কিছু ছিল না।

মোহাম্মদ কুদ্দুস চৌধুরী বলেন, আমাদের গ্রেট লিডার, গ্রেটেস্ট পলিটিশিয়ান অফ দি কান্ট্রি উইল লিড আস টু ভিক্টরি, হি ইজ উইথ আস, হি ইজ গিভিং আস অর্ডার ফ্রম অ্যাবাভ, তার প্রিন্সিপাল মাইন্যা চললে কিছু ডিফিকাল্ট হবে না।

এখন ইন্টারভিউ দিতেছেন মোহাম্মদ ইউসুফ আলি চৌধুরী।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, ভাই, আপনের সব খবরই আমাগো জানা, আপনের পাওয়ার আর পপুলারিটির কথা দ্যাশের পিপল জানে, তবু কয়টা কথা কই, আপনের থিকা আবার জাইন্যা লই।

ইউসুফ আলি চৌধুরী বলেন, তা জানানের জইন্যেই ত আসছি মাননীয় মহাদেশনেত্রীর সামনে, তার সামনে আসতে পাইরা জীবন ধইন্য হইল, আপনেরা আমার সবই জানেন, আবার জানাইবার সুযোগ পাইলে আমি খুশি হব।

কেরামতউদ্দিন বলেন, মিস্টার চৌধুরী উই ওয়ান্ট টু নো ইউর রিয়েল পাওয়ারস, দ্যাট চান্দা কত দিতে পারবেন, ইউ নো আওয়ার পার্টি ফান্ড ইজ অলমোস্ট এম্পটি, ইলেকশনে খরচ কেমন করতে পারবেন, আর আপনার ক্যাডারদের অবস্থা কি? ক্যাডারস্ আর ভেরি

ইম্পরটেন্ট। এইগুলি হচ্ছে একজন সাকসেসফুল পলিটিশয়ানের রিয়েল ফাউন্ডেশন অন হুয়িচ হি স্ট্যান্ডস্ লাইক এ জায়েন্ট। আমরা শিউর যে আপনে একজন পলিটিকেল জায়েন্ট।

ইউসুফ আলি চৌধুরী বলেন, আল্লার রহমতে আর আপনেগো দোয়ায় এইগুলির কোনোটারই আমার অভাব নাই, টাকা, ক্যাডার, পপুলারিটি সবই আমার আছে। পার্টিরে দশ পোনোরো কোটি চান্দা দেওনের জইন্যে আমি রেডি হইয়া রইছি, মানি ইজ নো প্রব্লেম, ইলেকশনে বেশি খরচ এইবার করন যাইবো না শুনছি, তয় দশ পোনোরো কোটির নিচে চলবো না। আমার ক্যাডাররা ট্রেইনিং পাওয়া ক্যাডার, তারা স্যাবা করনে যেমন এক্সপার্ট তেমনই একম্পার্ট আসল কাজে। এই সব দিকে কোনো প্রব্লেম নাই।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, এই সবই আমি জানি ভাই, বেড়াইতে গিয়াই ত সব দেইখ্যা আসলাম। ভাই চান্দাটা কবে দিতে পারবেন?

ইউসুফ আলি চৌধুরী বলেন, দেশি কারেন্সিতে এইবার দিমু না ডলারে?

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু বলেন, হাফ হাফ ভাই, দেশিতে হাফ ডলারে হাফ দিয়েন। পাওয়ারে আমরা অল্প দিনের মধ্যেই যাইতেছি, আমাগো ক্যান্ডিডেটগো খরচপাতি তখন উঠাই লওন যাইব। যান ভাই, চিন্তা কইরেন না, আপনে নমিনেশন পাইলেন।

আরেক ক্যান্ডিডেট সাক্ষাৎকার দিতেছেন, যেই সব কথা হইতেছে তার একটু আধটু আমরা শোনতে পাইতেছি।

সোলায়মান হাওলাদার জিজ্ঞেস করেন, আইচ্ছা, আপনের পাকিস্থান আর ইন্ডিয়া সম্পর্কে মত কি?

ক্যান্ডিডেট বলেন, পাকিস্থান আমাগো ফ্রেইন্ড ইন্ডিয়া আমাগো এনিমি। পাকিস্থান মুসলমানের দ্যাশ বাংলাদ্যাশও মুসলমানের দ্যাশ, মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই, ইন্ডিয়া পাকিস্থান ভাঙছে, পাকিস্থান ভাঙ্গনের লিগা ইন্ডিয়া সেভেন্টি ওয়ানে হেল্প করছিল। ইন্ডিয়ারে বিশ্বাস নাই। তবে ইন্ডিয়ার লগে মারামারি করন যাইব না, মোখে মোখে ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে কথা কইতে হবে, ভিতরে ভিতরে খাতির রাখতে হবে, এই পলিটিক্সে আমি বিশ্বাস করি।

ব্যারিস্টার কুদরতে খুদা বলেন, ইউ আর এ ভেরি নলেজেবল পলিটিশিয়ান, ইউর সেন্স অব হিস্ট্রি অ্যান্ড ফরেন পলিসি ইজ প্রফাউন্ড, ইউ শুড গো টু দি পার্লামেন্ট।

এইরূপে নমিনেশন দিতে দিতে উৎসবাদী বংশের নমিনেশন দেওনের কাজ শ্যাষ হয়, ডিফিকাল্ট কাজ তারা সহজেই শ্যাষ করেন। কোনো ডিফিকাল্টি হয় নাই, পথ দেখানের জইন্যে তাঁদের প্রদর্শক আছেন।

রাজাকার রাজবংশের কোনো ইন্টারভিউ হয় না। ড্যামোক্রেসি হইছে কুফরি, ড্যামোক্রেসি হইল নাছারা ইহুদিদের ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, এইটা তারা দ্যাশ থিকা দূর কইর‍্যা দিবে, একদিন যখন তারা তলোয়ার দিয়া দ্যাশ দখল কইর‍্যা ফেলবো তখন ড্যামোক্রেসির শুয়োরটারে শ্যাষ করবো; এখন উপায় নাই কুফরি ড্যামোক্রেসির পলিটিক্স তাগো করতে হইতেছে, ইলেকশন করতে হইতেছে, দারাইতে হইতেছে, আল্লার নামে তোট চাইতে

হইতেছে, এইটা কুফরি, আল্লার ভোট চাইতে হইবো ক্যান? সব ভোটই ত আল্লার। তবু ইলেকশন করতে হইতেছে, কিন্তু ইন্টারভিউর দরকার নাই, আল্লার লোকজনের নাম আগে থিকাই ঠিক করা আছে, খালি গো নামগুলি জানাই দিলেই চলবে।

রাজাকার রাজবংশের শুরার মজলিস বসে।

এক নম্বর আমির, দুই নম্বর আমির, আর আর পবিত্র পলিটিশিয়ানরা টুপি আসকান আতর ইত্যাদির মইধ্যে সেজেগুঁজে বসেন।

আমির অধ্যাপক আলি গোলাম প্রথমে আল্লার সমস্ত প্রশংসা করেন, তারে ধইন্যবাদ দেন, তার দোয়া চান, আর নাছারাদের ইলেকশনে অংশ লওয়ার জইন্যে মাফ চান। নিশ্চয়ই তিনি মাফ করবেন, তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

আমির বলেন, নাছারাদের ইলেকশন কুফরি, তবু এই ইলেকশনে আমরা অংশ নিতেছি কেননা আমরা আল্লা আর আবু আলার দ্যাশ স্থাপন করতে চাই, এখন দ্যাশে আমাদের পপুলারিটি বৃদ্ধি পাইয়াছে, পারায় পারায় মসজিদ উঠিছে, মানুষ দিনরাত সালাত পড়িছে, এইবার আমাদের অবস্থা অনেক ভাল। ইনশাল্লা আমরা একশো সিট পাইব, আর আগামী ইলেকশনে আমরা দুইশো সিট পাইব, তখন আমরা পাওয়ারে যাইয়া আবু আলার ইসলামি রাষ্ট্র স্থাপন করিব।

উপস্থিত সবাই বলেন, আলহামদুলিল্লা, আল্লার রাষ্ট্র স্থাপনে দেরি হইতেছে বলিয়া আমরা কষ্ট পাইতেছি, আল্লা আমাদের মাফ করিবেন।

আমির বলেন, ইলেকশন দিয়া আল্লার রাষ্ট্র স্থাপন করা ইমানের দুর্বলতা, এই রাষ্ট্র মানুষরে তোশামোদ কইর‍্যা স্থাপন করতে হয় না, আল্লার রাষ্ট্র আল্লার শক্তিতে জোর কইর‍্যা স্থাপন করিতে হয়, যাহারা বাধা দেয় তাহাদের মস্তক ছিন্ন করিতে হয়, কিন্তু আমাদের সেই শক্তি নাই, একদিন আল্লা শক্তি দিবেন।

সবাই হু হু করে কেঁদে ওঠেন, চোখ মুছতে মুছতে বলেন, হে আল্লা, আমাদের সেই শক্তি দান করুন, যাহাতে আমরা ইমানের জোরে তলোয়ারের জোরে আপনার রাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারি। হে আল্লা, আমাদের তলোয়ার দান করুন, যেমন তলোয়ার আপনে দিয়াছিলেন তারেকরে, খালেদরে, কাশেমরে, বকতিয়ার খিলজিরে; যেই তলোয়ার আপনে দিয়াছেন তালেবানরে।

আমির বলেন, এইবার আমি সেই সব মমিন ন্যাতাদের নাম পড়িতে জনাব মওলানা রহমত আলি ভিস্তিরে আদেশ দিতেছি, যাহারা এইবার আল্লার নামে ইলেকশনে দারাইবেন।

সবাই বলেন, আলহামদুলিল্লা।

মওলানা রহমত আলি ভিস্তি আমির সাহেবের থেকে অনেক বলিষ্ঠ, তিনি এর আগে ভোট পেয়েছেন, আমির আলি গোলাম কখনো ভোট পান নাই। তাই তার গলায় জোর বেশি, ইমান বেশি।

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, আমাদের ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হইবেই, কেহই তাহা থামাইয়া রাখতে পারিবে না, ইনশাল্লা এইবার ইলেকশনে আমরা একশো থিকা একশো তিরিশটা সিট পাইব।

সবাই বলেন, আলহামদুলিল্লা।

রহমত আলি ভিত্তি প্রার্থীদের নাম পড়তে শুরু করেন, মজলিশ ভরে মারহাবা মারহাবা আলহামদুলিল্লা আলহামদুলিল্লা ধ্বনি উঠতে থাকে।

ওই ধ্বনিতে চারদিকে মরুভূমি মরীচিকা জ্বলজ্বল করে ওঠে।

খোজাগণতান্ত্রিক রাজবংশের নমিনেশন লইয়া যেই সমস্ত মজার কাণ্ড হয়, তা আর বলনের দরকার নাই।

নমিনেশন হইয়া গেলে আবার মক্কাশরিফ যাওনের পালা আসলো।

আমাগো রাজাবাদশারা আইজকাল রিলিজিয়ন ছাড়া বাঁচতে পারেন না, পাজেরো চালাইয়া গিয়া তারা সালাত কইর‍্যা আসেন, তগো দমে দমে আল্লাহু। এই পচা মাটি ময়লা খাবড় এমন পাকপবিত্র আর আগে হয় নাই। একদিন এই খাল বিল নদী নালা তাগো সোয়াবে রুব-আল খালি হইয়া উঠবো, সেই দিন দেরি নাই। এমন যদি হইত তারা দিনে পাঁচবার মক্কাশরিফ মদিনাশরিফ জেদ্দাশরিফ রিয়াদশরিফ যাইতে আসতে পারতেন, সেইখানকার বালি কপালে মাথায় শরিলে লাগাইতে পারতেন, পাথরে চুমা খাইতে পারতেন, তাইলে খুব

ভালো হইত, আমরা আরো ভোট দিতাম; কিন্তু আইজও সেই সুবিধা হয় নাই, যাইতে আসতে সময় লাগে, জিন নাই বিমানে যাইতে হয়। প্রত্যেক দিন তারা যাইতে পারেন না, পলিটিক্স করতে গেলেই একবার ওইখানে ঘুইর‍্যা আসেন, ড্রেস বদলিয়ে আসেন, চেহারায় নতুন মেকাপ লাগাইয়া আসেন, দ্যাশটারে তাক লাগাই দ্যান। আমাগো পলিটিক্স আর রিলিজিয়ন একই ব্যাপার, একটার লগে আরেকটার লাগালাগি নাই, দুইটার মইধ্যে গলাগলি ভাব।

ক্যাদামাটির দ্যাশের পলিটিক্স করনের জইন্যে যাইতে হয় বালির দ্যাশে। শ্যামলা দ্যাশে ভোট পাওনের লিগা ঘুইর‍্যা আসতে হয় মরুভূমি। পলিটিক্স! ড্যামোক্রেসি! একদিন দ্যাশটা রুব-আল খালি হইয়া উঠবো।

ইস্কুলে পড়নের কালে আমাগো বাঁশমওলানা সাব (তিনি একটা মোটা বড়ুরা বাঁশের আট হাতি লাঠি হাতে লইয়া আসতেন, মাটিতে ঢুশঢাশ শব্দ হইত, আমরা তারে বাশমওলানা সাব বলতাম) একটা মছল্লা বলছিলেন, সেইটা আমাগো মনে পড়তেছে। এক শহরে এক পরহেজগার বান্দা আছিলেন, তিনি দিনে পাঁচবার মক্কাশরিফ যাইয়া নামাজ পড়ে আসতেন, সবাই তাকে ধন্য ধন্য করতো।

তাঁর একটা জিন আছিল, জিনটা তারে লইয়া যাইতে লইয়া আসতো।

জিনটা একদিন তারে মহাসাগরের এক দ্বীপে নিয়া আটকাইয়া বলে, কেয়ামত পর্যন্ত আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকবো, তবে আইজ আমারে সেজদা করো, নাইলে এই মহাসাগরের মইধ্যে তোমারে একলা ফেইল্যা যাবো।

জান বাঁচানের জইন্যে ওই পরহেজগার জিনরে সেজদা করেন (হায়, হায়, তিনি কী করেন), জিন তার গোলাম হইয়া থাকে, পরহেজগার সাহেব জিনের কান্ধে চইর‍্যা পাঁচবার মক্কাশরিফ যাইয়া আইস্যা নামাজ পড়তে থাকেন। কিন্তু যা হইবার তা হইয়া গেছে, জিনরে সেজদা করায় তার সব শ্যাষ হইয়া গেছে।

তাঁর মাবুদ দুইটা, জিনটাও তাঁর মাবুদ। আমাগো তাগো মাবুদ কয়টা?

ওমরা করনের জইন্যে জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশের মহাজননেত্রী মক্কার উদ্দেশে ষাইটসত্তরজন লইয়া রওনা হইয়া গেলেন (এইবার পাওয়ারে যাইতে হইবো, এইবার পাওয়ারে যাইতে হইবো, আল্লা, আমাগো পাওয়ারে বসাও), আমরা তার মাথা দেখতে পাইলাম না, মাথার চুলে শয়তান থাকে, চুল ঢাইক্যা রাখতে হয়, মুখের একটুখানি মাত্র দেখলাম, মনে হইল ফেরেশতারা যাইতেছেন। তাঁরা সবাই ফিইর‍্যা আসলেন আরো বড়ো ফেরেশতা হইয়া, পোশাক বদলাইয়া, মরুভূমি হইয়া, হাতে তসবি লইয়া। তসবি টিপতে টিপতে তাঁরা কী বলেন, আমরা শোনতে পাই না (এইবার পাওয়ারে যাইতে হইবো, এইবার পাওয়ারে যাইতে হইবো, আল্লা, আমাগো পাওয়ারে বসাও)।

শক্তির উৎসবংশের মহাদেশনেত্রী আশিনব্বইজন লইয়া পবিত্র ওমরা করনের জইন্যে মক্কার উদ্দেশে রওনা হইয়া গেলেন (পাওয়ারে ফিরা যাইতে হইবো, পাওয়ারে ফিরা যাইতে হইবো, পাওয়ার ছারা বাচবো না, আল্লা, পাওয়ার দেও), তার পোশাক দেইখ্যাও আমরা তাজ্জব হইলাম, তার বিউটিশিয়ানরা ভালো মেকাপ দিয়াছে, শয়তান ঢোকনের পথ নাই, রিলিজিয়ন, পলিটিক্স ও স্টাইলরে সুন্দরভাবে মিলাইয়া দিয়াছে, আমরা তাঁর মুখ দ্যাখতে

পাইলাম না, তবে যতটুকু দ্যাখলাম, তাতে ধর্মের দাগ দেইখ্যা খুশি হইলাম। তাঁর তসবি দেখা যায় না, তাঁরা কী বলেন শোনা যায় না (পাওয়ারে ফির‍্যা যাইতে হইবো, পাওয়ারে ফিরা যাইতে হইবো, পাওয়ার ছারা বাচবো না, আল্লা, পাওয়ার দেও)।

এই সময় হঠাৎ খুন হয়ে গেলো চৌদ্দগ্রামের ভালো ছেলেটি, যে রাজনীতির মতো ভালো কাজে কখনো ছিলো না বলেই জানতাম। সে ক্লাশে ফার্স্ট সেকেন্ড হতো, এইটা খুবই খারাপ, ফার্স্ট সেকেন্ড হলে কেউ পলিটিক্স করে না, পড়ে পড়ে নিজেকে নষ্ট করে, পলিটিক্স করলে কেউ ফার্স্ট সেকেন্ড হয় না, হওয়ার দরকার পড়ে না। তার বাবাটি গরিব, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মা আর বাবা একটু সুখ পেতো। সুখটুখ পাওয়া ঠিক নয়, একটু দুঃখে থাকা দরকার মানুষের, আর এই দুঃখের দেশে আবার সুখ কী; সে ইস্কুল থেকে ফেরার পথে খুন হয়ে গেলো। এটা তার দোষ, তাকে খুন করার কারো ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু সে খুন হয়ে গেছে। দু-চারটা খুন না হলে ইলেকশন জমে না। চৌরাস্তায় একটু গোলমাল হয়েছিলো, গোলমালটা চলছিলো দুই বড়ো রাজবংশের ক্যাডারদের মধ্যে, তখন ছেলেটি সেখান দিয়ে আসছিলো, বেশি নয়, কাটারাইফেলের একটা গুল্লি এসে তার মাথায় লাগে। ছেলেটি পড়ে যায়, তাকে কেউ টেনে তোলে না, হাসপাতালে পাঠায় না; পাঠালেও কোনো লাভ ছিলো, ডাক্তাররা কেউ ছিলেন না, তারা সবাই ঢাকায় প্র্যাকটিস করছিলেন। ছেলেটি মারা যায়। এটা কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়, গুলিটুলি লেগে মৃত্যু আমাদের দেশে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

আমরা আগে বুঝতে পারি নি যে গরিবগর্বার ওই ছেলেটি শহিদ অমর হওয়ার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলো। কিছুক্ষণ পরই আমরা জানতে পারি ছেলেটি শহিদ ও অমর; তার রক্ত দামি, তার রক্তের কণায় কণায় পলিটিক্স।

সে উল্টেপাল্টে পড়ে গেলে আরো কিছুক্ষণ ফাটিয়ে ফুটিয়ে ঝাঁপিয়ে নড়িয়ে চারপাশ বন্ধ স্তব্ধ করে বীর ক্যাডাররা চলে যায়। একটা পড়ে গেছে, ফেলার ইচ্ছে তাদের ছিলো না, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের আগে তারা রক্ত ফেলতে চায় নি, কিন্তু পড়ে গেছে, এটা তাদের দোষ নয়। তাদের দোষ দিতে পারি না, তারা ছেলেটিকে খুন করতে চায় নি, ছেলেটিই খুন হওয়ার জন্যে সেখানে গিয়ে পড়েছিলো, ওর ভাগ্য খারাপ বা ভালো। ধর্মে আমরা বিশ্বাস করি, বরাতে বিশ্বাস করি, তার জন্যে সারা রাত জেগে থেকে কতো সোনাদানা চাই, পরের বছরই সেই সব সোনাদানায় আমাদের ঘররাড়ি ভরে ওঠে, রাখনের জায়গা পাই না, সেই স্বর্গীয় বিশ্বাস থেকে বলতে পারি আমরা দুঃখ করতে পারি না, আল্লা এটা তার নামে লিখে রেখেছিলো, তাই গুলি লেগে সে মরেছে। না মরলেই বরং বিশ্বাসে গোলমাল দেখা দিতো। ক্যাডারদের কোনো দোষ নেই, কাটারাইফেল তারা চালিয়েছিলো সেটা তাদের নামে লেখা ছিলো। মানুষের করার কিছু নেই, তিনি যা করান মানুষ তাই করে। তাই কাউকে দোষ দিতে পারি না।

ক্যাডাররা সিগারেট টানতে টানতে নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গিয়ে দেখে তাদের নেতারা খুব উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছেন। নেতাগুলো কাটা চালাতে পারে না, পারে শুধু মিছে মিছে বক্তৃতা দিতে আর উত্তেজনায় টান টান থাকতো। তারা থানার নেতা, দেশেরও নেতা; ইলেকশনের আগে তাই তাদের উত্তেজনা স্বাভাবিক। ক্যাডাররা ঠাণ্ডা, ধীরস্থির, বরফের মতো প্রশান্ত, আর ভয়াবহ।

এক বংশের থানা-নেতা জিজ্ঞেস করেন, খবর কি, শোনলাম একটা লাছ পরছে? ঘটনা কি বুঝাই কও।

বেন্সন টানতে টানতে এক ক্যাডার বলে, হ, পরছে একটা, মাতায় গুলি লাগছে মনে হইতাছে। ফুরাই গ্যাছে লাগতেছে।

থানা-নেতা জিজ্ঞেস করেন, লাছটা কই, লাছটা আনলা না?

ক্যাডার বলে, লাছ দিয়া কি করুম? লাছ ত আনতে কন নাই।

থানা-নেতা বলেন, তোমরা করছো কি? একটা অ্যাছেট ফেইল্যা আসছে। ইলেকশনের আগে এমুন অ্যাছেট আর পামু কই?

ক্যাডার বলে, লাছ ত পুলিশভাইগো প্রপার্টি, সেইজইন্য রাইখ্যা আসলাম।

জ্যাকেটে রক্ত লাগাইতে ইচ্ছা হইল না।

থানা-নেতা বলেন, ইলেকশনের আগে একটা লাছ পাওন ভাইগ্যের কথা, অইটা আমাগো লাছ, আল্লায় দিছে। যাও, বাবারা, তরাতরি যাও, পোলাটার নামের লগে শহিদ আর জিন্দাবাদ লাগাইয়া শ্লোগান দিতে দিতে লাছটা লইয়া আসো। একটা শহিদ আমাগো দরকার।

ক্যাডাররা শ্লোগান দিতে দিতে লাশ কুড়োতে চলে যায়।

আরেক বংশের থানা-নেতা জিজ্ঞেস করেন, ইদ্রিস মোল্লার পোলাটা নাকি মাথায় গুল্লি লাইগ্যা পইর‍্যা গেছে?

বেন্সন টানতে টানতে এক ক্যাডার বলে, কার পোলা তা ত জানি না, তয় পোলাডার নাম শুনছি সিদ্দিক।

থানা-নেতা বলেন, সিদ্দিক এখন শহিদ সিদ্দিক, সে আমাগো দলের, তার রক্ত বৃথা যাইতে দেওন যায় না।

ক্যাডার বলে, অই ছামরারে কোনো দিন দলে দেখি নাই, শুনছি ক্লাশে ফাস্ট হইত। এই মাল দিয়া দলের কোনো গেইন নাই।

থানা-নেতা বলেন, সে ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র, সিদ্দিক এখন শহিদ, তার লাছটা লইয়া আসো। বাবারা, যাও, শহিদ সিদ্দিক জিন্দাবাদ, শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দিব না, সিদ্দিকের রক্তে গণতন্ত্র আনবো বইল্যা শ্লোগান দিতে দিতে যাও, তার লাশ লইয়া মিছিল করুম। বিকালে জনসভা করুম। ফাস্ট বয়ের লাশটা এখন খুব কামে লাগবো। ইলেকশনের আগে একটা শহিদ পাওন ভাইগ্য।

এক ক্যাডার বলে, বাইচ্যা থাকনের সময় মনে হইত ও কোনো কামে লাগবো না, এখন দেখতেছি অর লাছটা কামে লাগবো।

শহিদ সিদ্দিক জিন্দাবাদ, সিদ্দিকের রক্তে গণতন্ত্র আনবো, শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দিব না শ্লোগান দিতে দিতে ক্যাডাররা শহিদ সিদ্দিকের লাশ আনতে যায়।

লাশ তাদের চাই, একটি শহিদ তাদের দরকার।

আবার কাটারাইফেল ফুটান শুরু হয়।

লাশ একটা হয়েই অসুবিধা হয়েছে, আরেকটা লাশ পড়ন উচিত আছিল; তাইলে দুই রাজবংশ দুটি অমর শহিদ পেতো, ভোটের বাক্সে ব্যালেন্স আসতো, ড্যামোক্রেসি থাকতো। লাশ একটা, অতিশয় মূল্যবান লাশ, তার মালিক দুই দল। ওই লাশ বোঝাই ভোটে লাশের উপর ড্যামোক্রেসির সিংগাসন।

রাজবংশগুলো এখন দেশ দখল করতে বেরিয়ে পড়েছেন।

মনে হচ্ছে মঙ্গোলিয়া উজবেকিস্থান কাজাকিস্থান মেসোপটামিয়া আরাবিয়া আফগানিস্থান খোরাশান বদকশান ইরান তুরান থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে তলোয়ার উঁচিয়ে গলা কাটতে কাটতে ছুটে আসছে প্রচণ্ড বীরেরা, চেঙ্গিশ হালাকু খানেরা, বিন কাশেম বখতিয়ার খিলজি তারিক খালেদরা; তবে এইটা আমাগো ভুল, দশ বারো শো বচ্ছর ধইর‍্যা ঘোম না হইতে হইতে চোখ ভইর‍্যা দুঃস্বপ্ন দ্যাখতে দ্যাখতে রাইতের বেলা দিনের বেলা মার মার কাট কাট শোনতে শোনতে আমরা এখন ঠিকটা দেখতে পাই না, ঠিকের ছায়াটা দেখি, মানুষ না দেখে তার প্রেতটা দেখি। এইটা আমাগো অসুখ। চোখ আর মগজ খারাপ হয়ে গেছে বইল্যা সত্য না দেখে মিথ্যা দেখি। যারা নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ইলেকশনের ক্যাম্পেইনে

বাইর হয়ে পড়ছেন, তাঁরা কেউ অইসব দ্যাশ থিকা আসেন নাই, তাঁরা আমাগোই মানুষ, আমাগোই রাজপুরুষ, আমাগো পুকুরেরই পানি খান, আমাগো ধানেরই ভাত খান, তাগো দয়ার শরীর, তাঁরা জনসভার পর জনসভা মিটিংয়ের পর মিটিং করে আমাগো ভালোবাসা জানাইতেছেন, দ্যাশের সঙ্গে তারা প্রেম করতেছেন, তাঁরা ঘুমাইতে পারতেছেন না আর আমাগোও ঘূমাইতে দিতেছেন না; এইবার মরন বাঁচনের ইলেকশন। এইবার কিয়ামত ঘনাইয়া আসছে দ্যাশ ভইর‍্যা।

রাস্তায় রাস্তায় পথে ঘাটে মিটিংয়ে মিটিংয়ে জনসভায় জনসভায় খাঁটি প্রকত সেন্ট পার্সেন্ট মোলো আনা নির্ভেজাল নিশ্চিত বিশুদ্ধ আসল সাচ্চা ইমানদার মমিন মুসলমান দেখতে পাইতেছি আমরা। এতো আর একসঙ্গে কোনো কালে দেখি নাই, আমাগো পাপী বাবারা দেখে নাই পাপী দাদারা দেখে নাই। সাতশো বছর আগে দেখি নাই। তিনশো বছর আগে দেখি নাই একশো বছর আগে দেখি নাই মুগলগো আমলে দেখি নাই ইংরাজের রাজে দেখি নাই, যখন কালা কিস্তি টুপি মাথায় দিয়া ‘পাক সরজমিন সাদবাদ তুনিশানে আজমে আলিশানে’ মুখ দইয়ের মতন ফেনায় ভরে তুলতাম, তখনও দেখি নাই। আমাদের সব রাজপুরুষরা বড়ো বড়ো পরহেজগার মমিন মুসলমান সেজে মুখে আর বুকে আর মাথায় ইসলাম নিয়া ড্যামোক্রেসির ইলেকশনের ক্যাম্পেইনে নামছেন, লগে লগে আমরাও নামছি; মনে হইছে ইসলাম এত শ বছর পর খাঁটি অনুসারী পাইয়া জিন্দা হইয়া উঠছে, আমরাও জিন্দা হচ্ছি। ইসলামের এমন সুদিন আর আসে নাই, অন্যরা আনে নাই, আমাগো রাজারা আনছে, আমরা আনছি। রিলিজিয়নটা এই দ্যাশে নতুন কইর‍্যা পোরচার হচ্ছে; আগে ঠিক মতন হয় নাই, এইবার পোক্ত করা হচ্ছে। শুনছি ঠ্যাকলে নাকি শয়তান সবচাইতে বেশি কইর‍্যা আল্লার নাম লয়, মোখ থিকা অই নাম সরে না, আমরা সেইটা আমাগো চোখে দেখতে পাইতেছি। ভাত চাই না আমরা, ভাত খাইয়া বাইচ্যা থাইক্যা কি হয়; কাপড় চাই

না আমরা, কাপড় পইর‍্যা কি সুখ, না পড়লে কি হয়; ইস্কুল চাই না আমরা, ইস্কুল দিয়া কোন খাট্টা হয়; হাসপাতাল চাই না আমরা, হাসপাতালে গিয়া বাইচ্যা থেকে গুনা বাড়াইয়া খালি দোজগের পথ বাড়ে; চাকরি চাই না আমরা, সৌদি গিয়া চাকর খাটলেই চলবো; কিছু চাই না আমরা; খালি তারে চাই; নিজেগো লিগা ঘর চাই না আমরা, তার লিগা ঘর বানাইলেই হইব।

আমাগো রাজবংশগুলি প্রচণ্ড তাণ্ডবে মহাগর্জনে ভৈরব হুংকারে আশমান জমিন কাঁপাইয়া ইসলাম প্রচার করতে লাগছেন, আমরা সাচ্চা মুসলমান হইয়া উঠছি, চোখে দিনরাইত ভেস্তদোজগ দেখতে পাচ্ছি, তবে আমরা বুঝতে পারছি না এইটা ড্যামোক্রেসির ইলেকশন না একটা নতুন ধর্ম প্রবর্তন। দুই নম্বরটা হইলেই উত্তম, ড্যামোক্রেসি দিয়া আমরা কি করুম? ড্যামোক্রেসি ধুইয়া খাইয়া কি আমরা ভেস্তে যাইতে পারুম? দুনিয়াটি কয় দিনের? পলিটিক্স, প্রধান মন্ত্রী, ড্যামোক্রেসি, ইলেকশন, এমপি, পার্লামেন্ট, পাজেরো, বনানী, গুলশান কয় দিনের?

আমাগো মনে হইছে দুনিয়ায় একটা নতুন রিলিজিয়ন আসছে, আর সেইটা নিয়া আসছেন আমাগো ড্যামোক্রেসির রাজপুরুষেরা।

যিনি কোনোদিন সালাত পড়ে নাই, দেখতে পাচ্ছি তিনি মসজিদে মসজিদে হাজার হাজার ভোটার লইয়া সালাত পড়ছেন। মসজিদ কাইপ্যা ওঠছে।

স্কচ, পান না করলে যিনি সুস্থ থাকেন না (স্বাস্থ্যগত কারণে অনেকেরই এইরূপ হইয়া থাকে), একটু আগে যিনি স্কচ টানছিলেন (না টানলে দেশপ্রেম সংহত হইয়া জমে না), দেখতে পাই মঞ্চে উইঠাই তিনি ধর্ম প্রচার শুরু করছেন।

আমরা খালি খুশি হইতে থাকছি, ভেস্তের কথা ভাইব্যা জার জার হইছি।

মহাজননেত্রী মাথাটিকে অদ্ভুতভাবে ঢেকে (শয়তান হইতে চুল সাবধান, মাইয়ালোকের চুলের ভিতর দিয়া শয়তান ভিতরে ঢোকে) মঞ্চে উঠেই বলছেন, প্রিয় ভাইসব, ভাইরা আমার, বোনরা আমার, দ্যাশে আল্লারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে। হইবে, আমার বংশরে ভোট দ্যান, আমরা ছাড়া আর কোনো বংশ আল্লারে চায় না। আমরাই খালি তারে চাই।

মহাদেশনেত্রী স্টাইলে (তার স্টাইলে ডেভিল আকৃষ্ট হইতে পারে) মাথা ঢেকে মঞ্চে উঠেই বলেন, অরা পাওয়ারে আসলে দ্যাশ থিকা ইসলাম উঠে যাবে, বিসমিল্লা লাইলাহা থাকবো না, খালি উলুর শব্দ আর মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ শোনা যাবে, পঞ্চাশ লক্ষ হিন্দু ইন্ডিয়া থিকা রওনা করছে।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পন্টু স্টেজে দাঁড়িয়েই বলেন, ভাইসব, আপনেরা কি চান, আমি জানি আপনেরা আল্লারে চান, নামাজ পরতে চান, রোজা রাকতে চান, ভেস্তে যাইতে চান। আমরা পাওয়ারে আসলে আপনেরা আল্লারে পাইবেন, নামাজ পরতে পারবেন, রোজা রাকতে পারবেন। অরা পাওয়ারে আসলে আপনাগো ধর্ম থাকবো না, আল্লা থাকবো না, লাইলাহা থাকবো না, হিন্দুরা আইস্যা ভগবান ভগবান কালি কালি দুর্গা দুর্গা বইল্যা পুজা করবো।

নিজামউদ্দিন আহমদ মঞ্চে উঠেই বলতে থাকেন, হে আল্লা, আপনের বাসনা পূর্ণ করার জইন্যই আমরা পলিটিক্স করি, ইলেকশন করি, এই জনগণ আপনের বান্দা, এই জনগণ আমাগো পাওয়ারে দ্যাকতে চায়। আল্লা, আপনেরে ছারা আমরা আর কিছু জানি না। আমরা পাওয়ার চাই না, আল্লারে চাই।

মনোয়ার হোসেন মোল্লা মঞ্চে উইঠাই বলেন, ভাইরা, আপনেরা নয় বচ্ছর ধইরা দেকছেন আমাগো মহাজননেতা ইসলাম ছারা আর কিছু বোজতেন না। ইসলামের জইন্যে তিনি আজ বন্দী হয়ে আছেন। তিনি স্বপ্ন দেখে মসজিদে গিয়া নামাজ পরতেন, তার মতন মুসলমান আর নাই। তিনি বাহির হইয়া আসলে দ্যাশে প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মওলানা রহমত আলি ভিস্তি মঞ্চে উঠেই বলেন, মমিন মুসলমান ভাইরা, দ্যাশে ইসলাম আইজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আমরা চাই দ্যাশে আল্লার রাজ্য স্থাপন করতে। কাফেরগো হাত থিকা দ্যাশ উদ্ধার করতে হইব, আল্লার দ্যাশ আল্লার হাতে তুলে দিতে হইব। আমরা পলিটিক্স করি না, ড্যামোক্রেসি চাই না, আল্লার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা।

আর কিছু চাই না আর কিছু দরকার নাই।

আরেকটা জিনিশ লইয়া তাঁরা খোঁচাখুঁচি করতেছেন, সেইটা আমাগো কানা কড়ি, এক পয়সার মমবাতি, আমাগো ওই স্বাধীনতা, আমাগো ওই মুক্তিযুদ্ধ।

জিনিশটার কথা আমরা ভুইল্যা যাইতেছি, ভুইল্যা থাকলেই আমরা ভালো থাকি, তবে মাঝেমইধ্যে দুইটা লইয়া একটু আধটু শরিল আর মনটারে চুলকাইয়া তাজা করে তুলি, চাইরপাঁচ মিনিটের জইন্যে ভাল্লাগে।

মহাজননেত্রী মাঝেমইধ্যে বক্তৃতার শ্যাষে ভয়ে ভয়ে বলেন, আমরা স্বাধীনতা আনছি, আমরা ফ্রিডম ফাইটিং করছি, আমাগো বংশ ছারা দ্যাশ স্বাধীন হইত না।

তিনি তাকাইয়া দেখেন লোকজন কেমন নিতাছে, স্বাধীনতার কথায় আবার তারা ক্ষেইপ্যা ওঠতাছে কি না। তাইলে তিনি এই নিয়া কথা বলবেন না। একটু অন্য রকম দেকলে তিনি আল্লাতালার কথা বলতে শুরু করেন।

মহাদেশনেত্রী বক্তৃতার শ্যাষে উঁচা গলায় বলেন, আমরা স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করছিলাম, আমরা ফ্রিডম ফাইটিং করছিলাম, অরা কইলকাতা গিয়া নাটক সিনেমা দেখতেছিল, হিন্ধু মাইয়া লইয়া ঢলাঢলি করতেছিল।

মওলানা রহমত আলি ভিস্তি বক্তৃতার শুরুতেই বলেন, নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ানে আমরা ভুল করি নাই, ওই যুদ্ধ হইছিল ইসলাম নষ্ট করনের জইন্যে, আমরা ইসলাম বাঁচানের জইন্যে রাজাকার হইছিলাম। আমরা না থাকলে দ্যাশে ইসলাম থাকতো না, দ্যাশ হিন্দুগো হইয়া যাইত।

আমাগো দেশের এইখানে সেইখানে পশু না জিন না রাক্ষস না স্কন্ধনাইয়া না শয়তান না কিসের যেনো উৎপাত শুরু হইছে।

কিসের যে উৎপাত আমরা বুঝতে পারি না।

ওই আজব জিনিশগুলো খুবই রহস্যজনক, আমরা দেখতে পাই না, নীরবে নিঃশব্দে চলে যাওয়ার পর বিকট গন্ধ পাই, বিশ্রী গভীর পায়ের দাগ পাই, আর পড়ে থাকে তাদের ধ্বংসলীলার চিহ্ন।

অনেক সময় গন্ধেই আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে।

পার্বতীপুরে এক সন্ধ্যায় বিকট গন্ধে লোকজন পাগল হয়ে ওঠে। এইপাশে ধানক্ষেত আর ওইপাশে রেলের ইঞ্জিনের গন্ধেই তারা অভ্যস্ত ছিলো, ওই গন্ধ তাদের নিজেদের শরীরের গন্ধের মতো মধুর লাগতো, কিন্তু হঠাৎ অন্য রকম গন্ধে তারা আঁৎকে ওঠে। রাস্তায় ছিলো যারা মাঠে ছিলো যারা বাজারে ছিলো যারা রেলস্টেশনে ছিলো যারা তারা প্রথম গন্ধ পেয়ে দৌড়ে বাসায় ফিরতে থাকে, বাইরে থাকতে পারে না। বাসায় ফিরে সব দরোজা জানালা বন্ধ করে দেয়, ছিদ্রে ছিদ্রে তুলো ছেঁড়া কাপড় চট আর আর যা পায় ঢুকোতে থাকে, কিন্তু গন্ধ বন্ধ হয় না, চড়চড় করে গন্ধ ঢুকতে থাকে। তারা নাক চেপে বিছানায় মাটিতে সারারাত পড়ে থাকে, ব্যথায় নাক ফুলে ওঠে। সকালের দিকে দেখে কোনো গন্ধ নেই।

সবাই রাস্তাঘাটে বলাবলি করতে থাকে, রাইতভর কিসের গন্ধ পাইলাম?

কেউ ওই গন্ধের পরিচয় জানে না।

কেউ কেউ বলে, কোনো নতুন পশুর গন্ধ হইব। অই পশু আমরা কোনো দিন দেখি নাই।

কেউ কেউ বলে, আমাগো বাড়ির পিছনে একটা পায়ের দাগ দ্যাকলাম, এমন দাগ আগে দেখি নাই।

কেউ বলে, ইরিখেতে গিয়া দ্যাখলাম একটা প্যাচাইনা দাগ, খুড় আধ হাত মাটিতে ঢুইক্যা গ্যাছে।

এইটা কি কোনো পশুর পায়ে দাগ? কেউ জানে না।

এমন প্যাঁচাইনা আর গভীর কোন পশুর খুড়? কেউ জানে না।

এইটা কি জিন? রাক্ষস? শয়তান? কেউ জানে না।

তারা পুকুরপাড়ে ধানক্ষেতে মাঠে বাড়ির পেছনে পশু না জিন না রাক্ষস না। স্কন্ধনাইয়া না শয়তান না কিসের যেনো অদ্ভুত পায়ের দাগ দেখতে পায়, যেমন পায়ের দাগ আগে তারা দেখে নি।

শিক্রামপুরে আসে একটা অদ্ভুত পশু, তার স্বভাব অদ্ভুতভাবে অন্য রকম।

পশুটা রাতের বেলা আসে, কখন আসে কেউ দেখতে পায় না, রাতে সবার গভীর ঘুম পায়, একটা পাখিও জেগে থাকে না; ঘুমের মধ্যে শিক্রামপুরের মানুষ সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখে, সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখে শোচনীয় দৃশ্য।

পশুটার কাজ পুরোনো কবর ভেঙে লাশের হাড়গোড় খাওয়া। ওটি পুরোনো হাড়গোড় খেতেই বেশি পছন্দ করে। তারা জানে শেয়াল কবরে আসে নতুন লাশ খেতে, কিন্তু এই পশুটা অন্যরকম; যে-সব কবর বিশ পঞ্চাশ দশ পাঁচ বছরের পুরোনো, যে-সব কবরের কথা প্রিয়জনেরাও ভুলে গেছে, পশুটা সে-সব কবর খুঁড়ে তুলে আনে হাড়গোড়, রাতভর খায়, কিছু হাড় ফেলে রেখে যায়। সকালে লোকজন উঠে দেখে কয়েকটি কবরের পাশে পড়ে আছে পুরোনো অপরিচিত হাড়গোড়।

লোকজন ভয় পায়, যে-প্রিয়জনদের তারা ভুলে গেছে, তাদের জন্যে বেদনা জেগে ওঠে তাদের মনে; কিন্তু তারা কী করবে বুঝে উঠতে পারে না।

তারা নানা রকম খতম পড়ায়, কিন্তু পশুটা তার কাজ করে যেতে থাকে।

রসুল্লাগঞ্জের জনগণ একরাতে আক্রান্ত হয় ভয়ঙ্করভাবে।

সন্ধ্যার কাজকর্ম শেষ করে খেয়ে তারা শোয়ার আয়োজন করছে, স্বামীস্ত্রীরা ছোটোখাটো ঝগড়াঝাটিগুলো মিটিয়ে নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন সময় তারা ভালুকের প্রচণ্ড গর্জনের শব্দ শুনতে পায়। ভালুকের গর্জনে ও গন্ধে তারা প্রথম ভয় পেয়ে যায়, এবং বিস্মিত হয়

যে তাদের পল্লীতে ভাল্লুক আসার কথা নয়, কয়েক শো মাইলের মধ্যে কোনো বন নেই, ভাল্লুক এলো কোথা থেকে? একটা বাড়ি থেকে আর্ত চিৎকার উঠলে তারা বুঝতে পারে ওই বাড়িটা আক্রান্ত হয়েছে; তারা শরকি বর্শা ট্যাটা উঁতি যার যা ছিলো, সে-সব নিয়ে বেরিয়ে ওই বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে।

তারা এগোতে পারে না। পঞ্চাশটির মতো বিশাল বিকট লোমশ ভালুকের মুখোমুখি তাদের সমস্ত সাহস শক্তি শরকি বর্শা ট্যাটা উঁতি নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠে, তারা আক্রান্ত হতে থাকে, ভাল্লুকগুলো তাদের থাবায় তুলে তুলে ছিঁড়েফেড়ে ফেলতে থাকে। ঘন্টাখানেক ধরে সন্ত্রাস আর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ভাল্লুকগুলো দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে। লাশের পর লাশ পড়ে থাকে রসুল্লাগঞ্জ জুড়ে, সারা গ্রাম গোঙাতে থাকে কাঁদতে থাকে। সারা গ্রাম মরে যায়।

একরাতে বাঘ পড়ে আমাদের সারা দেশ জুড়ে।

সুন্দরবন না কোন বন থেকে দলে দলে নেমে আসতে থাকে ডোরাকাটা হলদে চকচকে প্রচণ্ড হিংস্র ভয়াবহ বাঘেরা, তারা ঢুকতে থাকে আমাদের পল্লীতে, নগরে, শহরে। তারা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসে, ধানক্ষেত পাটক্ষেত সরষে আলু ক্ষেতের ওপর দিয়ে আসে, আমাদের আলপথ, রাজপথ, পুকুরপাড়ের পথ দিয়ে আসে, তারা নদী সাতরে আসে, বিলের জলাভূমির ওপর দিয়ে আসে, পুকুর খাল পার হয়ে আসে, বাঁশের পুলের ওপর দিয়ে, লোহার সেতুর ওপর দিয়ে তারা আসতে থাকে, দলে দলে আসতে থাকে। আমরা তখন ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন গভীর রজনী নেমেছে, কোনো কোলাহল নেই, তখন বাঘেরা আসে। আমরা কখনো প্রস্তুত নই, প্রস্তুত হওয়ার কিছু ছিলো না। আমরা প্রথম তাদের গায়ের গন্ধ

পাই, অজস্র বাঘের গায়ের বন্য আদিম রক্তমাখা গন্ধে আমাদের দেশ বমি করে ফেলতে চায়, আমরা বমি করে ফেলতে থাকি; তারপর আমরা তাদের পায়ের শব্দ পাই, আমাদের মনে হতে থাকে ক্রমশ মৃত্যু এগিয়ে আসছে। আমাদের দিকে, মৃত্যুর পায়ের শব্দে আমরা কুঁকড়ে যাই, আমাদের গলা থেকে কোনো শব্দ বেরোয় না; তারপর তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে, তাদের মুখ দেখে নখ দেখে দাঁত দেখে থাবা দেখে আমরা আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। আমরা বল্লম শরকি জুতি ট্যাটা কোচের কথা মনে করতে পারি না, আমাদের মনে হতে থাকে বাঘের কাছে নিজেদের সঁপে দিলেই আমরা বাচবো, আমরা বাঘদের শিকার, আমরা বাঘদের খাদ্য। আমাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, আমরা গেঁথে থাকি তাদের দাঁতে, ঝুলতে থাকি, তারা আমাদের ছিঁড়তে থাকে চাটতে থাকে। হঠাৎ আমরা বাঘেদের বিকট মুখে কাদের যেনো মুখ দেখতে পাই, মুখগুলোকে চিনি আমরা, অনেকখানি চিনি, আবার মনে হয় চিনি না, অনেকখানি চিনি না। বাঘেদের মুখ থেকে মাঝেমাঝে মুখোশ সরে যেতে থাকে, মুখগুলোকে আমরা চিনি মনে হয়, তাদের দাঁত দেখি, দাতে রক্ত দেখি, কষ বেয়ে রক্ত ঝরতে দেখি, জিভ দিয়ে কষ চাটতে দেখি। তাদের মুখে দাঁতে কষে টসটসে রক্ত দেখি। ওই রক্ত কাদের? ওই রক্ত আমাদের রক্তের মতো লাল আর গরম। রক্তের দিকে তাকিয়ে আমরা হাহাকার করে উঠি।